গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

প্রথম খণ্ড

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

প্রথম খণ্ড

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ডিপ. লিব.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিক্ষক ;
'গ্রন্থাগার-পরিচালনা' ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা

"ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি"
"কলিকাতা ১২"

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬২
দাম : চারি টাকা

মুদ্রক :
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭নং ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি. এস.-সি., এফ. এন. আই.

মহাশয়ের করকমলে আমার

'গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক'

অর্পিত হইল

অনুগত

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা বইয়ের যে প্রয়োজন আছে, সে-কথা এখন সকলেই স্বীকার করবেন। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারকে আমাদের দেশের গ্রন্থগারের মত ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। আমেরিকার গ্রন্থাগারের উন্নতি যতই ভালো হোক, তবু আমেরিকার গ্রন্থগার আমাদের দেশে ঘরে উঠবে না, একথা মনে রাখতে হবে। বাংলার গ্রন্থাগার বাংলার গ্রন্থাগারই থাকবে। সেই কারণে বাংলা দেশের গ্রন্থাগারের উন্নতি করতে গেলে যতটুকু প্রয়োজন, আমি এই বইখানিতে তা লিখলাম। একটি কথা ব'লে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাগারের কাজ করতে গেলে মনকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখতে হবে। তা না হ'লে এ-বিষয়ে রস পাওয়া যাবেনা।

বইখানি শিক্ষক, ছাত্র ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের যাতে কাজে লাগে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হ'লো। ভুল-ভ্রান্তি এক-আধটু থাকতে পারে, সেজন্য পাঠক আশাকরি মার্জনা করবেন। মোটামুটি কয়েকটি ভুলের প্রতি পুস্তকের শেষে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক বইখানির ভূমিকা লিখেছেন। সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

চন্দননগর
এপ্রিল, ১৯৫৫

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

গ্রন্থাগার-আন্দোলনের প্রসার-কামী সকলেই বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পুস্তকের অভাব অনুভব করিতেছেন। যদিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-পরিচালিত সপ্তাহান্তিক বা গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারবিজ্ঞান-শিক্ষণব্যবস্থায় বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে যে এ-শিক্ষা অনেকখানি অসুবিধার মধ্য দিয়া চলিতেছে, এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-পরিচালিত শিক্ষণব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতার সর্ব্বনিম্ন মান যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার্থিগণ সকলেই প্রচলিত ইংরাজীভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া যথোপযুক্ত বিষয়জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন, এতটা আশা কখনই করা যাইতে পারে না। অথচ যাঁহারা সত্য সত্যই এই বিদ্যায় পারঙ্গম, তাঁহারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহ বোধ করেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

তাহা ছাড়া গ্রন্থাগার-সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশেরই নিজের নিজের বিশিষ্ট সমস্যা ও প্রণালী আছে। বিলাতের গ্রন্থাগার-সংগঠন-সমস্যা, বিলাতের গ্রন্থাগার-পরিচালনা-প্রণালী, বিলাতের পক্ষে উপযুক্ত গ্রন্থবিভাগ আমাদের দেশের পক্ষে সর্ব্বাংশে একরূপ হইতে পারে না। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল বিদ্যার্থী অবশ্য বিলাতী গ্রন্থ হইতে তাহাদের দেশের ঐতিহ্য ও বিধানগুলি অধিগত করিয়াই পরিচালনার নিয়মাবলী আমাদের দেশের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তবুও তাহাদের পরিকল্পিত সংস্কারকে চরম মনে না করিয়া উহাকেও একটি প্রস্তাব বলিয়াই বিচার করা উচিত। বস্তুতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞান কোন অবস্থায়ই চরম উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে মনে করা চলে না। প্রতি অবস্থারই আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ইহার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র থাকে। বিশেষতঃ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যেখানে আমাদের দেশের সুবিধা-অসুবিধার

দৃষ্টিকোণ হইতে গ্রন্থাগার-পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনাই হয় নাই, সেখানে এ-দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-বিষয়ক সমস্ত আলোচনাই আমাদের দেশের মত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে একান্ত উপযোগী, এ-কথা অবিসম্বাদিত। সাধারণ গ্রন্থাগার-সেবী, যাঁহাদের নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি পরিমিত এবং যাঁহারা নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে ত' এ-দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পুস্তক অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।

সুতরাং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক হিসাবে, আমাদের দেশের উপযোগিভাবে গ্রন্থাগারকে গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতি-নির্ণয়ের পথ হিসাবে বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ এইজাতীয় পুস্তক দুই-একখানি প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও শৈলশিখরের অন্তর্গত ক্ষীণ জলধারার ন্যায় তাহারা আপন চতুষ্পার্শ্বস্থ স্বল্পপরিসর স্থানেরই জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে—সমতলের সুবিস্তৃত রাজ্যে প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তুষারগলিত বহুজলধারা সম্মিলিত হইয়াই যেমন একদিন পর্ব্বতের বাধা অতিক্রম করিয়া নদীরূপে প্রবাহিত হয়, এই জাতীয় বহুগ্রন্থের সম্মিলিত চেষ্টায়ই হয়ত তেমনি একদিন পাশ্চাত্ত্য সংস্কার-গুলিকে অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশের উপযোগী গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিবে। সেইদিন আজ কত দূরে, কে বলিবে? তবে শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সদ্য বিরচিত পুস্তক 'গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক' যে সেইদিনকে ত্বরান্বিত করিয়া আনিবে, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

রাজকুমার বাবুর গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার সম্মানিত আহ্বান পাইয়া ভাবিলাম—কেন তিনি আমাকে এই বিশেষ সম্মান দান করিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক হিসাবে অনেক গ্রন্থাগারিকের প্রীতি আমাকে ধন্য করিয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু বাংলাদেশে এমন প্রগতিশীল গ্রন্থাগারিক কেহ আছেন কিনা জানি না, যিনি রাজকুমার বাবুর সহিত পরিচিত নহেন। বস্তুতঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ক্লাসের অধ্যাপকরূপে, অভিজ্ঞ সূচীকাররূপে এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পারঙ্গম বিশেষজ্ঞরূপে তিনি সুপরিচিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেকেই তাঁহার ছাত্র, সহকর্মী বা গুণমুগ্ধ। তাঁহার সুদৃঢ় খ্যাতি অধিকতর পরিবৃদ্ধির জন্য কোন সহায়ক বা সাধনের অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় আমাকে তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বলা, হয় আমার প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির নিদর্শন, কিংবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুরাগের ফল বলিয়াই মনে হয়। যাহাই হউক, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, রাজকুমার বাবুর লিখিত পুস্তক গ্রন্থাগারিক ও সাধারণের দ্বারা বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হইবে।

রাজকুমার বাবুর পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থাগারিকের মূল সমস্যাগুলিকে ইহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছে। ইহাতে সর্ববিষয়ের সিদ্ধান্ত-সন্নিবেশের চেষ্টা না করিয়া কয়েকটি বিষয়ের তত্ত্বালোচনার চেষ্টা হইয়াছে। অকিঞ্চিৎকর কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়া যেমন তেমন করিয়া সিদ্ধান্ত চাপাইবার চেষ্টা না করিয়া লেখক জিজ্ঞাসু ছাত্রের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যাপকতার অনুরোধে গভীরতার দাবীকে অস্বীকার করিয়া বিজ্ঞানালোচনার পথরোধ করেন নাই। বস্তুতঃ লেখকের সমস্ত মতকে সকলেই নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইবেন—এ-আশা না করিলেও এই পুস্তকের মত বিচার করিয়া দেখিতে সকলেরই আগ্রহ হইবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। গতানুগতিকতা পরিহার করিয়া আপন চিন্তাধারার যে-সবল প্রকাশ গ্রন্থকার করিয়াছেন, তাহাতে ছাত্রমাত্রই উপকৃত হইবেন, ইহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

রাজকুমার বাবুকে পরিশেষে আমি গ্রন্থখানির জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

জনসাধারণের গ্রন্থাগার

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে সমাজের মধ্যে সকল স্তরের ব্যক্তিকে বিদ্যা এবং প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তকের দ্বারা জ্ঞান বিতরণ করা। যে-বই পড়া উচিত সে-বই পরিবেশন করা নয়; যে যে-বই পড়তে চায়, তাকে সেই বই পরিবেশন করা।

সুতরাং জনসাধারণের গ্রন্থগারের কাজ তিনটি বস্তুকে নিয়ে।

বই > গ্রন্থাগার > পাঠক

এই তিনটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত; একটিকে বাদ দিলে আর দু'টির মানে থাকে না।

১। **বই** ঃ—বই কি? লেখক বই লেখেন। যে বিষয়টা তিনি মনে করেন কল্যাণকর, সে বিষয়টী তিনি সকলকে জানাতে চান। কিন্তু জানাবার মত লোক তো কেবল তুমি আর আমি নই, আর কেবল তোমায় আমায় জানালেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'চ্ছে না। তোমার আমার মত জানতে চায় এমন বহু লোক পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু বাংলা দেশ থেকে চিৎকার করলে তো আর লণ্ডনের লোক প্রণেতার কথা শুনতে পাবে না। অবশ্য বেতারের সাহায্যে লেখক তাঁর কথা এক দেশ থেকে আর এক দেশে পাঠালে অনেকে তাঁর কথা শুনতে পারে। কিন্তু আজকাল ব্যস্ত মানুষ একবার শুনে কোন বিষয় ক'দিন মনে রাখতে পারে? সুতরাং, সে রকম বলা আর সে রকম শোনার কোন মানে নেই। সেই জন্যে লেখক তাঁর বলার বিষয়টাকে লেখার বিষয় করে নেন এবং

লেখাটা যখন ছেপে বা'র হ'য় তখনই সেটাকে "বই" বলা হয়। সেই বই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে—ক্ষণকালের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে ছড়িয়ে পড়ে। আগেকার দিনে লেখার বা ছাপার চলন যখন ছিল না তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রও আসতো জ্ঞানার্জন করবার জন্যে; কিন্তু জ্ঞান পরিবেশন করতেন কারা? জ্ঞানী মানুষগুলোকে এক সংগে জড়ো করে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতো। বহু পয়সা খরচ করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছুটে যেতো বিদ্যোৎসাহীরা বিদ্যার্জন কর্‌বার জন্যে। আজ কি আর তার প্রয়োজন আছে? বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার জন্যে সত্যিই কি আজ রক্তে মাংসে গড়া জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রয়োজন আছে? মানুষ মাত্রেই মরে যায়—জ্ঞানী ব্যক্তিরাও কিছু আর চিরকালের জন্যে বেঁচে থাকে না; তা'তে পৃথিবীর মানুষের কি আসে যায়! যে মরলো তার আত্মা চির-শক্তিমান হ'য়ে বেঁচে থাকলেই হ'লো। রবীন্দ্রনাথ জীবিত অবস্থায় পাঠক-সমাজের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁর লেখার দ্বারা আজও সেই একই প্রভাব তিনি বিস্তার করছেন। জীবনের আলো-ছায়ার মাঝে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা তো সবই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তিনি বলতেই রইলেন: "এইটুকুই আমার জীবনের উপার্জন—মনে হয়, এটুকু তোমাদের জানা প্রয়োজন; কারণ, এইটুকুই আমি জেনেছিলাম—এইটুকুই আমি বুঝেছিলাম।"—এই হ'লো তাঁর লেখা, এই হ'লো তাঁর "বই"।

২। **পাঠক**:—মানুষ পড়ে জানবার জন্যে। তার জানবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে বেঁচে থাকবার জন্যে, জানবার জন্যে বেঁচে থাকা নয়। এটা মানুষের জন্মগত উদ্দেশ্য—এই উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যদি পৃথিবীতে না আসতো তা হ'লে মানুষ-জাতটা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতো না, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির সংগে সংগে মানুষ আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে অবস্থায় মানুষের জানার প্রয়োজন ক্রমশঃ বেশী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

আজকাল যেন আর ঠেকে শেখবার সময় নেই। সমাজের প্রয়োজনেই আজ মানুষের প্রয়োজন। নিজেকে তুমি যদি সমাজের প্রয়োজনের মত করে গ'ড়ে তুলতে না পারো, তা হ'লে মানব-সমাজে তোমার স্থান নেই। তা হ'লে বেঁচে থাকবার জন্যে জানতে হ'লে এমন কিছু জানতে হ'বে যা'তে তুমি সামাজিক হ'য়ে উঠতে পার। শিক্ষার হ'লো এই একটি দিক—এদিকটা হ'লো মানুষের পার্থিব উন্নতি, পার্থিব সুখের জন্য।

শিক্ষার আর একটা দিকও আছে। সেটা হ'চ্ছে নৈতিক। সেদিক থেকে মানুষের জানবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা—চরিত্রকে গড়ে তোলা। মানুষের গতিবিধি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়, মানুষ জন্মাবার পর, জ্ঞানোন্মেষের সংগে সংগে উপরের উদ্দেশ্য দু'টিকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। যা'রা তাদের গতিবিধি ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে, তারাই আপনাকে জীবনের সকল অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে নিয়ে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করতে পেরেছে। পুস্তকাগারের কাজ হ'চ্ছে পাত্র-অনুযায়ী জ্ঞান পরিবেশন করে মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত উন্নতি এবং গৌণতঃ সমষ্টিগতভাবে মানব-সমাজের উন্নতি করা।

৩। **গ্রন্থাগার**ঃ—লেখক বই লেখেন। হাজার হাজার বই সারা পৃথিবীতে ছেপে বার হ'চ্ছে—কে তার খোঁজ রাখে? আর সাধারণ লোকের পক্ষে খোঁজ রাখাও সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারিক সে সব বইয়ের খোঁজ রাখবে; কারণ, গ্রন্থাগার হ'চ্ছে লেখক ও পাঠকের মিলনস্থল। পাঠক পড়তে চায়। কেউ তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকে—কেউ তার প্রয়োজন সম্বন্ধে অচেতন থাকে। যা'রা সচেতন তাদের নিয়ে মুস্কিল কিছু নেই; কারণ, তাদের প্রয়োজন অপ্রকাশিত থাকবে না। গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে অচেতন প্রয়োজনটাকে সচেতন করে তোলা—পাঠককে পড়বার জন্যে প্রলুব্ধ করতে হ'বে। তাদের বলতে হ'বেঃ "তোমাদেরও জীবনের সমস্যা আছে, তোমাদের জীবনের সমস্যায় আমরা তোমায় সাহায্য করতে পারি।"

পুস্তক-সংকলন

বই কি, পাঠক কেন বই পড়ে, পুস্তকাগার কি এবং পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য কি তা আমরা বুঝলাম। এতক্ষণ যা আমরা বল্‌লাম তা দু'এক কথায় বললে দাঁড়ায় এই ঃ—

"লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা পুস্তকের সাহায্যে জনসাধারণকে জানাতে চান—পুস্তকাগার বই অর্থাৎ জ্ঞানের সংকলন করে এবং সেই জ্ঞান পাত্র অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করে।

পুস্তকাগার গড়ে ওঠার ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যায়—গোড়ার দিকে পুস্তকাগার গড়ে ওঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া। উদ্দেশ্যটা ক্রমশঃ অস্পষ্টতর হ'য়ে দাঁড়াতে থাকলো ; কারণ, জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার মান নির্ণয় করা সম্ভব হ'লো না। শেষ পর্যন্ত পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ালো জনসাধারণকে নির্দোষ আনন্দ দান করা। কিন্তু পূর্বেই আমরা বলেছি, পড়ার জন্যে বেঁচে থাকা নয়, বেঁচে থাকার জন্যে পড়া। সুতরাং আনন্দ দেওয়াটা পুস্তকাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও গৌণতঃ পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে পাঠককে মানুষের মত বেঁচে থাকবার জন্যে গড়ে তোলা।

উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত বই পরিবেশন করাই যদি পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে পুস্তক সংকলনের সময় পাত্রকেও চিনতে হ'বে এবং বই পাত্র-অনুযায়ী কি-না, তাও জানতে হ'বে।"

উপযুক্ত বই ঃ—কোন্ বই ভালো, কোন্ বই মন্দ তা বিচার করা মহা সমস্যার বিষয় ; কারণ, বইয়ের ভালোমন্দ নির্ভর করবে পাঠকের প্রয়োজন মেটানোর উপর। কোন বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয় ভালো হ'তে পারে ; সাহিত্যের দিক থেকেও তা ভালো হ'তে পারে ; কিন্তু সেই বইয়ের বিষয়বস্তু যদি পাঠকের মনে রেখাপাত করতে না পারে, তা হ'লে পুস্তকাগারের দিক থেকে সে বইয়ের মূল্য বিশেষ কিছু নেই, একথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে।

সাহিত্যের দিক থেকে পুস্তকের মূল্য বিচার করে সাধারণের পুস্তকাগারে পুস্তক সংকলন করলে সংকলন হিসাবে তা ভালো হ'বে বটে, কিন্তু কাদের জন্যে সে পুস্তকসম্ভার ? এ রকম বইয়ের পাঠক যে জনসাধারণের পুস্তকাগারে আসবে, তার নিশ্চয়তা আছে কি ? যদিই বা আসে তাদের সংখ্যা হ'বে অতি নগণ্য। সমাজের বেশীর ভাগ লোকই বাদ পড়ে যাবে পুস্তক-পরিবেশন থেকে। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করলে চলবে না যে, সাধারণের পুস্তকাগারের উপর সকলের সমান অধিকার আছে।

স্থতরাং আমরা দেখছি, বইয়ের সত্যিকারের গুণাগুণ কতটা, তা অপেক্ষা পাঠকের প্রয়োজনের দিক থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে বইয়ের মূল্য কতটুকু, তা পুস্তক-নির্বাচকের ভেবে দেখা দরকার। বইখানি পাঠকের মনকে কতটা আকৃষ্ট করতে পারবে, এই বিষয়ের উপরই পুস্তক-নির্বাচকের মন কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। সাধারণ পাঠক সাহিত্যের উপর লক্ষ্য রেখে মোটেই বই পড়ে না। তারা দেখবে তাদের জীবনের সংগে বইয়ের বিষয়বস্তুর মিল আছে কিনা। একখানি বই পড়ে পাঠক আপনা থেকেই বলে উঠবে "কি স্থন্দর বলেছে ! আমিও তো এই কথাই ভাবি", কিংবা "একথা তো আমি আগে ভাবিনি, অথচ কথাটা খাঁটি সত্যি !"—একখানা বই পড়ে পাঠকের মনে যখন এইরূপ ভাবের উদয় হ'বে তখনই বলতে হ'বে বইখানি ভালো।

পাঠকের মন

কোন বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগারের পাঠকরা কি পড়তে চাইবে তা বুঝতে অস্থবিধা নেই ; কারণ, সেখানে পাঠকগোষ্ঠীর পড়বার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; স্থতরাং, পুস্তক-সংকলনের সীমারেখাও স্থনির্দিষ্ট। কিন্তু জনসাধারণের কোন পুস্তকাগারের পাঠকদের উদ্দেশ্য এক নয় এবং পাঠের প্রয়োজনও বিভিন্ন। নানা রকমের ব্যক্তিত্ব নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়। ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনও বিভিন্ন। স্থতরাং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির মন সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে গেলে

ব্যক্তিগত সমতার উপর নির্ভর করে সারা সম্প্রদায়কে কয়েকটী দলে বিভক্ত করে নিতে হ'বে।

একটি দল বলতে বুঝায় কতকগুলি ব্যক্তি—যা'দের জাতি (স্ত্রী-পুরুষ), শিক্ষা, সামাজিক, আর্থিক ও ব্যবসায়িক অবস্থা সমান। এরূপ সম অবস্থার সমন্বয়ে এক একটি দলের মনের গতি কতকটা সমান হ'বে আশা করা যায় এবং মনের গতি সমান হ'লে তাদের প্রয়োজনও সমান হ'বে, তা আশা করা বিশেষ কিছু অন্যায় হ'বে না। এই দলগুলির প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে পুস্তক সংকলন করলে গ্রন্থাগারিককে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হ'বে না। সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে দলগত উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হ'বে এবং সেই সংগে তাদের প্রয়োজনেরও পরিবর্তন হ'বে। কিন্তু একবার সমাজের প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারলে, পরে প্রয়োজনের যতই পরিবর্তন হ'ক না কেন, তা জানতে গ্রন্থাগারিকের একটুও অসুবিধা হ'বে না ; কারণ, তখন গ্রন্থাগারে পাঠকের প্রয়োজনের মাপকাঠি তৈরী হ'য়ে যাবে। সেই মাপকাঠি হ'চ্ছে পুস্তক-নির্গমনের তালিকা। এই তালিকাকে বিষয়ানুযায়ী যত সূক্ষ্মভাবে সম্ভব সাজিয়ে রাখতে পারলে এবং প্রতি মাসে তা একবার বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারা যা'বে, পাঠক কি বিষয় পড়তে চাইছে এবং কি বিষয় তার পক্ষে পড়তে চাওয়া সম্ভব।

শেষ কথা

বই কি ? পাঠক কেন পড়ে ? পুস্তকাগারের কাজ কি ? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমরা যতটা সংক্ষেপে সম্ভব দিয়েছি। এখন ধরুন, আপনাকে একটি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলন করতে দেওয়া হ'য়েছে—কি কি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে আপনাকে পুস্তক সংকলন করতে হ'বে ?

১। পুস্তকের বিষয়ানুযায়ী পরিবেশন পুস্তকের লোকপ্রিয়তার সমানুপাতে হওয়া চাই এবং নতুন বই কেনা হ'বে এই লোকপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

২। পুস্তক-সংকলন এমন হওয়া চাই যে, সকল রকমের পাঠকের প্রয়োজন সমানুপাতে মেটানো যা'বে। সাহিত্যের দিক থেকে পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিচার না করে পাঠকের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তকের ভালো-মন্দ বিচার করতে হ'বে।

৩। হাল্‌কা উপন্যাসও পুস্তকাগারে রাখতে হ'বে ; কারণ, এইরূপ পুস্তকের লোকপ্রিয়তা আছে।

৪। জনসাধারণের পুস্তকাগার সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিকে সমানভাবে পুস্তক পরিবেশন কর্‌বে।

এই ক'টী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে পুস্তক সংকলন করলে পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য সফল হ'বে, অর্থাৎ সমাজের ব্যক্তিত্বকে পার্থিব ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত করে তাকে যতটা সম্ভব সুখী কর্‌তে পারা যা'বে।

রাষ্ট্র ও গ্রন্থাগার

এ প্রবন্ধে আমরা যা কিছু বলবো তা জনসাধারণের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এবং সেই সংগে দেখাবার চেষ্টা করবো রাষ্ট্রের সংগে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ কি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশী দিনের নয়; তার স্থরু ইংরাজী আমলের মাঝামাঝি সময় থেকে বললেও চলে। গ্রন্থাগারের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ইতিহাস থেকে এটুকু বোঝা যায়, আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগার যে ক'টী গড়ে উঠেছে, তা সবই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত অর্থে। রাষ্ট্রের দেওয়া অর্থে কখনও কোন গ্রন্থাগারের ভিত্তি-স্থাপনা হয়নি।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ইতিহাস থেকে আর একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়—সেটি হ'চ্ছে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যের ক্রম-বিকাশ। যে সব মহানুভব ব্যক্তি গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলবার উদ্দেশ্যের মূলে ছিল জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলা। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা বুঝতে পারলেন, জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে শিক্ষা-কেন্দ্র করে তুললে তা জনপ্রিয় হ'তে পারে না।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে শিক্ষা-কেন্দ্র করে তুলতে পারা যায় যদি জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার মান কি হ'বে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যা'বে জনসাধারণের শিক্ষা, রুচি ও প্রয়োজন এত বেশী বিভিন্ন যে, সেক্ষেত্রে কি মানে শিক্ষা দেওয়া হ'বে তা নির্ণয় করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। উপরন্তু যা'রা স্কুল-কলেজের শিক্ষার কড়াকড়ির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে—তারা যদি বুঝতে পারে গ্রন্থাগারও শিক্ষার ভার নিয়েছে, তা হ'লে গ্রন্থাগারের প্রতি স্বতঃই তাদের একটা বিরাগ আসবে।

এই সব কারণে গোড়ার দিকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, সে উদ্দেশ্যের ক্রমশঃ পরিবর্তন হ'তে লাগলো। ক্রমশঃ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ালো জনসাধারণকে আনন্দের খোরাক যোগানো। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার এখনও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই চলছে এবং সেই কারণেই জনসাধারণের গ্রন্থাগারে উপন্যাস, গল্প এবং ঐ জাতীয় পুস্তকেরই চলন বেশী। কিন্তু অন্য দেশে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধারণকে আনন্দ দেওয়াটা মুখ্য হ'লেও, গৌণতঃ তার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলা অর্থাৎ তাকে নিজের কাছে এবং সমাজের কাছে প্রয়োজনীয় করা—তাকে মানুষের মত বেঁচে থাকবার জন্যে গড়ে তোলা।

মানুষের মত বাঁচতে সকলেই চায়—জীবনে পার্থিব ও নৈতিক সুখ যতটা পাওয়া সম্ভব ততটা সকলেই পেতে চায়; কেবল কেউ তার সুযোগ পায় না, কেউ বা সুযোগ কেমন করে পেতে হয় তা জানে না, আর কেউ বা সুযোগ পেয়েও তা নেয় না। গ্রন্থাগার যে মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে সাহায্য করতে পারে, গ্রন্থাগার যে, যে যেমন ব্যক্তি তাকে তেমনিভাবে সাহায্য করতে পারে, এ ধারণা আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নেই। কিন্তু ঐ না-জানাটার মূলে রয়েছে না-জানানো; অর্থাৎ আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের প্রচারকার্য একেবারে নেই এবং ঐ একই কারণে আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পতন-দশা। এই সব গ্রন্থাগারের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁরা সব দোষটা চাপিয়ে দেন রাষ্ট্রের ঘাড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রকে দোষ দেওয়া ভুল; তার কারণ, যে-কেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ব্যক্তিকে আনন্দ দেওয়া, সে-কেন্দ্রকে রাষ্ট্র অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে যা'বে কেন? তার নিজস্ব বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্র রয়েছে—সেই শিক্ষা-বিভাগ চালাবার জন্যে প্রচুর অর্থ তাকে ব্যয় করতে হ'চ্ছে। যে-কেন্দ্র রাষ্ট্রের কোন কাজে লাগবে না, সে-কেন্দ্রের জন্যে রাষ্ট্র টাকা ব্যয় করবে কেন?

অনেকে মনে করেন, আমেরিকার গ্রন্থাগারের উন্নতির মূলে রয়েছে রাষ্ট্র। কিন্তু তা সত্যি নয়, সেখানেও গ্রন্থাগারের সত্যিকার উন্নতি আরম্ভ হয় এন্ড

কার্ণেগীর মহানুভবতার ফলে এবং আজও সোজাসুজিভাবে রাষ্ট্র গ্রন্থাগারের জন্যে অর্থ ব্যয় করে না। ব্যাপারটায় যেন বেশ একটু আশ্চর্য লাগে! কিন্তু এতে আশ্চর্যান্বিত হ'বার কিছু নেই; তার কারণ, জনসাধারণের গ্রন্থাগার জনসাধারণের এবং জনসাধারণই গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করবে। গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যে যে সামান্য অর্থ ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করতে হয়, সে অর্থ ব্যয় করতে জনসাধারণ মোটেই বিমুখ হয় না। তার কারণ, জনসাধারণ সেখানে গ্রন্থগারের মূল্য বোঝে—গ্রন্থাগার যে তাদের কতটা প্রয়োজন মেটাতে পারে, তা সেখানকার জনসাধারণ জানে।

রাষ্ট্র সে-সব দেশে গ্রন্থাগারের জন্যে টাকা ব্যয় না করলেও কতকগুলি আইনের দ্বারা জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখবার চেষ্টা করে। সে-সব দেশের রাষ্ট্র বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র—যেমন মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল-বোর্ড—এদের ভার দেয় গ্রন্থাগারের ব্যয়-নির্বাহার্থে 'লাইব্রেরী রেট'-এর দ্বারা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করবার জন্যে এবং সেই অর্থের দ্বারাই কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগার পুষ্ট হ'তে থাকে। 'লাইব্রেরী রেট' বাড়ীর উপর এক প্রকার কর ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই করের মান নির্ণয় করা হয় বাড়ীর ভাড়া অনুযায়ী। কিন্তু এ সাহায্যটুকুই বা রাষ্ট্র কেন করবে?

সত্যি কথা বলতে কি, সে-সব দেশে রাষ্ট্র বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে—মুখ্যভাবে গ্রন্থাগার রাষ্ট্রের কোন কাজে সাহায্য না করলেও গৌণতঃ রাষ্ট্রীয় সকল বিভাগের কাজেই গ্রন্থাগার সাহায্যে লাগছে। স্বাস্থ্য-বিভাগকে গ্রন্থাগার সাহায্য করছে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানবার সুযোগ দিয়ে সচেতন করে, রাজনীতি সম্বন্ধে সাহায্য করছে জনসাধারণের মধ্যে নাগরিকতার ভাব জাগিয়ে তুলে। এক কথায় বলতে গেলে, গ্রন্থাগার জনসাধারণকে রাষ্ট্রের কাছে এবং রাষ্ট্রকে জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় ক'রে তুলতে যতটা সক্ষম, ততটা সক্ষম রাষ্ট্র নিজে নয়। তার কারণ, রাষ্ট্র নিজে কোন

প্রচারকার্য করতে গেলেই জনসাধারণ তা সন্দেহের চোখে দেখে—কিন্তু এই প্রচারকার্য গৌণভাবে গ্রন্থাগারের দ্বারা হ'লে তা'তে জনসাধারণ সন্দেহ করবার সুযোগ পায় না; তারা জানে, জনসাধারণের গ্রন্থাগার তাদের নিজের জিনিষ—তাদেরই সেবা করবার জন্যে জনসাধারণের গ্রন্থাগার।

এখন জনসাধারণের গ্রন্থাগার বলতে যে ঠিক কি বস্তু তা জানা দরকার। ধরুন, আমাদের দেশের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কথা। রাষ্ট্র অগাধ টাকা ঢালছে এই গ্রন্থাগারের পিছনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পিছনেও রয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত অর্থ। কিন্তু যে দিন থেকে এই গ্রন্থাগারকে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হাতে নিয়েছে, সে দিন থেকে মনে হয়, এ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা গেছে বদলে; অন্ততঃ জনসাধারণ আর এ গ্রন্থাগারকে নিজের মতন করে দেখেনা, আর দেখা সম্ভবও নয়। তার কারণ, এ-গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গে রাষ্ট্রীয় গন্ধ রয়েছে ছড়িয়ে। উপরন্তু সবচেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে, ঠিক জনসাধারণের কতটুকু সম্বন্ধ আছে এ-গ্রন্থাগারের সংগে? জনসাধারণের মধ্যে ক'জন এ-গ্রন্থাগারের সংগে পরিচিত?

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে জনসাধারণের সকল স্তরের ব্যক্তির রুচি, শিক্ষা ও প্রয়োজন-অনুযায়ী ক'রে পুস্তক পরিবেশন করা। সত্যি কথা বলতে কি, জনসাধারণের গ্রন্থাগারিকের হওয়া চাই সুদক্ষ রাঁধুনীর মত—অভ্যাগতদের মধ্যে কা'র কিরূপ ব্যঞ্জনের প্রয়োজন তা তাঁকে জানতে হ'বে এবং অভ্যাগতদের সংগে তাঁর সম্যক পরিচয় না থাকলে তাদের রুচি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত রুচি-অনুযায়ী পুস্তক পরিবেশন করা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারের দ্বারা সম্ভব হয় না; কারণ, সেখানে রাষ্ট্র নিজের স্বার্থ বজায় রাখবার চেষ্টা করবেই এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে পুস্তক পরিবেশন করাও সম্ভব নয়।

আমরা আগেই বলেছি, জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হ'বে জনসাধারণকেই এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে না ওঠার জন্যে রাষ্ট্রকে

দোষ দেওয়াও অন্যায়। রাষ্ট্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এগিয়ে আসবে গ্রন্থাগারকে সাহায্য করবার জন্যে তখন, যখন রাষ্ট্র দেখবে জনসাধারণের গ্রন্থাগার মুখ্যভাবে না হ'লেও গৌণভাবেও রাষ্ট্রের কাজেই সাহায্য করছে।

আমাদের গ্রন্থাগার এখনও সে অবস্থায় আসেনি; তার কারণ, গ্রন্থাগারের যতটা প্রচার হওয়া উচিত, তা হয় নি। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের জনসেবার কাজে কতদূর বিস্তৃতি, তা কারুর জানা নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগার যে কত উপায়ে সাহায্য করতে পারে, সেটুকু জনসাধারণকে বার বার বিজ্ঞাপনের দ্বারা, পুস্তিকার দ্বারা—যে কোন উপায়ে হ'ক, জানিয়ে দিতে হ'বে। এ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য গ্রাহক সংগ্রহ করা নয়—এ-বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য "গ্রন্থাগার আছে" এটুকু সকলকে জানিয়ে দেওয়া। ক্রমশঃ জনসাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠবে, তখন রাষ্ট্র গ্রন্থাগারকে সাহায্য করবার জন্যে যদি কর-আদায়ের ব্যবস্থা করে, জনসাধারণ তাতে আপত্তি করবে না। যাঁরা জন-সাধারণের গ্রন্থাগার নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা তো আপত্তি করবেনই না, যাঁরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না, তাঁরাও কোন আপত্তি করবেন না, অন্ততঃ রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্কহীন জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহ এটুকুই মনে করে।

দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ

পুস্তকের বিরলতা ও দাম—একটির উপর আর একটি প্রায় সব সময়েই নির্ভর করে। সাধারণতঃ পুস্তকের বিরলতা হ'চ্ছে পুস্তকের বহুমূল্যতার একটি কারণ। আবার অনেক সময় পুস্তকের বিরলতা নির্ভর করে পুস্তকের বহুমূল্যতার উপর ; কারণ, বই-প্রকাশের ব্যয় বেশী হওয়ার দরুণ বইয়ের মূল্য বেশী হয়, ফলে বইয়ের প্রচলন হয় কম।

সত্যিকারের কিরূপ বইকে বিরল বলা চলে? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। বিরল কথাটাকে খুব সাধারণভাবে বিচার করে দেখলে বলতে হয়, যে-সব বই বাজারে সহজে মেলে না, সে-সব বইকেই বিরল বলা চলে। বিশেষ করে যে-সব বইয়ের মাত্র একটি সংস্করণ হ'য়েছে এবং যে-সব বইয়ের মাত্র কয়েক-খানি সংখ্যা বাজারে বর্তমান সেই সব বইকেই বিরল বলা চলে। তা হ'লে বলতে হয়, সুলভ বই অপেক্ষা বিরল বইয়ের সংখ্যাই অনেক বেশী। কারণ, বাজারে সুলভ বা চলতি বই অপেক্ষা দুর্লভ বা অচল বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশী, একথা কেউই অস্বীকার করবেন না। সুতরাং, কেউ যেন এ ধারণা না করেন যে, গ্রন্থাগারে পুরাণো ও অচল বইয়ে ভরা থাকলেই গ্রন্থাগারের মূল্য বাড়ে। অচল বই মরা মানুষের মত—বই অচল হয়ে গেলে তাকে গ্রন্থাগার থেকে বাতিল করে দেওয়াই দরকার। তাতে চলতি বইয়ের সংকুলান হবে এবং গ্রন্থাগারের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

পুস্তক-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার ক'রে দেখতে গেলে "বিরল" কথাটা ব্যবহার করা যায় কেবলমাত্র সেই সব বইয়ের ক্ষেত্রে, যে-সব বই সহজে পাওয়া যায় না, অথচ যার চাহিদা আছে।

বিরলতার আবার স্তর আছে। বই বিরল এবং অবস্থানুযায়ী বিরল হতে পারে। কোন এক দেশে একখানি বই বিরল হ'তে পারে, আবার সেই একই

বই আর এক দেশে অ-বিরল হ'তে পারে। আবার এমনও হ'তে পারে যে, চাহিদার অনুপাতে যথেষ্টসংখ্যক বই বাজারে ছাড়া হয়নি বলে কোন বই বিরল হ'য়ে গেছে। সুতরাং, এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বই মূল্যবান না হ'লেও বিরল হ'তে পারে, কিন্তু বিরল না হ'লে বই বড় একটা বহুমূল্য হ'য়ে পড়ে না। এই দু'টি অবস্থার সমন্বয় হ'লেই তবে কোন একখানি বইকে সত্যিকারের বিরল ও মূল্যবান বলা চলে।

যাই হোক, বইয়ের ভালো-মন্দের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন পুস্তকাগারে পুস্তক-সংগ্রহের দিক থেকে দেখা যাক, কত রকম উপায়ে ব্যবসায়ের দিক থেকে একখানি বইয়ের মূল্য বাড়তে বা কমতে পারে।

এই বিষয়টাই আমরা এ-প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করবো; অর্থাৎ একখানি বইয়ের জন্ম থেকে আরম্ভ করে বাজার থেকে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত সেই বইখানিকে যে যে অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, সেই সেই অবস্থা অনুসারে কেমন করে বইখানির মূল্য কমে-বাড়ে এবং তা কেমন করে বিরল বা অ-বিরল হয়, তা-ই আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো।

একখানি বই যখন বিক্রয়ার্থে বাজারে বার করা হয় তখন তার মূল্য নির্ভর করে বইখানির পাতার সংখ্যা, ছাপা ও কাগজের গুণাগুণ, অলংকার ও ছবির উপর। বইখানি যদি সাধারণের সম্পত্তি হয় (লেখকের মৃত্যুর ৫০ বছর পরে একখানি বই সাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায়), তাহ'লে বইখানির মূল্য বেশী হবে না। কারণ, সেরূপ বই অনেকেই প্রকাশ করবেন (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন সংস্করণ) এবং বাজারে সে-সব বই-বিক্রয়ের বেশ একটা প্রতিযোগিতা চলবে। কিন্তু কোন জীবিত বা সুপ্রসিদ্ধ লেখকের বই হ'লে তার মূল্য নির্ভর করবে বইখানির স্বত্ব কেনবার জন্যে প্রকাশক লেখককে যে টাকা দিয়েছে, সেই টাকার পরিমাণের উপর। বইয়ের এই দু'টি অবস্থা থেকে সৃষ্টি হবে একটি অবস্থার। হয় বইখানি পাঠক-সমাজে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করবে এবং চাহিদা বাড়বে, ফলে সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপা হ'তে থাকবে এবং মূল্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে,

আর না হয়, বইখানির কোন চাহিদা হবে না এবং কোনক্রমে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হ'লে আর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হবে না, আর চাহিদার অভাবে বইয়ের মূল্যও কমতে থাকবে। খুব ভালো বইয়ের মূল্যও চাহিদার অভাবে এমনিভাবে কমে যেতে পারে। এমন কি, অতি সাধারণ বই অপেক্ষাও মূল্য কমে যেতে পারে। ধরুন, এক সময়ে বাজারে বিজ্ঞানের একখানি বইয়ের খুব প্রচলন ছিল এবং বইখানি একখানি আদর্শ পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হতো, পরে ঠিক একই ধরণের আর একখানি বই বার হ'লো বিজ্ঞানের পরিবর্তিত এবং নতুন মতামত সমন্বিত হয়ে ; ফলে পূর্বের বইখানি অযোগ্য হয়ে পড়লো এবং বইখানির মূল্য ক্রমশঃ কমতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত প্রচলনের অভাবে বইখানির কোন মূল্যই থাকলো না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বইয়ের এ-অবস্থা হয় খুব বেশী ; তার কারণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মতামত রোজই পরিবর্তিত হ'চ্ছে এবং নিত্য-নূতন মতামতের সৃষ্টি হ'চ্ছে। এইরূপে কোন কোন বই সময় মত অচল হ'য়ে ক্রমশঃ বিরল হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু আবার এমন সময় আসতে পারে, যখন হঠাৎ এই সব বইয়ের চাহিদা বেড়ে যেতেও পারে। যেমন ধরুন, কিতিকারের ইণ্ডিজিনাস হারবস্।

অনেক সময় কোন এক প্রতিষ্ঠিত লেখকের কোন একখানি বইয়ের প্রথম সংস্করণ নিয়ে সত্যিকারের বিদ্বান ও পুস্তক-প্রেমিকদের মধ্যে বিবাদ বাধে বইখানির প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা যায় কিনা, এই নিয়ে। কোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের কোন বইয়ের প্রথম সংস্করণের একটা বিশেষ মূল্য যে আছে, তা সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন ; কারণ, প্রথম সংস্করণে যে আসল বইখানির পূর্ণত্ব বজায় থাকবে, তা আশা করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে ঐ একটিমাত্র কারণেই একখানি বই কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে পড়তে পারে এবং তা প্রচুর মূল্যে বিক্রয় হ'তে পারে। মানব-মনের চিন্তাধারার ইতিহাস নির্ণয় করবার জন্যে একখানি পুরাতন ও অচল বিজ্ঞানের বইও হঠাৎ প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠতে পারে। তখন বইখানির নতুন অবস্থায় যা দাম ছিল তার অপেক্ষা অনেক বেশী

মূল্যে বইখানি বিক্রয় হ'তে পারে। বাজারে না চলার দরুণ যে-সব বই অচল হ'য়ে গেছে, সে-সব বইয়ের মধ্যে কোন কোন বই কোন এক বিষয়ের পুস্তক-সংকলনের পরিপূরক হিসাবে বা কোন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকার দরুণ মূল্যবান হ'য়ে পড়তে পারে। এই সব কারণে সত্যি-কারের পুস্তক-প্রেমিকরা কোন একটি সহরের বা প্রদেশের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত সকল বই-ই সংগ্রহ করেন, কিংবা সেই সহরের বা সেই প্রদেশের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সব রকমের বই জড়ো ক'রে রাখেন। ফরাসী চন্দননগরে এরূপ একটি সংকলনের চমৎকার নমুনা আছে শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের বাটীতে। এই সংকলনে চন্দননগরের লোকের দ্বারা লিখিত বা চন্দননগরে প্রকাশিত ৩৫০খানি পুস্তক ও পুস্তিকা আছে।

সমাজের হাবভাব, আচার-ব্যবহার এবং শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কোন কোন বইকে মূল্যবান ক'রে তোলার এক একটি কারণ। যেমন ধরুন, ভারত স্বাধীন হ'বার আগে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে কত বই বার হয়েছিল, কিন্তু তখন সে-সব বই সময়মত একটা উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অচল হ'য়ে পড়েছিল, কিংবা জোর করে সেগুলিকে অচল করে দেওয়ার দরুণ জনসাধারণ সে বইগুলির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু ভারত স্বাধীনতা পাবার সংগে সংগে সে-সব বইয়ের চাহিদা আবার বেড়ে উঠলো। এখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পরিচালিত "সন্ধ্যা" কাগজের সম্পূর্ণ সংখ্যা বাজারে বহু দামে বিক্রী হ'তে পারে। এই "সন্ধ্যা" কাগজের অনুসন্ধান বিশেষ বিশেষ স্থানে—যেমন চন্দননগরে, সমস্তিপুরে ও লক্ষ্ণৌ-এ কি ভীষণ-ভাবে যে হয়েছে, তা বর্ণনা করা যায় না।

একখানি বই প্রথম বার হবার সময় হয়তো তা বাজারে বিশেষ নাম করতে পারলো না, কিন্তু বিদ্বজ্জনের মতামত বইখানিকে হঠাৎ মূল্যবান ক'রে তুলতে পারে। যেমন ধরুন, 'দৃষ্টিপথ' বইখানি। অবশ্য মতামতই কেবল বইখানিকে মূল্যবান ক'রে তোলেনি, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে বিজড়িত থাকাও বইখানির প্রচলনের একটা প্রধান কারণ।

কোন একটি রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় অনুরূপ কোন বিপ্লবের ইতিহাসের বইয়ের চাহিদা বাড়বে; কারণ, অনেকেই জানতে চাইবে অনুরূপ ক্ষেত্রে মানব-মনের চিন্তাধারা কি ধরণের ছিল, কি ধরণের মতামত মানব-মনকে নিবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। শান্তি-চুক্তি, বৈজ্ঞানিক ভ্রমণ, এমন কি সাহিত্য নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ফলেও কোন পুস্তকের চাহিদা বাড়তে পারে। কিন্তু পুস্তকের এইরূপ পুনর্জন্ম হবার প্রধান কারণ হ'চ্ছে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিত-কলা—এই সব বিষয়ের মতামতের ক্রমবিকাশ।

অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক বই

অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক বই বলতে যে কিরূপ বইকে বুঝায়, তা বলা কঠিন। তবে এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, বইয়ের কৌতূহলোদ্দীপকতা নির্ভর করে এই ধরণের বই যাঁরা সংগ্রহ করেন, তাঁদের খেয়ালের উপর। আগেকার দিনে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মতামত-সমন্বিত বই অনেকে বহুমূল্য দিয়ে সংগ্রহ করতেন; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়া এ-সব বইয়ের সত্যিই কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বিজ্ঞান, কলা এবং ব্যাকরণের উপর প্রবন্ধ বা বই, যা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই সব বই এই ধরণের বইয়ের মধ্যে ধরা যায়। মধ্যযুগের কবিদের নীতি-পুস্তক, কবিতার বই ও হাস্য-কৌতুকের বই—এইরূপ বইকেও অদ্ভুত বা কৌতূহলোদ্দীপক বলা চলে। এই সব বইয়ের মধ্যে একজাতীয় বই থাকে যার মৃত্যু হয় না। অন্যান্য বইয়ের মূল্য নির্ভর করে নগণ্য কোন ঘটনার উপর। পুস্তক-প্রেমিকেরা কিন্তু পুস্তকের মূল্যের কারণ তলিয়ে দেখেন না। এমনও দেখা যায় যে, পুস্তক-প্রেমিক দলের কোন এক নেতা কোন একখানি পুস্তককে মূল্যবান ব'লে চালিয়ে দিতে পারেন। একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন, যাঁরা পুস্তকের সঙ্গে একটা আকর্ষণ জুড়ে দেবার কলা ভালোভাবে জানেন, তাঁদের মধ্যে কোন একজনের হাতে ঘটনাচক্রে সম্পূর্ণভাবে ভুলে-যাওয়া একখানি বই এসে পড়লো; সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি বইখানির মধ্যে কোন একটি

কৌতূহলোদ্দীপক অনুচ্ছেদ, কয়েকটি অদ্ভুত কথা বা কোন এক সুপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন বিদ্রূপপূর্ণ ইঙ্গিত পেলেন। এরূপ অবস্থায় সূক্ষ্মবুদ্ধি পুস্তক-প্রেমিক তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি প্রাণময় প্রবন্ধ কোন দৈনিক বা মাসিকে প্রকাশ করলেন। সেই প্রবন্ধ পড়ে সখের পুস্তক-সংগ্রাহকেরা বইখানির কপি যোগাড় করবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠলেন। তখন সেই ভুলে-যাওয়া নিতান্ত অকেজো বইখানিও অমূল্য হ'য়ে উঠলো। অবশ্য বইখানি সংগ্রহ করবার উত্তেজনা শীঘ্র কমে যাবে, কিন্তু বইখানি অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক ব'লে দামী বই হিসাবে বহুকাল বাজারে পরিচিত থাকবে।

পুস্তক-নির্বাচন

আমরা পূর্বেই বলেছি, বইয়ের চাহিদা থাকে বলেই বই ছাপা হয়। যে-বইয়ের চাহিদা নেই সে-বই ছেপে বার করার কোন মানে হয় না। বইয়ের চাহিদা থাকলেও সাধারণের বই কিনে পড়বার মত সামর্থ্য নেই। বই পড়বার ইচ্ছে থাকলেও, সামর্থ্যের অভাবে সাধারণকে মনের ইচ্ছে মনের ভেতরই চেপে রাখতে হয়। গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে সমাজের বই পড়বার আকাঙ্ক্ষা মেটানো বা বইয়ের চাহিদা মেটানো। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে যতটুকু সুযোগ ও সুবিধা সাধারণকে বই পড়বার জন্যে দেওয়া সম্ভব, ততটুকু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। সেইজন্যে গ্রন্থাগারকে সমাজ-দেহের একটি অঙ্গ হিসাবে ধরে নিতে হ'বে। সমাজের মনের খোরাক যখন যেটুকু দরকার, তা যে গ্রন্থাগার যোগাতে পারবে না, সে গ্রন্থাগার থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে সমাজের সেবা করা; কিন্তু চাহিদা না থাকলে সেবা করা চলে না। গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্ভার যদি কাজে না লাগবার মত হয়, তা হ'লে সেরূপ গ্রন্থ-সম্ভারের কোনই মূল্য থাকে না; সুতরাং, পুস্তকের নির্বাচন যদি চাহিদার উপর নির্ভর ক'রে করা হয়, তবেই সে নির্বাচনের মূল্য থাকে।

তা হ'লে আমরা দেখছি, পুস্তক-নির্বাচনের দুটি দিক: চাহিদা ও চাহিদা পূরণ করা।

চাহিদা পূরণ করবার মত পুস্তক-সম্ভার পুস্তকাগারে না থাকলে সে পুস্তকাগারের কোন মূল্যই থাকে না আর পুস্তক নির্বাচন করার পরও যদি পুস্তকের চাহিদা মেটাতে না পারা যায়, তা হ'লে সে পুস্তক-নির্বাচনেরও কোন মূল্য থাকে না।

পুস্তক নির্বাচন করার আগে আঁচ করা দরকার, চাহিদা কতটা এবং চাহিদার মূল্যই বা কতটুকু। চাহিদা কতটা এবং চাহিদার মূল্য কতটুকু আঁচ করতে না পারলে কি-পরিমাণ বই গ্রন্থাগারে রাখতে হ'বে তা আমরা ধারণা করতে পারব না।

মানুষ বই পড়ে তার ব্যক্তিগত মনের উন্নতির জন্যে—কেউ বা কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করবার জন্যে, কেউ বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জন করবার জন্যে। সুতরাং, পুস্তকের চাহিদার অনুমান করতে হ'বে চাহিদার প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ কোন্ বিষয় কার কাছে কতটা প্রয়োজনীয়, তা জানা কেমন করে সম্ভব? মানুষের বই পড়ার প্রয়োজন তার পার্থিব উন্নতির জন্যে, মনের উন্নতির জন্যে, না হয় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে। কিন্তু কোন্‌টি বেশী প্রয়োজনীয়, কোন্‌টি অল্প প্রয়োজনীয় বা কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয়, তা কেমন করে বোঝা সম্ভব?

কিন্তু একটা কথা তো আমরা জানি: মানুষের জন্মগত উদ্দেশ্য হ'চ্ছে নিজেকে বড় ক'রে তোলা, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করা—জীবনে যতটা আনন্দ পাওয়া সম্ভব ততটা আনন্দ পাওয়া এবং যতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব ততটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা। মানুষের উদ্দেশ্য যদি হয় ব্যক্তিকে বিকাশ করা, তা হ'লে যে-কোন বিষয় ব্যক্তি-বিকাশকে সাহায্য করবে, সেই বিষয়ের বই-ই গ্রন্থাগারে রাখতে হ'বে। ভালো করে ভেবে দেখলে এটুকু সকলেই বুঝতে পারবে যে, জ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা মানুষের ব্যক্তি-বিকাশে সাহায্য করে না। সুতরাং যত রকমের বিষয় আছে তত রকমের চাহিদা থাকবে এবং গ্রন্থাগারকে সব রকমের চাহিদাই মেটাতে হ'বে, আর সেজন্যে সব বিষয়ের বই-ই রাখতে হ'বে। কেবল যে বইগুলি মানুষকে বিকাশের পথে সাহায্য করবে না, উপরন্তু তার বিকাশের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে, সেই বইগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। ধরুন, এমন একখানি উপন্যাস, যা'র ভিতরে মানব-জীবনের যথাযথ ছবি ভাষার দ্বারা ফুটিয়ে তোলা আছে এবং যেখানে

মানব-জীবনকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে—ব্যক্তিগত জীবনকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এরূপ উপন্যাসের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। আবার এমন অনেক উপন্যাস আছে যা'র ভিতরকার ছবি মোটেই বাস্তব নয়। এমন উপন্যাসেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; কারণ, তা মানুষের কল্পনা-শক্তিকে ফুটিয়ে তোলে। আবার এমন একখানি উপন্যাস থাকতে পারে যা'র ভিতর বাস্তব-জীবনকে অবাস্তবতার অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে—এমন বই মানব-মনের বা মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন করতে পারে না; সুতরাং সেরূপ উপন্যাস অল্প-প্রয়োজনীয়। অতি অল্প-প্রয়োজনীয় পুস্তকের মধ্যেও কোনখানে হয়তো এমন একটি জ্ঞানগর্ভ কথা থাকতে পারে, যা মানুষের কল্পনা-শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং কোন্ বইটি প্রয়োজনীয়, কোন্‌খানি অল্প-প্রয়োজনীয় ও কোনখানি অপ্রয়োজনীয় তা বুঝে উঠতে হ'লে, মানব-জীবনের সংগে পুস্তক-নির্বাচকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা দরকার।

কোন বই প্রয়োজনীয় কিনা, তা যেমন নির্ভর করবে বইখানির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ক্ষমতার উপর, তেমনি নির্ভর কর্‌বে এই গুণের উপর পুস্তকের মূল্যের স্থায়িত্ব। সভ্যতার সংগে সংগে মানুষের বাইরের বহুল পরিবর্তন হ'চ্ছে সত্য, কিন্তু মানব-মনের মৌলিকত্ব অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়; সেইজন্য যে পুস্তকের অভিপ্রায় যত মূলগত হ'বে, সেই বইয়ের মূল্যও তত বেশী দিন স্থায়ী হ'বে।

এ তো গেল মানুষের মনের এবং ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দিক থেকে পুস্তকের প্রয়োজনীয়তার কথা। এইবার মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের জন্যে পুস্তকের চাহিদার কথা ভাবা যাক। বাঁচতে গেলে মানুষকে খেতে হ'বে; সুতরাং, খাদ্য মানুষের একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু; আগে মানুষকে বেঁচে থাকবার কথা চিন্তা করতে হ'বে, তবে সে মনের উন্নতি করবার কথা চিন্তা করবার সময় পাবে। পার্থিব প্রয়োজনের চেয়েও মনের উন্নতির প্রয়োজন বেশী স্বীকার করি, কিন্তু মনের উন্নতির উপায়টাকে তো আগে বিচার করে দেখা দরকার। পূর্বে আমরা

পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণ করছিলাম ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে "মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'বে" তার ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করবার জন্যে। সুতরাং মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতার উপরই বইয়ের মূল্য নির্ভর করবে।

এই তো গেল বইয়ের মূল্য নির্ভর করবার দুটি দিক। কিন্তু সকলে কি বই পড়ে বইয়ের মূল্য আছে বলে? একটু ভেবে দেখলেই দেখবেন, বইয়ের মূল্য আছে কি না আছে, অনেকেই তা ভেবে দেখেনা; তারা বই পড়ে সময় কাটাবার জন্যে বা আমোদ পাবার জন্যে। একজন যে বিষয়ে আনন্দ পায়, আর একজন হয়তো সে বিষয় বুঝতেই পারবে না। সব বিষয় থেকেই আমোদ পাওয়া যেতে পারে। তবে কে কোন্ বিষয় থেকে আনন্দ পাবে, সেটা ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে। ধরুন, মনোবিজ্ঞানের কথা। কেউ এ বিষয়টি পড়ে আমোদ পাবে, আবার কেউ এ বিষয়টি পড়বে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাবার জন্যে। এইরূপ বিষয়ের প্রয়োজনের দুইটি দিক আছে: একটি হ'চ্ছে পার্থিব প্রয়োজনে পড়া, আর একটি হ'চ্ছে আমোদের প্রয়োজনে পড়া। আবার এমন অনেক বিষয়ও আছে যা'র প্রয়োজন কেবল আমোদের জন্যে বা সময় কাটাবার জন্যে।

মনের উন্নতির জন্যে পড়া আর কেবলমাত্র আনন্দের জন্যে পড়া—এদু'টি বিষয়ের একটি থেকে অপরটিকে কি কার্য্যতঃ পৃথক করা যায়? এমন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে—যে কেবলমাত্র আমোদের জন্যে বই পড়ে, অথচ বলতে পারে কোন বই কখনও তার মনের উপর রেখাপাত করেনি? কোন বই থেকে কখনও সে কোনরূপ প্রেরণা পায়নি? এমন মানুষ আছে বলে তো মনে হয় না। যদিই থাকে তা হ'লে বলতে হ'বে, সে বই পড়েও পড়েনি। পড়লে জ্ঞান বাড়বেই। যদি না বাড়ে, তা হ'লে বলতে হ'বে সে পড়া পড়াই নয়। কিন্তু এমন বইও আছে, যা কেবল সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, স্থায়িভাবে মনের উপর কোন প্রভাব রাখতে পারে না। সুতরাং আমোদের জন্য বই

পড়ার দু'টি ফল—একটি হ'চ্ছে ক্ষণিক আনন্দ, আর একটি হ'চ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন।

কিন্তু ভুললে চলবে না, "ক্ষণিক আনন্দ" মানুষের সভ্যতার উন্নতির সংগে সংগে অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। একবার সিনেমার কথা ভেবে দেখুন। গত যুদ্ধের আগে সিনেমার অবস্থা যা ছিল আজ আর তা নেই; সিনেমা-ঘরগুলো আজ আর মানুষকে ঠাঁই দিতে পারে না। টিকিটের মূল্য বাড়লেও আজ পূর্বের চেয়ে বহু বেশী লোক সিনেমায় যায়। তাদের পয়সা বেশী হ'য়েছে বলে যায়, একথা কেউই স্বীকার করবেন না। তবে কেন তারা যায়? তারা যায়, তার কারণ হ'চ্ছে, উপস্থিত অবস্থার প্রভাবে সমাজ-মনের যে ক্ষতি-হ'চ্ছে, তা পূরণ করবার জন্যে। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে, এরূপ ক্ষণিক আনন্দ হ'চ্ছে "মিথ্যা ক্ষতিপূরণ" (False Compensation)। এরূপ মিথ্যা ক্ষতি-পূরণেরও প্রয়োজন আছে; তার কারণ, মানুষকে বাঁচতে হ'বে। সুতরাং গ্রন্থাগারিক হিসাবে ক্ষণিক আনন্দ দেবার জন্যেও আমাদের পুস্তক সরবরাহ করতে হ'বে। তবে আশা এই যে, জ্ঞান-বিবর্জিত কোন বই থাকতে পারে বলে মনে হয় না, আর পড়ে না পড়ার মত মানুষও জগতে বিরল।

কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না—গ্রন্থাগারের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সমাজ-মনের উন্নতি করা এবং সমাজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করা। সেইজন্যে ক্ষণিক আনন্দের ভিতর দিয়েও মানব-মনের উন্নতি ও সমাজের ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপকরণ যদি কিছু দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করা উচিত।

অনেকেই বলে: "জন্মেছি যখন, তখন কোন রকমে দিনগুলো কাটিয়ে চলে যেতে পারলেই হ'লো।" এ কথা যারা বলে, তারা মানুষ কি না, ধারণা করা একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে। মানুষ যুগ যুগ ধরে জন্মে আসছে, যুগ যুগ ধরে মানুষ মরেও যাচ্ছে। কিন্তু প্রতি যুগই নতুন যুগের মানুষকে একটা করে ধাক্কা দিয়ে তা ক বিকাশের পথে এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। জন্মান আর মরা—এই যদি মানুষের উদ্দেশ্য হ'তো, তা হ'লে মানুষ এতদিন মরে ভূত হ'য়ে যেতো—পৃথিবীতে তার

চিহ্নও থাকতো না। এত বড় কথার ভেতর হয়তো খুব কম লোকেই ঢুকতে চাইবে, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে প্রয়োজনীয় ক'রে তোলায় তো লাভ আছে; সুতরাং নিছক আনন্দের ভিতর দিয়ে নিজের মূল্য কিছুটা বাড়াতে পারলে ক্ষতি কি? তা হ'লে—

(১) প্রথম কথা হ'চ্ছে "মানুষকে বাঁচতে হ'বে", তবে সে তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবার সময় ও সুযোগ পাবে।

(২) ব্যক্তি-বিকাশের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন দ্বিতীয় স্তরের।

(৩) তৃতীয় কথা হ'চ্ছে, "ক্ষণিক আমোদের" জন্যে বই পড়া দরকার, কিন্তু ক্ষণিক আমোদের ভিতর দিয়ে যদি মানব-মনের উন্নতি সম্ভব হয়, তবে তা-ই করা উচিত। শেখবার বইয়ের দ্বারাই যখন ক্ষণিক আনন্দ দেওয়া সম্ভব, তখন কেবলমাত্র আনন্দের জন্য যে-সব বই, সে-সব বইকে দ্বিতীয় স্তরে ফেলা যায়।

কলম আছে তাই নিব দরকার হয়, নিব আছে তাই কালি—এই কলম, নিব আর কালি—এই তিনটী বস্তুর সম্পর্ক পরস্পর বিজড়িত, একটী ছাড়া আর একটীর মূল্য হয় না—একটী আছে বলেই আর একটীর মূল্য। সেই রকম বিষয়ের মধ্যেও একটী বিভাগ আছে। যেমন ধরুন, সমাজতত্ত্বের কি মূল্য থাকতো যদি সমাজের এক একটী অঙ্গ না থাকতো? ইতিহাস পড়ার মূল্য কিছুই থাকে না, যদি ইতিহাসের ঘটনাগুলির গুরুত্ব ঠিক মত উপলব্ধি করতে না পারা যায়। সুতরাং প্রত্যেক বইকে বিচার করে দেখতে গেলে প্রথমে আমাদের দেখতে হ'বে বইখানির ভিতরে বিষয়ের প্রাথমিক জিনিষগুলি ঠিকভাবে বিচার করা আছে কিনা। সাবানের কারখানা হ'লো সাবান তৈরী করবার জন্যে, কিন্তু সাবান করতে গিয়ে দেখা গেল গ্লিসারিণ একটী আনুষঙ্গিক বস্তু। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সাবান তৈরী করা; সুতরাং, প্রথম প্রয়োজন হ'চ্ছে সাবান তৈরী করা। সাবান তৈরী করতে গিয়ে যদি গ্লিসারিন পাওয়া যায় তো মন্দ কি; তবু গ্লিসারিন তৈরী করা আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। তেমনি এমন অনেক

বিষয় আছে যা শিখতে গেলে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা সংগে সংগে হ'য়ে যায়। এই শেষোক্ত বিষয়গুলি শেখা হয় কেবল মাত্র আমোদের খাতিরে। আসল বিষয়গুলি সম্বন্ধে বই রাখতে গেলে আমাদের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির উপরও কিছু বই রাখতে হ'বে, কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে।

গ্রন্থাগারিকের প্রধান গুণ হ'চ্ছে প্রত্যেক বিষয়ের মূল্যের অনুপাত নির্ধারণ করা ঃ

প্রত্যেক বিষয়ের মূল্যের অনুপাত নির্ধারণ করবার জন্যে বহু চেষ্টা হ'য়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারে কোন্ বিষয়ের কি অনুপাতে কত বই থাকা প্রয়োজন তার একটি নমুনা দেওয়া হ'লো। কিন্তু মনে রাখবেন, নিয়মগুলি বাঁধা-ধরা নয়। কেন, তা আমরা পরে বলবো।

এক এক জাতির বইয়ের শতকরা অনুপাত

জাতি ০০০ সাধারণ	...	...	৩%
১০০ দর্শন	...	...	৪%
২০০ ধর্ম্ম	...	...	৫%
৩০০ সমাজ বিজ্ঞান	...	...	৭%
৪০০ ভাষা বিজ্ঞান	...	...	৪%
৫০০ বিজ্ঞান	...	...	৯%
৬০০ ব্যবহারিক বিজ্ঞান	...	...	৯%
৭০০ ললিত কলা	...	...	৭%
৮০০ সাহিত্য	...	...	২৮%
৯০০ ইতিহাস	...	...	৮%
জীবনী	...	...	৮%
ভ্রমণ	...	...	৮%
			১০০

পুস্তকের চাহিদার অনুপাত-নির্ধারণ

পুস্তকের চাহিদা আছে। পুস্তকাগার থাকলেও চাহিদা থাকবে, না থাকলেও চাহিদা থাকবে। পুস্তকাগার যখন কম ছিল তখনও চাহিদা ছিল, চাহিদা এখনও আছে। পুস্তকাগার যদি চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারতো তা হ'লে তো ভালোই হ'তো, কিন্তু সব চাহিদা মেটানো কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পুস্তকাগার-বিজ্ঞান যত উন্নত হ'চ্ছে, পুস্তকাগারের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুস্তকাগার-পরিচালন ক্রমশঃ ভালো-ভাবে হ'চ্ছে, ফলে পুস্তকাগার ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে পুস্তকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হ'চ্ছে। পুস্তকাগারের কাজ হ'চ্ছে সমাজের সেবা করা—সমাজের প্রয়োজন মেটানই হ'চ্ছে পুস্তকাগারের কাজ; পুস্তকাগার কখনও সমাজের ইচ্ছা বা প্রয়োজনের সৃষ্টি করে না। পুস্তকাগারে কত বই রাখতে হ'বে, তা পুস্তকাগারের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

চাহিদা দু'রকমের: প্রকৃত ও সম্ভাব্য। শিক্ষার উন্নতির সংগে সংগে যে চাহিদা ক্রমশঃ হ'তে থাকে, সেই চাহিদাকে বলে সম্ভাব্য চাহিদা।

চাহিদার আর একটী বিভাগ হ'চ্ছে—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত।

প্রকাশিত চাহিদা হ'চ্ছে সেই সকল চাহিদা, যে চাহিদা রয়েছে অথচ গ্রন্থাগার তা মেটাতে পারেনি, আর গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রন্থসম্ভারের যে ব্যবহার হ'য় তা থেকেও প্রকাশিত চাহিদা কতকটা বোঝা যায়।

চাহিদাকে এরূপভাবে বিভাগ করলেও চাহিদার পরিমাণ ঠিকমত বোঝা যায় না; কারণ, এমন অনেক পাঠক আছে যা'রা "দুধের অভাবে ঘোলে" সাধ মিটিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বোঝবার কোনই উপায় নেই কত লোককে আমরা "দুধের" পরিবর্তে "ঘোল" দি।

অপ্রকাশিত চাহিদা হ'চ্ছে সেই সব চাহিদা যেগুলি গ্রন্থাগার মেটাতে পারে, কিন্তু সাধারণে জানে না। সে চাহিদাগুলি গ্রন্থাগারেরই মেটানো কর্তব্য।

এমন অনেক পাঠক আছে, যা'রা কি চায় ঠিক বলতে পারে না অথচ যা পায় তাইতেই সন্তুষ্ট হয়। এমন অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়গুলির দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট করতে পারলে মানুষের জীবন অনেকটা আনন্দময় হ'য়ে উঠতে পারে এবং ফলে সেই সকল বিষয়ের চাহিদা প্রকাশ পেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পুস্তকাগারের কাজ হ'চ্ছে নতুন চাহিদার সৃষ্টি করা।

কিন্তু প্রকাশিত চাহিদার উপরই আমাদের বেশী ক'রে নজর দিতে হ'বে ; কারণ, প্রকাশিত চাহিদা থাকলে, যে বই আমরা রাখবো সে বই কাজে লাগবেই, এটুকু আমরা আশা করতে পারি। অপ্রকাশিত চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখে বই রাখলেই যে সে বই ব্যবহৃত হ'বে, তা আমরা জোর করে বলতে পারি না।

প্রকাশিত চাহিদা যত ভালোভাবে গ্রন্থাগার মেটাতে পারবে, গ্রন্থাগারের সাধারণের সেবার কাজ ততই সফল হ'চ্ছে বলে স্বীকার করতে হ'বে।

প্রকাশিত চাহিদা তিনটী বিষয় থেকে পরিমাপ করা যায় ঃ

(ক) যে বই গ্রন্থাগারে নেই সেই বইয়ের জন্যে চাহিদা। সে ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের পুস্তকসম্ভার বাড়ানো প্রয়োজন ;

(খ) পুস্তকের জন্য সরাসরি অনুরোধ ; আর

(গ) উপস্থিত পুস্তকসম্ভারের কতটা ব্যবহার হ'চ্ছে, সেটুকুর উপর লক্ষ্য রাখা।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চাহিদা লিখে রাখতে হ'বে এবং সুযোগ হ'লেই তা মেটাবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। আর তৃতীয় প্রকারের চাহিদার পরিমাপ করতে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হ'বে দু'টী বিষয়ের উপর ঃ

(১) বহির্গত বইয়ের তালিকা ; ও

(২) কোন্ বই কতবার বাইরে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা।

(ক) বহির্গত বইয়ের তালিকা পুস্তক বিভাগের ছকের উপর নির্ভর করে যত সূক্ষ্মভাবে করা সম্ভব, করতে হ'বে ; তাহ'লে সহজেই বোঝা যাবে কোন্ বিষয়ের বইয়ের চাহিদা কত বেশী হ'চ্ছে। যে বিষয়ের বই বেশী

বাইরে যাচ্ছে, সেই বিষয়ের বই যদি আরো বাড়ানো যায় এবং যদি দেখা যায় যে, বই ক্রমশঃ বেশী বাইরে যাচ্ছে তখন বুঝতে হ'বে, সেই বিষয়ের চাহিদা তখনও মেটেনি। যতক্ষণ না সেই বিষয়ের চাহিদা প্রয়োজনের 'প্রান্তে" এসে পড়ছে, ততক্ষণ আমাদের সেই বিষয়ের বই বাড়িয়ে যেতে হ'বে। একটা উদাহরণ—ধরুণ, আপনার ক্ষুধা পেয়েছে। আপনাকে কুড়িটী সন্দেশ দেওয়া হ'লো। আপনি একটি একটি ক'রে সন্দেশ খেতে আরম্ভ করলেন। প্রতিটী সন্দেশ খাওয়ার সংগে সংগে আপনার ক্ষিদের চাহিদা কমে আসছে—ক্রমশঃ আপনি এমন একটা অবস্থায় এসে পড়বেন যখন আপনার ক্ষুধা মিটে যাবে। তখন আপনার কাছে বাকি সন্দেশগুলির উপস্থিত প্রয়োজন আর কিছু থাকবে না। এই যে শেষ অবস্থা, একেই বলে "প্রয়োজনের প্রান্ত"।

(খ) কোন্ বই কতবার বাইরে যাচ্ছে, তা জানবার উপায় হ'চ্ছে বইয়ের মলাটের ভিতর দিকে, তারিখের টিকিটের উপর তারিখ দেখা। যে বিষয়ের বই যত বেশীবার বাইরে যাচ্ছে, বুঝতে হ'বে সেই বিষয়ের প্রয়োজন তত বেশী। সেই বইখানিই যে তত বেশী প্রয়োজনী., তার কোন মানে নেই ; কারণ, এও হ'তে পারে যে, অন্য কোন বইয়ের অভাবে সেই বইখানিই বারবার বাইরে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হ'চ্ছে একই রকমের বই আরো বেশী রাখা, যতক্ষণ না সেইরূপ বইয়ের প্রয়োজন 'প্রান্তে' এসে পড়ছে।

কোন বই বারবার বাই.র না গেলে বুঝতে হ'বে বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়ের চাহিদা নেই, আর না হয় বইখানি সেই বিষয়ের ভালো বই নয়। এসব ক্ষেত্রে বিষয়টী ও বইখানিকে বিচার করে, প্রয়োজন হ'লে সেই বিষয়ের আর একখানি বই রাখতে হ'বে এবং দেখতে হ'বে সে বইখানির "ডাক" পড়ে কি ন ।

বহির্গত বইয়ের তালিকা দেখলে আমরা বুঝতে পারব, রকমারী চাহিদার পরিমাণ ও একখানি বইয়ের সহিত আর একখানি বইয়ের সম্বন্ধের মূল্য কতটুকু। যে সমাজতত্ব পড়ছে, তার সমাজ-মনের উপর বই পড়ার প্রয়োজন আছে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হ'চ্ছে পাঠককে তার অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে

দেওয়া। কেবল সেই কারণেই একটী বিষয়ের বইয়ের সহিত আর-একটী বিষয়ের মূল্য কতটুকু, তার পরিমাপের প্রয়োজন।

তাহ'লে চাহিদার পরিমাপ ঠিক করতে গেলে :

(ক) পাঠকদের উৎসাহিত করতে হ'বে তারা কি চায় তা ঠিকমত জানাবার জন্যে ;

(খ) পাঠকের প্রয়োজনের অনুরোধ যে বিচার করা হ'বে সে সম্বন্ধে পাঠককে নিশ্চিন্ত করা ;

(গ) সাধারণকে জানাতে হ'বে পুস্তকাগারের সেবাকার্যের সীমা নেই ;

(ঘ) গ্রন্থাগারিক বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষকদের মতামত নেবে।

চাহিদার শেষ কথা হ'চ্ছে, চাহিদা অনেক সময় নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্রের উপর।

সাধারণ চাহিদা কতটা এবং সাধারণভাবে পুস্তকাগার কতটা চাহিদা মেটাতে পারে, তা একটু অনুসন্ধান করলেই বুঝতে পারা যায়।

একটী দেশের কতকগুলি পুস্তকাগারের পুস্তকসম্ভার মিলিয়ে দেখলেই দেখবেন, এমন কতকগুলি বই আছে যা সব পুস্তকাগারেই আছে। এই বইগুলি হ'চ্ছে অপ্রকাশিত চাহিদা মেটাবার জন্যে। ধরে নেওয়া হ'য়েছে, এ বইগুলি কাজে লাগবে। কি কি ধরণের বই কাজে লাগবে তা নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের অভিজ্ঞতার উপর।

স্থানানুসারে চাহিদা দু'রকমের : স্থানানুযায়ী বিশেষ চাহিদা ও স্থানানুযায়ী সাধারণ চাহিদা।

প্রথমটী নির্ভর করবে স্থানীয় শিল্প, স্থানীয় অধিবাসীর অবস্থা, স্থানীয় প্রয়োজন ও কাজ-কর্ম এবং দ্বিতীয়টী নির্ভর করবে স্থানীয় চরিত্র, কোন একটী বিষয়ের উপর স্থানীয় অনুরাগ ও স্থানীয় রুচির উপর।

এই সব বিষয় জানতে হ'লে গ্রন্থাগারিককে জানতে হ'বে, যে স্থানে তার গ্রন্থাগার অবস্থিত, সেই স্থানের সমাজকে। কতখানি স্থানের উপর পুস্তকাগারের

সেবাকার্য প্রসার করতে হ'বে, সেই স্থানের অধিবাসীদের অবস্থা কিরূপ, তাদের আমোদ-প্রমোদ, তাদের কাজ-কর্ম—এ সবের সম্বন্ধেই গ্রন্থাগারিকের একটা ধারণা থাকা চাই; তবেই সে স্থানীয় চাহিদার পরিমাণ ঠিক করতে পারবে।

সময়-অনুযায়ী চাহিদা সাধারণ চাহিদা হ'তে পারে, কিন্তু কোন একটী বিশেষ সময়ে এরূপ চাহিদা দেখা দেয়। যেমন ধরুন, শ্রীঅরবিন্দ পরলোকে গমন করলেন। সংগে সংগে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লেখা বইয়ের চাহিদা বেড়ে যাবে সারা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারে। এরূপ চাহিদা তো বিশেষ একটি ঘটনার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। কিন্তু ধরুন যুদ্ধ; যদিও এটা একটা ঘটনা, তা হ'লেও যুদ্ধের জন্যে যে চাহিদা হয় তা সাধারণ চাহিদার অন্তর্ভুক্ত; কারণ, বিভিন্ন দেশের অবস্থা, ভূগোল, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লোকবল ও ধনবল—এই সব বিষয়ের চাহিদা তো আছেই, যুদ্ধ বাধার ফলে চাহিদা বেড়ে গেল মাত্র। কিন্তু এরূপ চাহিদা যে হ'বে তা গ্রন্থাগারিকের পূর্ব থেকেই বোঝা চাই। চাহিদা-প্রকাশের অপেক্ষা করতে গেলে চাহিদা মেটাবার আর সময় হ'বে না।

একটা নূতন কোন বিষয় মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠতে পারে। বিষয়টী যখন প্রথম বার হয় তখন বিষয়টী সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্যে সাধারণের অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠবে এবং সেই বিষয়টী সম্বন্ধে পুস্তকের চাহিদাও বেড়ে যাবে; কিন্তু সে চাহিদা ক্ষণস্থায়ী; কারণ, বিষয়টী মানুষের জীবনের যেই আনুষঙ্গিক হ'য়ে যাবে, সংগে সংগে সময়ানুযায়ী চাহিদা হিসাবে বিষয়টীর আর কোন মূল্য থাকবে না।

পুস্তকের চাহিদা ও পুস্তক-সরবরাহ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তো বলা হ'লো। এটুকু বুঝতে পারা গেল যে, পুস্তকের চাহিদার তুলনায় গ্রন্থাগারে বই রাখতে হ'বে। চাহিদার মাপকাঠি ঠিক করবার জন্যে উপায়ের কথাও বলা হ'লো, কিন্তু মাপকাঠি এখনও তৈরী হ'লো না। অনেকে বলবেন, তবে আর এত কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলবার কথা এই যে, কোন একটা সমাধানে উপস্থিত না হওয়া গেলেও সমাধান কি করে করতে হয়, কিংবা

সমাধানের পন্থাটা জেনে রাখার প্রয়োজন আছে। চাহিদার মাপকাঠি সম্পূর্ণভাবে জানতে না পারলেও, কোন একটী বিষয়ের যথেষ্ট পরিমাণে বই রাখা হ'য়েছে কি না, কোন তুটী বিষয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়টীর বই বেশী রাখতে হ'বে, কোন একটী বিষয়ের বই অবস্থা অনুসারে রাখতে হ'বে কিনা এবং একটী বিষয়ের উপর নানা ধরণের বই কি পরিমাণে রাখতে হ'বে, স্থানকাল অনুসারে কোন্ বিষয় সম্বন্ধে কি ধরণের বই রাখতে হ'বে,—এই সব বিষয়, মাপকাঠি জানবার পন্থা অনুসারে চললে, জানা সম্ভব হয়।

এতদূর যা আমরা বলে এলাম তা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় এই ঃ

(১) স্থানীয় কতকগুলি লোক "ক" সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় (**চাহিদা আছে**);

(২) তারা (অন্যান্য লোকের সঙ্গে) সাধারণের জন্য একটী পুস্তকাগার গড়ে তুলেছে "ক" সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করবার জন্যে (**পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সেবা করা**);

(৩) "ক" সম্বন্ধে যে চাহিদা আছে তা গ্রন্থাগারিকের জানা দরকার, যদিও সব চাহিদাটা প্রকাশ পায়নি;

(৪) "ক" সম্বন্ধে চাহিদার মূল্য কতটুকু সে জানবার চেষ্টা করবে (**চাহিদার মূল্য নির্ধারণ**);

(৫) তারপর সে জানতে চেষ্টা করবে, কতজন "ক"-সম্বন্ধে কি ধরণের জ্ঞান চায়;

(৬) তখন সে বুঝতে পারবে গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তকসম্ভার চাহিদা কতটা মেটাতে পারবে এবং

(৭) সেই বিষয়টী সম্বন্ধে কি ধরণের বাড়তি বই কি পরিমাণে কিনতে হ'বে।

এইখানে এসে পুস্তক-নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'লো।

এই তো গেল বর্তমান চাহিদা মেটাবার জন্যে পুস্তক-নির্বাচনের প্রক্রিয়া, কিন্তু পুস্তকাগারের কাজ কি কেবল বর্তমান চাহিদা মেটানো? আমরা আগেই বলেছি, আজকাল পুস্তকাগার সমাজদেহের একটী অঙ্গ। এই অঙ্গটীর সাহায্যে যদি সমাজদেহের ও সমাজ-মনের উন্নতি করতে পারা যায় তা হ'লে তা করা পুস্তকাগারের সেবার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। মানব-দেহের কোন একটী অঙ্গের ক্ষতি হ'লে, বা কোন একটী অঙ্গ দুর্বল হ'য়ে গেলে, অন্যান্য অঙ্গ তাদের গতানুগতিক কাজ ব্যতীত আরও বেশী কাজ করে অন্য অঙ্গের ক্ষতি পূরণ করে জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এবং সেই সংগে দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গটীকে সুযোগ দেয় সবল হ'য়ে উঠবার জন্যে। ঠিক সেই ভাবেই পুস্তকাগার সমাজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার গতানুগতিক কাজ ছাড়াও আরও বাড়তি কাজ ক'রে। যাদের নিয়ে সমাজ তৈরী, তাদের জন্মগত আকাঙ্ক্ষা হ'চ্ছে বড় হ'বার, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করবার। অবশ্য এই প্রেরণার আড়ালে রয়েছে মানুষের ক্ষুদ্রতার অনুভূতি। এই ক্ষুদ্রতার অনুভূতিই মানুষকে চাবুক মেরে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির দিকে; কিন্তু অনেক সময়ে নিজেকে বড় করার প্রেরণার সন্তুষ্টির জন্যে মানুষ ভুল পথে যায়। ফলে ব্যক্তিগত দেহ ও মন ভেঙে পড়তে থাকে এবং শেষে সমাজের দেহ ও মন ভেঙে পড়ে। সুতরাং, সমাজ-মনকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সমাজের অঙ্গ-হিসাবে গ্রন্থাগারকে কাজ করতে হ'বে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন কি তা ব্যক্তি নিজে জানতে না পারলেও গ্রন্থাগারিকের তা জানতে হ'বে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার বই ব্যক্তির সামনে তুলে ধরতে হ'বে, তাকে লোভ দেখিয়ে নতুন চাহিদার সৃষ্টি করতে হ'বে। ব্যক্তি-মনের উন্নতি হ'লেই সমাজ-মনের উন্নতি হ'বে, সমাজ-মনের উন্নতি হ'লেই সমাজ-দেহের উন্নতি হ'বে।

ব্যক্তিমন যখন তার ক্ষুদ্রতার অনুভূতির তাড়নায় ভুল পথে বড় হ'বার চেষ্টা করবে, যেমন ধরুন, ধর্মঘট, যুদ্ধ, নেশার জিনিষ বেশী ব্যবহার করা, বাজে আনন্দে সময় কাটানো—তখন ব্যক্তি অচেতন হ'লেও, ব্যক্তিসমষ্টি অচেতন

হ'লেও, সমাজের কর্ণধারেরা অচেতন হ'লেও, যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি অর্থাৎ বই তো থাকবে ব্যক্তিকে, সমষ্টিকে এবং কর্ণধারদের সচেতন করে তোলবার জন্যে। বই যে মানব-মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তা বুঝতে পারবেন, হিটলারের জার্মানিকে নিজের মত ক'রে গড়ে তোলবার উপায়গুলির কথা মনে করে। নিজের বড় হ'বার আকাজ্ক্ষা দুরারোগ্য রোগের বীজাণুর মত তিনি সারা জার্মানির উপর ছড়িয়ে দিলেন এবং সংগে সংগে নষ্ট করলেন এই সংক্রামক বীজাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপকরণগুলিকে, অর্থাৎ ধর্ম্ম-গ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ এবং মানবকে ভুল পথ থেকে সোজা পথে নিয়ে যেতে পারে—এমন সব বই। হিটলার ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বইগুলো তাঁর পথের কাঁটা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। এ-সব বই থাকলে যে যুদ্ধ হ'তো না, তা অবশ্য বলা চলে না, তবে এ-বইগুলো থাকলে এবং সময় বুঝে বইগুলো সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারলে যুদ্ধ হয়তো না-ও হ'তে পারতো।

এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের উচিত হচ্ছে ব্যক্তিকে পুস্তকাগারের দিকে আকর্ষণ করে পুস্তকসম্ভারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলা। অনুসন্ধিৎসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রয়োজনীয় বইগুলো এমনভাবে রাখতে হ'বে, যা'তে বার বার সেগুলি ব্যক্তির চোখে প'ড়ে তার ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তোলে। কিন্তু একবারও যেন তার মনে না জাগে যে, গ্রন্থাগার জোর করে তাকে এ বইগুলো পড়াতে চায় ; তা হ'লেই মুস্কিল। তা হ'লে তার বড় হ'বার প্রেরণায় ঘা লাগবে এবং সে ভুল পন্থা অবলম্বন করে গ্রন্থাগারকে ও গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘৃণা করতে শিখবে। পুস্তক-নির্বাচনের শেষ কথা হচ্ছে বই ছাঁটাই করা। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের কর্তারা হয়তো তা বুঝবেন না। গ্রন্থাগারের অকেজো কর্মীকে (অবশ্য মাঝে মাঝে ভুল ক'রে কাজের লোককেও) ছাঁটাই করতে তাঁদের একটুও বাধে না, কিন্তু অকেজো বইকে ছাঁটাই করতে হ'লেই যেন তাঁদের সংস্কারে বাধে। আমাদের দেশে তাই গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগারিকদের এত দুর্দশা। তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা বেশ বোঝা যায়।

গ্রন্থাগারকে সব সময় জীবন্ত থাকতে হ'বে। অর্থাৎ তার পুস্তকসম্ভার সব সময় মানব-সভ্যতার গতি অনুসারে জীবন্ত ক'রে রাখতে হ'বে; নূতন শাখার সম্ভারে রমণীয় করে তোলবার জন্যে গাছের শুকনো ডাল ছেঁটে দিতে হয়, শুকনো ডাল ও ফুল ভেঙ্গে দিতে হয়। কারণ, সেগুলি গাছের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। তেমনি পুস্তকসম্ভারের যা কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর, সে-সব মাঝে মাঝে ছাঁটাই করার দরকার হয়।

বইয়ের প্রয়োজন আছে বলেই বই রাখা হয়। কিন্তু যে-বই কারো প্রয়োজনে লাগে না, সে-বই রাখারও প্রয়োজন নেই। কারণ, সে-বইয়ের দ্বারা গ্রন্থাগারের সেবার কাজ চলবে না। উপরন্তু সে-সব বই লাইব্রেরীতে ভরে রাখলে প্রয়োজনীয় বইয়ের স্থানাভাব ঘটবে এবং গ্রন্থগারের কাজও অনর্থক বেড়ে যাবে। আর, অকেজো বই গ্রাহকদের মনেও একটা বিরক্তির ভাব জাগিয়ে তুলবে।

বই মূল্যবান হ'লেই যে তা কাজের বই হ'বে, তা যেন কেউ মনে না করেন। বইয়ের মূল্য নির্ভর করে তার চাহিদার উপর। তেমনি, বইয়ের মূল্য কম হ'লেই যে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা কম হ'বে, তা যেন কেউ মনে না করেন। কারণ, অতি প্রয়োজনীয় বই-ই কম মূল্যে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়।

পুস্তক ছাঁটাই করবার নিয়মঃ

বিজ্ঞান ঃ গণিত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের বইয়ের পরমায়ু দশ বছর। বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে রাখা দরকার। যদি এমন বই বার হ'য়ে থাকে, যা প্রথম শ্রেণীর বইগুলির স্থান গ্রহণ করতে পারবে, তা হ'লে পুরাতনের পরিবর্তে নূতন বইগুলিকে রাখতে হ'বে।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান ঃ ঐ একই নিয়ম।

ললিতকলা ঃ ছাঁটাই করা চলবে না।

ধর্ম ও দর্শন ঃ দর্শনের মতবাদ-সম্বন্ধীয় বই ছাঁটাই করা চলবে না। পুরাতন ধর্মমত ও সাম্প্রদায়িক ধর্মমত যতটা সম্ভব ছাঁটাই করতে হ'বে।

সমাজতত্ত্ব ঃ শাসনতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ও আইন-সম্বন্ধীয় বইয়ের প্রায়ই ছাঁটাই করবার প্রয়োজন হয়।

সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব ঃ পুরাতন ব্যাকরণের বই এবং স্কুলের ছোটখাটো অভিধান নিঃসঙ্কোচে ছাঁটাই করা দরকার।

উপন্যাস ঃ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন, এমন লেখকের বই কখনও ছাঁটাই করা চলবে না। সাধারণ উপন্যাসের পরমায়ু দু'বছর।

কবিতা ও নাটক ঃ এই জাতীয় বইয়ের সংগ্রহ কখনও ছাঁটাই করতে নেই। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সব লেখক স্থান পাননি, তাঁদের লেখা ছাঁটাই করা চলে।

ইতিহাস ও ভূগোল ঃ ছোটখাটো সংক্ষিপ্তসার ছাঁটাই করা চলে। ভ্রমণের বই দশ বছরের পুরানো হ'লে না রাখলেও চলে। ভ্রমণের প্রথম বইগুলি রেখে দিতে হ'বে। প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসের বই নষ্ট করা চলবে না।

জীবনী ঃ জীবনীর সংকলন রাখতে হ'বে।

অন্যান্য ঃ খবরের কাগজ ও ডাইরেক্টরি নিঃসন্দেহে ছাঁটাই করুন। মাসিকপত্র প্রয়োজন অনুসারে রাখতে হবে।

সাধারণ ঃ দোষ-ত্রুটিযুক্ত যে-কোন বই ছাঁটাই করা উচিত। নোংরা বইয়ের উপর মায়া করতে নেই। স্থানীয় কোন বিষয় সম্বন্ধে লেখা বই এবং স্থানীয় লেখকের লেখা বই ছাঁটাই করতে নেই।

ছাঁটাই করার সংগে সংগে বই পুস্তকাগার থেকে বার করে দিতে নেই। বই বার ক'রে দেবার আগে সেই বইয়ের প্রথম পাতার উপর গ্রন্থাগারের নাম ও "ছাঁটাই"—এই কথা ছাপ মেরে দেওয়া দরকার।

মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বহু প্রাচীন হ'লেও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান এখনও তার শৈশব অবস্থা পার হয় নি। যে-গতিতে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে, তাতে মনে হয়, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের জটিলতার অনেক কিছুই শীঘ্র পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। গোড়াপত্তনেই গ্রন্থাগার যখন সমাজের একটি অঙ্গ বলে গণ্য হ'তে পেরেছে, তখন যতদিন যাবে, ততই যে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের উন্নতি হ'বে, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখতে হ'বে যে, যুগযুগের চিন্তাধারা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হ'য়ে আছে এবং সেই সব চিন্তাধারার উপর নির্ভর করেই মানুষের জ্ঞান ক্রমেই সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠছে। মানব-সভ্যতা যতই নূতন নূতন অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ততই তা জ্ঞানবৃদ্ধ হচ্ছে এবং বিশ্বের গ্রন্থ-ভাণ্ডারেও নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান নূতন হ'লেও তার ভিত্তি বহু পুরাতন।

স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে পুস্তক-নির্বাচন

এ পর্যন্ত আমরা পুস্তক-নির্বাচন সম্বন্ধে যা কিছু বললাম, তার সবই জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তকনির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুস্তকনির্বাচনের সমস্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ-দু'টি ক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রন্থাগারিকের কাজ পাঠক ও গ্রন্থাগার নিয়ে। কিন্তু এই দু'টি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য বিভিন্ন বলে সমস্যাও যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ'বে, তাতে আশ্চর্যান্বিত হ'বার কিছুই নেই।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়। স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদান। এ-ক্ষেত্রে শিক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট মান আছে এবং পাঠক জানে, তাকে কি কি বিষয় পড়তে হ'বে, আর পরীক্ষার সময় কোন বিষয় সম্বন্ধে তার কতটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষক ও

অধ্যাপকগণ গ্রন্থাগারের বইয়ের সাহায্যে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'বেন এবং যে-সব বই থেকে তাঁরা শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু চয়ন করেছেন, ছাত্ররাও যা'তে সেই সব বই থেকেই তাদের পাঠ্যবিষয় আহরণ করে, সে জন্যে তাঁরা সেই সব বইয়ের দিকেই ছাত্রদের নানা উপায়ে পরিচালিত করবেন। তার ফলে **ছাত্র** ও **বই**—এই দু'য়ের মধ্যে সুনিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হ'বে।

সুতরাং আমরা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি যে, যে-কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পুস্তকনির্বাচনের সময় তিনটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

প্রথমতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবেন।

তৃতীয়তঃ পুস্তকনির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষক গ্রন্থাগারিককে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবেন।

পুস্তকনির্বাচনের ক্ষেত্রে এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভার মূল্যবান হ'লেই যে গ্রন্থাগার কাজের হ'বে, তা বলা যায় না। কারণ, পুস্তকসম্ভার যতই ভালো হ'ক না কেন, পরিচালনার অভাবে ও ত্রুটিতে, ভালো পুস্তকতালিকার অভাবে এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগার-গৃহ না থাকার ফলে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংকলন একেবারে অকেজো হ'য়ে পড়তে পারে।

আবার এ কথাও সত্য যে, গ্রন্থাগারের পুস্তকসংকলন ভালো না হ'লে, পরিচালনা যতই ভালো হ'ক না কেন, সে গ্রন্থাগার অকেজো হ'বেই।

সুতরাং উপযুক্ত পুস্তকসম্ভার এবং উপযুক্ত পরিচালনা,—এই দু'য়ের সমন্বয়েই কেবল গ্রন্থাগার কার্যোপযোগী হ'য়ে উঠতে পারে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দেখা গেছে, পাঠকেরা অর্থাৎ ছাত্রেরা যে-সব বই পড়ে, তার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বই তারা অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে পড়ে। সুতরাং শিক্ষকদের দ্বারা পুস্তকনির্বাচন হ'লেই এ-সব ক্ষেত্রে পুস্তকনির্বাচন ভালো হয়। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হ'বে যে,

পুস্তকনির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থগারিকেরও দায়িত্ব আছে। সে-দায়িত্ব হচ্ছে পুস্তকনির্বাচনের সুরু থেকেই একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া। এই পরিকল্পনা নির্ভর করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের উপর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনটা কি? নানা কারণে এই পরিকল্পনার অদলবদল করার প্রয়োজন হ'তে পারে। কারণ, শিক্ষার ধারা পরিবর্তিত হ'তে পারে, শিক্ষার মান পরিবর্তিত হ'তে পারে এবং নূতন বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। তা হ'লেও একটা পরিকল্পনা অনুসারে একটা গ্রন্থাগার গড়ে তোলবার যে প্রয়োজন আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের উপরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ নির্ভর করে। সুতরাং গ্রন্থাগারের কাজও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজের উপর নির্ভর করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারকে পৃথক করা যায় না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি ভাগের উপরই নির্ভর করে গ্রন্থাগারের কাজ:

১। কোন বিষয়ের পাঠ-নির্ধারণ করা।

২। সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ-নির্ধারণ করা।

৩। কোন বিশেষ বিষয়ে গবেষণার জন্যে পাঠ-নির্ধারণ করা।

এই তিনটি ভাগে পাঠ-নির্ধারণ করা হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ও স্কুল-কলেজের কাজ এবং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাজ হ'বে পাঠের জন্য পুস্তকনির্বাচন করা।

প্রথম ও তৃতীয় ভাগে যে-সব বই সংকলিত হ'বে, তা শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে সংকলিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে যে-সব বই সংকলিত হ'বে, তা বিশেষভাবে নির্ভর করবে গ্রন্থাগারের দূরদর্শিতার উপর।

কলেজী শিক্ষা যে ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রেরণাকে কতকটা বিকৃত করে ফেলে, তা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু কলেজী শিক্ষার সময়েই যদি

ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করা না হয়, তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুসারে পড়বার সুযোগ দেওয়া না হয়, তা হ'লে কলেজী শিক্ষার পর যে-সব ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হ'বে, তাদের পক্ষে সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া আর সম্ভবপর হ'বে না। মানুষের দেহে সক্রিয় কোষের কার্যের দ্বারা অকর্মণ্য কোষের পরিপুষ্টির মতই তারা সমাজ-দেহে নিজেদের পুষ্ট করতে থাকবে। তার ফলে সমাজদেহের সক্রিয় কোষগুলিও ক্রমশঃ অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। অন্যান্য দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তারা এখন এ-বিষয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন।

উপরিউক্ত কারণে যে রকমেরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হ'ক না কেন, তার পক্ষে সব সময় ছাত্রদের স্বাভাবিক বৃত্তিকে একটু মুক্তি দিয়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই ছাড়াও অন্যান্য বই পড়বার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সব কারণে পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অন্যান্য বই রাখাও আবশ্যক।

উল্লিখিত তৃতীয় ভাগে বর্ণিত পুস্তক-সংকলন সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন, কলেজে গবেষণার জন্য বই রাখবার প্রয়োজন নেই। কারণ, সে-সব বই কলেজের ছাত্রদের কোনই কাজে লাগবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সেরূপ বই রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজই বেশী হ'য়ে থাকে।

কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব বই রাখতে হ'বে, সেই সমুদয় বইকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্যানুসন্ধান-কার্যে ব্যবহার্য বই (General Referance)।

২। বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্যানুসন্ধান-কার্যে ব্যবহার্য বই (Special Reference)।

৩। সাধারণ বই, যা কোন পাঠ্যবিষয়ভুক্ত নয়।

৪। বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের বই।

৫। অবসরমত পড়বার বই।

৬। পত্রিকা, বিশেষ করে পাঠ্যবিষয়-সংশ্লিষ্ট পত্রিকা।

পুস্তক-নির্বাচন ঃ প্রয়োগ

পুস্তক-বিচার

গ্রন্থাগারে পুস্তকনির্বাচনের তত্ত্ব সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন কোন একখানি বই ভালো কি মন্দ, কেমন করে তা বিচার করতে হ'বে, সেইটাই আমাদের সমস্যা। আমাদের কাজে লাগবে—এ ধরণের দু'খানি বইয়ের মধ্যে যখন একখানি বই বেছে নেওয়ার প্রয়োজন হ'বে, বিশেষ করে তখনই ভালোমন্দের সমস্যা উপস্থিত হ'বে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকা দরকার বইয়ের বিষয়বস্তুর উপর। ধরুন, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় দু'খানি বই। এখন এই দু'খানি বইয়ের একখানি বই বেছে নিতে হ'লে দেখতে হ'বে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন্ বইখানিতে কতটা জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সে-জ্ঞান আমাদের পাঠকের উপযোগী হ'বে কিনা। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেবল মাত্র একখানি বই থাকলে কোন কথাই ছিল না। কারণ, সে-বই ভালো হ'ক, মন্দ হ'ক এবং যে-কোন অখ্যাত বা বিখ্যাত প্রকাশকের দ্বারাই প্রকাশিত হ'ক না কেন, তবু আমাদের তা কিনতে হ'তো। কারণ, চাহিদা থাকলে তা মেটাতেই হ'বে। কিন্তু একই বিষয়ের দু'খানি বইয়ের মধ্যে যেখানি আমাদের গ্রন্থাগারের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী, সেইখানিই আমাদের কিনতে হ'বে।

কিন্তু যেখানে দু'খানি বই-ই আমাদের গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযোগী, সেখানে কি করতে হ'বে? এইরূপ দু'খানি বা অনেকগুলি বইয়ের মধ্যে একখানি বই বেছে নিতে হ'লে বইগুলিকে নিম্নরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে ঃ

(ক) বিষয়বস্তু অনুসারে,

(খ) লেখক অনুসারে এবং

(গ) অবয়ব অনুসারে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, আমরা এখানে যে-বইয়ের কথা বলছি, তা কেবল কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান-সমন্বিত বই। কবিতা, ললিতকলা ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় যে-সব বই মানুষকে কেবল মানসিক আনন্দ দেয়, সে-সব বই সম্বন্ধে আমরা পরে বলবো।

বইয়ের বিষয়-বস্তু

বই বেছে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রথমে দেখতে হ'বে, বইখানিতে **যে-বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা আছে, তা সঠিক ও সম্পূর্ণ কি না।**

এ সম্পর্কে একথাও মনে রাখা দরকার যে, কোন বইয়ে কোন বিষয়ের সমাবেশ একেবারে সম্পূর্ণ ও নিঃশেষিতভাবে হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোন বই সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না যে, বইখানিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সব কথা ও শেষ কথা বলা হয়েছে এবং তদতিরিক্ত আর কোন কথা বলবার নেই। বইয়ের কোন একটি অংশ সম্পূর্ণ হ'তে পারে, কোন একটি অংশ দোষ-ত্রুটিযুক্ত হ'তে পারে, কোন বিষয়ের যথার্থ বিবরণ লেখক দিতে পারেন, কোন বিষয়ে তিনি বাড়াবাড়িও করে থাকতে পারেন। এই সব দিক বিচার করতে হ'বে নিজে বইখানি পড়ে এবং বইখানি সম্বন্ধে স্বাক্ষরিত মতামত বিচার করে। তারপর লেখক বিষয় সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন, তাতে তিনি তাঁর মতামত বেশী প্রকাশ করেছেন, অথবা বিষয়ের বাস্তব ও যথাযথ সমাবেশের দিকেই বেশী লক্ষ্য রেখেছেন, তা আমাদের বিবেচনা করা দরকার। লেখকের মতামত অপেক্ষা বিষয়ের যথাযথ সমাবেশের উপরেই আমাদের জোর দিতে হ'বে বেশী।

বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা হ'য়েছে, তা নতুন কি পুরানো, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্ঞান সম্পূর্ণ আধুনিক হওয়া দরকার।

বইখানি লেখার ধারা এবং বিষয়টিকে কিভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছে,—এ দু'টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, আমরা বহুবার বলেছি যে, বই গ্রন্থাগারে ভরে রাখবার জন্যে কেনা হয় না, বই কেনা হয় পড়বার জন্যে এবং পাঠকের চাহিদা মেটাবার জন্যে। সুতরাং বইখানি পাঠকের পক্ষে উপযোগী হওয়া চাই।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রয়োগ-পদ্ধতি আমাদের দেশানুযায়ী কিনা, তা-ও দেখতে হবে। বইতে বিষয়টির আমাদের দেশানুযায়ী প্রয়োগ-পদ্ধতি দেওয়া না থাকলে, সাধারণ গ্রন্থাগারে তা কাজে লাগবে না। ধরুন, তাঁতের কাজ সম্বন্ধে কোন বইতে বিবৃত বয়ন ও অন্যান্য কাজের পদ্ধতি আমাদের দেশের উপযোগী না হ'লে সে-বই আমাদের দেশে কারো কোন কাজেই লাগবে না। কারণ, তাঁতের কাজ নানা দেশে নানা পদ্ধতিতে হ'য়ে থাকে।

লেখক অনুসারে বই বিচার

বইয়ের লেখক অনুসারে অনেক সময় বইয়ের গুরুত্ব কম-বেশি হয়ে থাকে। কাজেই বই-বাছাইয়ের ব্যাপারে, বইয়ের লেখক কে, তা দেখাও প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও ভুললে চলবে না যে, মানুষের চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ যাকে কোন বিষয়ে বড় বলে মনে করে, তাকে সে সব বিষয়েই বড় বলে মনে করে। স্যার পি সি রায় যদি ধর্ম সম্বন্ধে বা কলাবিদ্যা সম্বন্ধে বই লিখতেন, তা হ'লেও আমাদের দেশের লোক সে-বই মাথায় তুলে নিতো। কিন্তু আমরা জানি, স্যার পি সি রায় রসায়ন শাস্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। লেখক যে-বিষয়ে বই লিখেছেন, সে-বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ কিনা, তা জানা দরকার।

কিন্তু আবার লেখক বিশেষজ্ঞ হ'লেই চলবে না, বিষয়টী ঠিকভাবে বলতে পারা চাই। বিষয়টী কঠিন ভাবে না বলে সাধারণভাবে সাধারণ পাঠকের

উপয়োগী করে বলা দরকার। কারণ, বইখানি রাখতে হ'বে আমাদের জন-সাধারণের গ্রন্থাগারে।

বইয়ের অবয়ব

বিষয়বস্তু ছাড়াও বইয়ের ছাপার হরফ, কালি, কাগজ, বাঁধাই ও ছবি— এগুলি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বইয়ের ছাপার অক্ষর স্পষ্ট হওয়া চাই, কালির রং যেন চোখ-ঝলসানো বা অস্পষ্ট না হয়। আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, বইয়ের যেমন অবয়বগত বৈশিষ্ট্য আছে, পাঠকেরও তেমনি অবয়ব-গত বিশিষ্টতা আছে। সকলের চোখের জ্যোতি সমান না হতে পারে। কষ্ট করে পড়তে হ'লে পাঠক বিরক্ত হ'য়ে যায়।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে-সব বই রচিত, সে-সব বইয়ে ছবি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সুতরাং এ-সব বইয়ে বিষয়বস্তু ছবির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে কি না এবং ছবিগুলি সুস্পষ্ট কি না, তা দেখে নিতে হ'বে।

তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, বইয়ের অবয়বের বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন দ্বিতীয় স্তরের। ব্যবহার করতে করতে বই ছিঁড়ে যাবেই। তবে দেখতে হ'বে, বই সহজেই ছিঁড়ে যাবে কিনা এবং ছিঁড়ে গেলে তা আবার বাঁধান যা'বে কি না। কারণ, আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে বইয়ের ব্যবহার। ব্যবহারের ফলে বই ছিঁড়ে যা'বে কিনা, তা বিশেষ করে বিবেচনা করবার প্রয়োজন নেই।

কয়েকটি বিশেষ বিষয়

এখানে আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রের সব বিষয়ের কথা বলবো না। কেবল কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে কোন্ কোন্ দিক বিচার করে বই কেনা দরকার, সেই কথাই বলবো।

ললিতকলা ও সাহিত্য

ললিতকলা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্যিকারের পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে রস-সৃষ্টি এবং মানুষেয় মনে সেই রসের আবেদন পৌঁছে দেওয়া। সাহিত্যে রসসৃষ্টি হয় লেখনীর সাহায্যে এবং ললিত-কলায় রসসৃষ্টি হয় রং, তুলি ও অন্যান্য শিল্প-উপকরণের সাহায্যে। চিত্রকরের কাজ হচ্ছে রং ও তুলির সাহায্যে কাপড়ের বা কাগজের উপর কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে ফুটিয়ে তোলা, আর সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কলম ও কাগজের সাহায্যে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা।

উপরের বর্ণনা থেকে দু'টি জিনিস লক্ষণীয়। একটি হ'চ্ছে **জ্ঞানকে রূপ দেওয়া,** আর একটী হচ্ছে লেখকের বা চিত্রকরের **ব্যক্তিগত অর্জিত জ্ঞান** প্রকাশ করা। সুতরাং কলা ও সাহিত্যের দু'টি চরিত্র আছে: একটি **ব্যক্তিগত চরিত্র** এবং অপরটি **রূপগত চরিত্র**। সাহিত্য ও কলা—এ-দু'টি বিষয়ের বই কেনবার সময় এ-চরিত্র দু'টি বিচার করে দেখা চাই।

লেখক সাহিত্য রচনা করবেন, কি না করবেন এবং চিত্রকর চিত্র আঁকবেন, কি না আঁকবেন, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে লেখকের বা শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর। কিন্তু যেই লেখক লিখতে আরম্ভ করলেন, বা শিল্পী আঁকতে আরম্ভ করলেন, অমনি তাঁর আর সে-স্বাধীনতা থাকেনা। কারণ, তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায় সমাজ, ধর্ম, আচারব্যবহার, সুখদুঃখ, অশ্রুআনন্দ ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁকে তখন ঘিরে দাঁড়ায় 'ইতিহাস'। সেই ইতিহাসসমুদ্রে লেখক ও পাঠক দু'জনেই জীবনতরী ভাসিয়েছেন। লেখকের জীবনেও যে ওঠাপড়া, যে অনুকূল ও প্রতিকূল হাওয়া, পাঠকের জীবনেও তা-ই। সুতরাং লেখক যেই লিখতে সুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাঠকগোষ্ঠী ঠিক হ'য়ে গেল। পাঠক ও লেখকের পিছনে ইতিহাস এক হ'লেও পাঠকের ও লেখকের ব্যক্তিগত চেতনা সমান না হ'তে

পারে। লেখক দেখেন সমাজকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়া প্রয়োজন। পাঠক হ'য়তো তা উপলব্ধি না-ও করে থাকতে পারে। সুতরাং ইতিহাস এক হ'লেও পাঠকের ব্যক্তিগত চেতনারও একটা মূল্য আছে।

সুতরাং সাহিত্য বা কলা বিচার করে দেখবার সময় দেখতে হ'বে সাহিত্যে বা কলায় যে-রূপ দেওয়া হয়েছে, সে-রূপে ইতিহাস আছে কিনা এবং যিনি রূপ দিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব কি।

ধরুন, অসিতবরণের একখানি ছবি। এই ছবিখানির হুবহু নকল আর একজনকে করতে দিন। নকল করা হ'বার পর দেখবেন, দু'খানি ছবির রূপে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু তবু আমরা বলবো, একখানি নকল ও একখানি আসল। কারণ, যথার্থ রসিক নকল ছবিখানির ভিতরে আসলের স্বষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাবে না। শিল্পী বা লেখক যখন স্বষ্টি করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্বষ্ট বস্তুর ভিতর ধরা পড়ে যান। সুতরাং কলা ও সাহিত্য বিচার করবার সময় আমাদের দু'টি বিষয় বিচার করে নিতে হ'বে ঃ

(১) **ইতিহাস** ঃ সত্যিকথা বলতে কি, যে-সব বই দু'শ' বছর আগে লেখা হ'য়েছে, এমন কি, যে-সব বই গত যুদ্ধের আগে লেখা হ'য়েছে, আমাদের কাছে সে-সব বইয়ের আর বিশেষ প্রয়োজন নেই এবং আমাদের পর যা'রা আসবে, তাদের কাছেও সে-সব বইয়ের বিশেষ মুল্যই থাকবে না। বঙ্কিমবাবু যখন বই লিখেছিলেন, মধুসূদন যখন বই লিখেছিলেন, তখন লেখকের ও পাঠকের পিছনে যে-ইতিহাস, ছিল সে-ইতিহাস উভয়েরই কাছে ছিল সমান। সেই জন্যে পাঠকেরও লেখক ঠিক করা ছিল এবং লেখকেরও পাঠক ঠিক করা ছিল। কিন্তু আমরা বঙ্কিমবাবুর পাঠক হ'তে পারি না। তার কারণ, তাঁ'র বই যদিও আমরা পড়ি, তার যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি না। যে স্বাদের অভিজ্ঞতা বঙ্কিমের যুগের লোকের রসনায় ছিল, সে স্বাদের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। সোজা কথায় বলতে কি, বঙ্কিমবাবুর বই যে-ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে লেখা হ'য়েছে, সে-ইতিহাস আমাদের পিছনে নেই। বঙ্কিমবাবুর

বইগুলিকে আমাদের সাহিত্যে সম্মান দেবার জন্যে গ্রন্থাগারে ভরে রাখতে পারি, কিন্তু তা কাজের হ'বে না। শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। শাশ্বত মানবের জন্যে সাহিত্য—একথা স্বপ্নরাজ্যের। নিজস্ব ইতিহাস থেকে, নিজস্ব ভবিষ্যৎ থেকে লেখক কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। নিজস্ব ইতিহাস থেকে নিজেকে মুক্ত করার মানে নিজের মৃত্যুকে বরণ করা।

(২) **ব্যক্তিত্ব**ঃ লেখক যখন একখানা বই লিখলেন, চিত্রকর যখন একখানা ছবি আঁকলেন, তখন সে-বই বা সে-চিত্র লেখক বা চিত্রকরের কাছে সম্পূর্ণ। স্থষ্টিকর্তার কাছে তাঁর স্থষ্টি সম্পূর্ণ। চলিত নিয়মানুসারে বইখানি ও ছবিখানি নিখুঁত। সাহিত্য বা কলার সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে বই ও ছবি সম্পূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যা'বে, সাধারণের কাছে এরূপ ছবি বা বইয়ের কোনই মূল্য থাকে না, যদি না তার ভিতরে লেখকের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব-চেতনার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। যখনই বলি শরৎচন্দ্রের বই, তখনই সে-বইয়ের ভিতরে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই। কারণ, তাঁর প্রত্যেকখানি বইয়ের ভিতর তাঁর চেতনার স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে। "Arts for Arts' sake" বলে যে একটা কথা চলতি আছে, সে কথার মূল্য সত্যিই কিছু নেই।

এত কথা এখানে বলার প্রয়োজন কি? এ-প্রশ্ন অনেকেই তুলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যেন মনে রাখেন, যিনি গ্রন্থাগারিক, তাঁর সমালোচকের সমালোচক হওয়া প্রয়োজন। বইয়ের ভালো-মন্দ যখন তাঁকে বিচার করতেই হ'বে, তখন ভালো-মন্দ বিচার করবার পন্থাগুলি তাঁর জেনে রাখা প্রয়োজন।

আমরা দেখলাম, সাহিত্য ও কলা—এ-দু'টি বিচার করতে হ'লে দু'টি দিক বিচার করতে হ'বেঃ ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব। এইবার সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ রূপ বিচার করলেই আমাদের কাজ শেষ হয়।

ললিতকলার বই

ললিতকলার বই দু'রকমের হ'তে পারে : (ক) কেবল চিত্র-রূপায়িত এবং (খ) বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-সমন্বিত।

ললিতকলার কেবল চিত্র-রূপায়িত বই বলতে এমন বই বুঝায়, যাতে কেবল ছবিই আছে এবং কেবল ছবির সাহায্যেই বিষয়টি ব্যক্ত করা হ'য়েছে। আর ললিতকলার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-সমন্বিত বই বলতে বুঝায় তার ইতিহাস, সমালোচনা, তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞানের বই।

এই দুই প্রকারের বইই আমাদের গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, যিনি রবীন্দ্রনাথের ছবির সমালোচনা পড়বেন, তাঁ'কে তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিও চোখের সামনে দেখতে হ'বে। শরৎচন্দ্রের লেখা না পড়ে তাঁর বইয়ের সমালোচনা পড়ার মত মূর্খতা হয়তো আর কিছুই নেই।

ছবির বইগুলিতে যে সম্প্রদায়ের ছবি আছে, সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (representative) ছবিগুলি থাকা চাই।

ছবিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বড় হওয়া চাই। তা না হ'লে তাতে চরিত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ফুটে উঠবে না। ছবিগুলির প্রতিলিপি পরিষ্কার ও নিখুঁত হওয়া দরকার। আসল ছবির প্রতিলিপি হ'লেই ভালো হয়। কারণ, প্রতিবার প্রতিলিপি-গ্রহণের সময় কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হ'তেই থাকবে এবং আসল থেকে নকল যতদূরে সরে যা'বে, ততই তা'তে আর আসলের চরিত্র বজায় থাকবে না। যেমন, আমাদের বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে।

উপন্যাস

আমাদের দেশের জনসাধারণের যে-সব গ্রন্থাগার আছে, সে-সব গ্রন্থাগারে বিশেষ করে উপন্যাসের উপরই জোর দেওয়া হয়। তার কারণ এই কি যে, বাংলাদেশ 'উপন্যাসখোর' ? ঠিক তা নয়, আমাদের দেশের গ্রন্থাগার তার

পাঠককে 'উপন্যাসখোর' করে তুলেছে, এইটাই সত্যি। তবে গ্রন্থাগারের মুখ চাইলে একথাও বলতে হয় যে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছাড়া পড়বার বই আর আছেই বা কি? পাঠক কেবলই উপন্যাস পড়তে চায়; তার কারণ, তা'কে অন্য বই পড়তে দেওয়া হয় না।

গ্রন্থাগারে উপন্যাস রাখা হ'বে, কি না হ'বে—এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমরা সে-সব মতামত এখানে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কারণ, আমরা গোড়া থেকেই বলে আসছি, কোন বই রাখা হ'বে, কি না হ'বে—তা নির্ভর করবে কোন বইয়ের চাহিদা আছে, কি না আছে—তার উপর।

উপন্যাসকে বিচার করে দেখতে হ'লে দেখতে হ'বে প্রথমতঃ ইতিহাস এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিত্ব।

যে-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকের জীবনের ইতিহাসের মিল আছে, অর্থাৎ পাঠকের জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা ও বিভিন্ন সমস্যার ছবি যখন পাঠক উপন্যাসে অঙ্কিত জীবনের মধ্যে দেখতে পায়, তখন পাঠক আপনা থেকেই বলে উঠবে: "বাঃ বেশ বই।" মুকুরে প্রতি-বিম্বের মত পাঠকের নিজের ব্যক্তিত্ব উপন্যাসের জীবনগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া চাই।

লেখক যদি তাঁর লেখার ভিতর ইতিহাসকে বিকৃত করে থাকেন এবং ইতিহাসের ছলে কেবল বাড়াবাড়ি করে থাকেন, তা হ'লে সে-উপন্যাস গ্রন্থাগারে রাখা উচিত নয়। কারণ, সে-বইয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হ'বে না। এই গেল উপন্যাসের একটি দিক।

আর একটী দিক হচ্ছে উপন্যাসের লেখক। বঙ্কিমযুগের সমাজকে জানতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রয়োজন। কিন্তু সে-প্রয়োজন জনসাধারণের নেই। সুতরাং সে-উপন্যাস যদি আমাদের গ্রন্থাগারে না রাখা হয়, তা'তে কিছু যাবে-আসবে না। তবে বাংলা সাহিত্যের **উজ্জ্বল রত্ন** হিসাবে যদি সে-উপন্যাস রাখা হয়, সে-কথা আলাদা।

উপন্যাসকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। একটি বিশেষ যুগের সমাজের কোন একটী স্তরের মানুষের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস। যেমন, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মজুর, শৈলজানন্দের উপন্যাসে কয়লাখনির মজুর। এ-সব উপন্যাসে যে-সব জীবন আঁকা হ'য়েছে, সে-সব জীবন-চিত্র সত্য ও বাস্তব কি না, এইটুকুই জানা প্রয়োজন।

২। চরিত্র-চিত্রণ ঃ যেমন, শরৎচন্দ্রের বই।

৩। গল্প-বস্তু ঃ রোমাঞ্চকরই হ'ক, আর ডিটেক্‌টিভই হ'ক, বই পড়ে মনে হওয়া চাই যে, গল্প সম্পূর্ণ। পড়ার পরও যেন পাঠককে চিন্তা করতে না হয় ঃ "কি হ'লো ?"—বা "কি হ'তে পারে ?"

৪। কল্পনামূলক ঃ এইচ জি ওয়েলস-এর মত ঠিক কোন গল্প বা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নেই, তবে কৌতুকের দিক থেকে রাজশেখর বসুর অর্থাৎ 'পরশুরাম'-এর বইগুলিকে এই স্তরে ফেলা যায়।

উপন্যাস সম্বন্ধে শেষ কথা হচ্ছে, যে-সব উপন্যাস পাঠকের মনকে বিষাক্ত না করে আনন্দ দিতে পারে, সে-আনন্দের পিছনে জ্ঞানের বিষয় যদি কিছু না-ও থাকে, তবুও সে-সব উপন্যাস আমাদের গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন। অনেকে হয়তো বলবেন, গ্রন্থাগারে হালকা উপন্যাস রাখা উচিত নয়। কিন্তু সমাজের সকল প্রকারের চাহিদাই আমাদের মেটাতে হ'বে; এইটাই হ'বে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

নীতিবিরুদ্ধ উপন্যাস

নীতিবিরুদ্ধ উপন্যাস কাকে বলা যা'বে, এ এক সমস্যা। কারণ, নীতিবোধ সব সময়েই আপেক্ষিক, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন। আমার কাছে যা নীতি-বিরুদ্ধ, আর একজনের কাছে তা নীতিমূলক হ'তে পারে। যে-সব কথা মুখে বলা যায় না, বৈঠকখানায় যে-সব বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করা যায় না, কোন উপন্যাসের ভিতর সে-সব কথা লেখা হ'লেই তা নীতি-বিরুদ্ধ বলে গণ্য

হয়। যৌনবিষয়ক গল্প ও উপন্যাসের উপর তো জনসাধারণ খড়্গহস্ত। কিন্তু তবুও একবার তা'র উপর চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে সকলেই আকুল। সুতরাং এরূপ বইয়েরও চাহিদা আছে। আমাদের পুস্তকনির্বাচনের উদ্দেশ্য অনুসারে এ সব বইও রাখতে হ'বে। তবে এ-সব বইয়ের প্রচলন যতটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকে, ততই ভালো। যাই হ'ক, গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সঙ্কীর্ণমনা হওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

নাটক

নাটক সম্বন্ধে নূতন করে বলবার কিছু নেই। এক্ষেত্রেও ইতিহাস ও ব্যক্তির উপর ভিত্তি করে বই বাছতে হ'বে। তবে নাটকের বিশেষ কতকগুলি চরিত্র আছে, যা উপন্যাসের নেই। সেই চরিত্রগুলি আমাদের জানা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ নাটককে বিশেষ স্থান দেওয়া হ'তো না। কিন্তু নাটকেরও যে বিশেষ একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, আজকাল তা অনেকে বুঝতে পেরেছেন।

আমাদের দেশে নাটকের যুগ চলে গেছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ মরুভূমি। ক্বচিৎ কখনও দু'একখানি ভালো নাটক বার হচ্ছে। সেই জন্যে নাটক হিসাবে পাঠককে দেবার মত বিশেষ কোন বই নেই।

আজকালকার মানুষের সময় অল্প। ৪০০ পাতার নভেল দিনের পর দিন পড়বার মত ধৈর্য তাদের নেই, সে সময়ও তাদের নেই। সে-দিক থেকে তাদের নাটকের প্রয়োজন বেশী। কারণ, একখানি নাটকের ঘটনার স্থায়িত্বকাল অল্প এবং তার পাতার সংখ্যাও বেশী নয়। তার উপর আজকালকার মানুষ এখন কেবল নিজেকে কেন্দ্র করে থাকে না। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে, সমাজের সকল সমস্যার সঙ্গে মানুষ জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সব কিছুর সম্বন্ধেই সে জানতে চায়, অথচ তার সময় অল্প। নাটকের সাহায্যেই কেবল অল্প সময়ের মধ্যে পাঠককে অনেক কিছু জানানো সম্ভব হয়।

নাটক দু'রকমের ঃ মঞ্চে অভিনীত হ'বার উপযুক্ত নাটক রচনা হিসাবে ভালো না-ও হ'তে পারে, আবার কোন নাটক মঞ্চে অভিনীত হ'বার উপযুক্ত না হ'লেও বই হিসাবে খুব ভালো হ'তে পারে। এই দু'প্রকারের নাটকই গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন।

নাটকের ক্ষেত্রে যে চাহিদা, তা প্রকাশিত নয়। অর্থাৎ নাটকের জন্যে গ্রন্থাগারিকের কাছে তাগিদ না এলেও, যদি নাটক রাখা যায় এবং তা পাঠকের সামনে বার বার ধরা যায়, তা হ'লে দেখা যা'বে যে, নাটকের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যা'বে। কারণ, পাঠকের অপ্রকাশিত চাহিদায় প্রেরণা দেবার দরুন তা প্রকাশ পেতে থাকবে।

মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর—এইরূপ জীবনী নিয়ে লেখা নাটকের বিশেষ মূল্য আছে। এরূপ নাটক সব সময়ে গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন।

ধর্মপুস্তক

ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে একটা মতামত দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। কারণ, এক্ষেত্রে মতামতের আর অন্ত নেই। তবে গ্রন্থাগার যে-অঞ্চলের মধ্যে গ্রন্থ বিতরণ করবে, সেই অঞ্চলের লোকদের ধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের সংখ্যা অনুসারে বইয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা ভালো। তবে গ্রন্থাগারিক যেন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করেন। ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে কেবল চাহিদার উপরে নির্ভর করা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বই

ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার—এরূপ ব্যক্তিদের বই গ্রন্থাগারে রাখা হ'বে কিনা, এ একটা মহা সমস্যা। এক্ষেত্রে ঐসব বিষয়ের সাধারণ বই রাখা প্রয়োজন। যে-সব বই এই সব ব্যক্তির নিত্য প্রয়োজনীয়, তেমন বই জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখা সম্ভব নয়।

এ-ক্ষেত্রেও বই কেনা এবং না-কেনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে চাহিদার উপর। কেবল ঐ সব পেশাদারদের মুখ চেয়ে এ-সব বই না কিনে সমাজের

মুখ চেয়ে কেনা দরকার। সমাজের বেশির ভাগ লোকের প্রয়োজনে লাগবে. এমন বই কেনা প্রয়োজন।

স্থানীয় গুরুত্ববিশিষ্ট বই

স্থানীয় লোক সম্বন্ধে, স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে ও স্থানীয় যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে রচিত যে-কোন বই এবং গ্রন্থাগারে রাখবার মত যে-কোন বস্তু,—যা সেই অঞ্চলে ছাপা হ'য়েছে, কিংবা অন্য কোথাও ছাপা হ'য়েছে এবং সেই অঞ্চল সম্বন্ধে অপর কোন স্থানের লেখকের লেখা, অথবা সেই অঞ্চলের লেখকের লেখা ও অন্য কোন স্থানে ছাপা বই—এ সবই আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে থাকা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে কিন্তু চাহিদার মূল্য কিছু নেই। আঞ্চলিক বিষয় সম্বন্ধে বই এবং গ্রন্থাগারে রাখবার মত আর যা কিছু বস্তু পাওয়া যায়, সে-সবই রাখতে হ'বে। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি সেই অঞ্চল সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে চায়, তা হ'লে সে সেই অঞ্চলেই তা খুঁজবে এবং তার খোঁজবার কাজে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারই হ'বে তার লক্ষ্য।

শেষ কথা

পুস্তকসংগ্রহ করা, আর পুস্তকনির্বাচন করা—দু'টি এক জিনিস নয়, এ-কথা মনে রাখতে হ'বে। পুস্তকাগারে পুস্তকসংগ্রহ করা হয় পুস্তকব্যবহারের জন্য, কেবল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নয়। যা'রা কেবল পুস্তকসংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়েই বই সংগ্রহ করে, তাদের বলতে হ'বে 'বই-পাগলা'। তারা পুস্তকসংগ্রহ করে বহু অর্থব্যয় করে। কিন্তু গ্রন্থাগার যাদুঘর নয়, গ্রন্থাগারে যা কিছু থাকবে, তা ব্যবহারের জন্যে থাকবে। সুতরাং বহু অর্থব্যয় করে অপূর্ব ও কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থরাজি কিনে গ্রন্থাগারে কেবল বোঝাই করে রাখায় লাভ নেই। উপরন্তু তার ফলে গ্রন্থাগারে স্থানের অভাব একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। সে-জন্যে গ্রন্থাগারে এরূপ বই রাখবার মত স্থানসংকুলান তো হ'বেই না, যে-সব বই অকেজো হ'য়ে পড়েছে, সে-সব বইও বাতিল করতে হ'বে।

জাতিবিচার

গোড়ার কথা

আজকালকার সমাজে অগোছাল জীবন-যাপন করা যে কত কষ্টকর, তা সকলে অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারে। আগোছাল মানুষের সমাজে যেন আর স্থান নেই। জীবনকে সার্থক করে তুলতে হ'লে এখন জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু বস্তুকেই গুছিয়ে রাখার প্রয়োজন। এই গুছিয়ে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন যে-জিনিসটির প্রয়োজন, তখন যেন সে-জিনিসটিকে বিনা বিলম্বে পাওয়া যায় এবং সাজিয়ে রাখার গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুকে মূল্যবান করে তোলা।

বই সাজিয়ে রাখারও উদ্দেশ্য হচ্ছে বইখানিকে প্রয়োজনীয় করে তোলা। প্রয়োজনের সময় যা'তে বইখানিকে নিমেষের মধ্যে বার করা যায়, এমনিভাবে বইগুলিকে সাজিয়ে রাখতে হ'বে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে কোন একটি নিয়মের বশবর্তী হ'য়ে বইগুলিকে সাজিয়ে রাখতে হ'বে। নিয়ম যা-ই হ'ক না কেন, উদ্দেশ্য সফল হ'লেই হ'লো। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে, গ্রন্থাগারে বই সাজিয়ে রাখা হয় পাঠকের জন্যে। পাঠক যাতে শীঘ্র তার বইখানি খুঁজে পায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বই সাজাতে হ'বে।

আমরা আগেই বলেছি যে, বইয়ের অস্তিত্বকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হ'লে পাঠকের চোখের সামনে বইগুলিকে ধরতে হ'বে এবং তা না করলে লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হ'বে না। সুতরাং নিয়ম যেমনই হ'ক না কেন, তা পাঠকের প্রয়োজন-অনুযায়ী হওয়া চাই। এখন গুছিয়ে রাখার নিয়ম কি রকম হ'লে তা কাজে লাগতে পারে, বিচার করে দেখা যাক।

পৃথিবীর কোন দু'টি জিনিসই এক নয়। এমন কি, কোন দু'টি একরকমের বস্তুর মধ্যেও পার্থক্য আছে। কারণ, বস্তুর রূপ নির্ভর করে স্থানকালপাত্রের উপর। আমি একটি গোলাপ ফুলের ছবি যেমন করে এঁকে তুলবো, আপনি

সেই ফুলটিকে ঠিক সেই রকম করে এঁকে তুলতে না-ও পারেন। রঙের আলো-ছায়ার সমাবেশ বা সংমিশ্রণ আমার চোখে যেমন প্রতিফলিত হচ্ছে, আপনার চোখে তেমনিভাবে প্রতিফলিত না-ও হ'তে পারে। আপনার ছবিটি নির্ভর করবে আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। এমনিভাবে ফুলটির ছবি কোন কালেই সম্পূর্ণ হ'বে না। তবে ফুলটিকে যে যে-রকম করেই আঁকুক, সেটি যে ফুল, সে-কথা তো কেউই অস্বীকার করবে না ; ফুলটি যে ফল নয়, এতো সকলেই বলবে। সুতরাং ফুলটির এমন কোন একটি চরিত্র আছে, যার জন্যে আমরা ফুলটিকে ফল বলতে পারছি না। সেই চরিত্রটি কি ? সেই বিশেষ চরিত্রের কথা আমরা একটু পরেই বলবো।

সব মানুষই মানুষ। তবু চীন দেশের মানুষকে আমরা বলি চীনা অর্থাৎ চীন-দেশের মানুষ। কিন্তু কেন তা'কে আমরা চীনা বলবো ? কোন চীনার ছেলের বাংলায় জন্ম হ'লে তাকে বাঙ্গালী বলতে আপত্তি কি আছে ? বাঙ্গালীর সঙ্গে চীনার কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, তাই না আমরা একজনকে বলি বাঙ্গালী, আর একজনকে বলি চীনা। যে-কোন চীনার এমন কোন বিশেষত্ব আছে, যার জন্যে আমরা তাকে বলি চীনা। সেই বিশেষত্বগুলি কি ?—তার আচার-ব্যবহার ? তার সাজ-পোশাক ? তার ভাষা ? কোন বাঙ্গালী চীন দেশে গিয়ে যদি চীনাদের ভাষা শেখে, চীনার সাজ-পোশাক পরে, চীনাদের আচার-ব্যবহার মেনে চলে, তবুও সে বাঙ্গালীই থাকে। দশজন চীনার মধ্যে বসে থাকলেও যে-কোন লোক তাকে দেখে বলবে, সে চীনা নয়, সে বাঙ্গালী। কেন ?

চীন দেশের লোকের চেহারার মধ্যে চরিত্রগত লক্ষণ হচ্ছে তার চওড়া মুখ, চ্যাপ্টা নাক, চোখের কোণে ভাঁজ, গায়ের হলদে রং। কিন্তু এই লক্ষণগুলি আবার কেবল চীনাদের মধ্যেই দেখা যায় না। মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত যে-কোন উপজাতিরই এই সকল লক্ষণের মধ্যে কোন-না-কোন একটি লক্ষণ থাকবে। কিন্তু এই সকল লক্ষণ যে মোঙ্গলীয় জাতির লক্ষণ, তা আপনার জানা থাকা চাই। তা না হ'লে আপনি একজন চীনাকে দেখে তাকে

অন্য যে-কোন জাতির লোক বলে ভুল করতে পারেন। সুতরাং জাতিবিচারের মূলে রয়েছে মানুষের বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। মানুষ এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার সহজাত বিচারশক্তির ফলে এবং এই বিচারশক্তির বলেই মানুষ আজ এত বড় হ'য়ে উঠেছে। এই বিচারশক্তির ফলেই পৃথিবীর সব কিছুরই এক একটি বিশেষ চরিত্রগত রূপ মানুষের মনের পর্দায় আঁকা রয়েছে। যেই কোন একটি জিনিস মানুষের চোখের সামনে এসে পড়ে, অমনি সংগে সংগে মানুষের অবচেতনায় বস্তুটির ছবি ফুটে ওঠে এবং তার চেতনার মধ্যে এসে পড়ে। বস্তুটি চোখের সামনে এলেই যে আমাদের মনের পর্দায় বস্তুটির ছবি ফুটে ওঠে, তা নয়। বস্তুটি আমাদের চোখের সামনে না থাকলেও, বস্তুটিকে আমরা আমাদের মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু আমাদের মনের পর্দায় ফুটিয়ে-তোলা বস্তুটির আকৃতি বা রূপগত লক্ষণগুলির সংগে আমাদের বস্তুটির অনেক পার্থক্য থাকবে।

বিশেষ লক্ষণ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, বিশেষ লক্ষণ কাকে বলবো? কোন লোক স্যুট পরলেই আমরা বলি: "লোকটা সাহেব **সেজেছে**।" কিন্তু আমরা তো বলি না যে, সে **সাহেব**। তার কারণ, সাহেবের ছবির সঙ্গে স্যুট-পরা রূপের কিছু মিল থাকলেও সে-মিল সম্পূর্ণ নয়। কোন একটা লক্ষণের অভাব থাকার জন্যে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তাকে সাহেব বলতে পারছি না। কোন সাহেব যদি স্যুট পরে, তা হ'লে আমরা তো বলিনা যে, সে সাহেব সেজেছে। তার কারণ, আমরা জানি, সাহেবের একটা লক্ষণ হচ্ছে স্যুট পরা। সুতরাং সাহেবের স্যুট পরার অর্থ সাহেব সাজা নয়। সাহেবের চরিত্রগত লক্ষণ হচ্ছে তার বিশেষ রূপ,—তার গায়ের রং, তার চোখের নীল রং। কোন চীনা স্যুট পরলেও আমরা তাকে সাহেব বলি না। তার কারণ, চীনাম্যানের চরিত্রগত লক্ষণগুলি আমাদের জানা আছে। সুতরাং স্যুটটা হচ্ছে একটা বাইরের

লক্ষণ। এই বাইরের লক্ষণ দেখে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর পার্থক্যবিচার করা চলে না। বস্তুবিচার করতে গেলে বস্তুর চরিত্রগত লক্ষণ জানা দরকার।

এখন দেখুন, কোন ব্যক্তিকে চীনাম্যান বলতে গেলে আমরা মনের ভিতরে কিরূপে চীনার ছবি ফুটিয়ে তুলি।

প্রথম আমাদের মনে উদিত হয় একটি মানুষের কথা, অর্থাৎ মানুষ জাতির একজনের কথা। তারপর আমরা এই মানুষ জাতির এই মানুষটিতে একটি একটি করে লক্ষণ জুড়তে থাকি এবং শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এই ঃ

মানুষ + চওড়া মুখ + চ্যাপ্টা নাক + হলদে রং + চোখের কোণে ভাঁজ
=চীনাম্যান

কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, চীনাম্যানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হ'লো, তা ঠিক নয়। কারণ, এই বর্ণনার মধ্যে জাপানীদের, নেপালীদের, ভুটিয়াদের, আসামীদেরও ফেলা যায়। সুতরাং চীনাম্যানের সংজ্ঞা ঠিকমত দিতে গেলে আরো চরিত্র জুড়তে হ'বে। তা হ'লে চীনাম্যানের সঠিক সংজ্ঞা দাঁড়ায় এই ঃ

মানুষ + চওড়া মুখ + চ্যাপ্টা নাক + হলদে রং + চোখের কোণে ভাঁজ
+চীন দেশের লোক=চীনাম্যান

এতক্ষণে আমরা সতিকারের চীনার বর্ণনা পেলাম।

কিন্তু এ বর্ণনার মধ্যেও একটু ভুল রয়ে গেল। কারণ,

চওড়া মুখ + চ্যাপ্টা নাক + হলদে রং + চোখের কোণে ভাঁজ
=মোঙ্গলীয় জাতি।

এবার যদি বলি, মোঙ্গলীয় জাতি+চীন দেশের লোক=চীনা,
মোঙ্গলীয় জাতি+নেপালের লোক=নেপালী,
মোঙ্গলীয় জাতি+জাপানের লোক=জাপানী—

তাহ'লে আর আমাদের ভুল হয় না।

এখন দেখুন, মানুষ জাতি থেকে কোন একটি বিশেষ জাতিতে আসতে হ'লে প্রতি ধাপে আমরা মানুষ জাতির সংগে একটি করে বিশেষ গুণ জুড়ে দিচ্ছি :

(১) মানুষ জাতি

(২) +চওড়া মুখ ইত্যাদি=মোঙ্গালীয়

(৩) +নেপাল-বাসী=নেপালী

আমাদের এইরূপ চিন্তাধারার ফলে হচ্ছে কি? প্রতি ধাপে যেমন একটি করে গুণ জুড়ে দিচ্ছি, সংগে সংগে মানুষ জাতির বিস্তার কমে যাচ্ছে এবং তার গুণ বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত মানুষ জাতি এমন একটি সীমাবদ্ধ দলে এসে পড়লো, যে-দলে নেপালী ব্যতীত আর কারুর স্থান নেই।

এমনিভাবে বিভাগ যত বেশী হ'তে থাকে, মূল জাতির বিস্তার ততই কমতে থাকে এবং তার গুণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

এর ফলে হয় কি, কেবল মাত্র যে একটি বিশেষ জাতি সম্বন্ধে আমাদের নির্ভুল ধারণা জন্মে তা নয়, ঐ জাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আর যে-কোন জাতির সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ হয়।

পৃথিবীর কোন কিছু সম্বন্ধে সঠিক একটা ধারণা করতে গেলে, আমাদের এমনিভাবে চিন্তা করতে হয়। আর একটি উদাহরণের দ্বারা আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইরূপ জাতি-বিচারের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

যখনই আমরা বলি রামের যক্ষ্মা হ'য়েছে, তখনই আমাদের মনে প্রথম জাগে রোগের কথা। তারপর আমরা রোগের সঙ্গে যক্ষ্মা গুণটি জুড়ে দিই, তারপর জুড়ে দিই রামকে। আমাদের চিন্তাধারা ঠিক এইরূপ হয় :

(১) রোগ

(২) +যক্ষ্মা=যক্ষ্মারোগ

(৩) +রাম

=যক্ষ্মারোগী রাম।

এখন দেখুন, রামের ঠিকমত চিকিৎসা করতে গেলে কেবল রোগের চিকিৎসা করলে চলবে না, যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করতে হ'বে। আবার কেবল যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করলেও তা সম্পূর্ণ হ'বে না—কারণ, রাম বাদ পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং রামের যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করতে হ'বে। কেননা, রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বাদ দিলে, চিকিৎসা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই রোগের উপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রবণতা থেকে যায়।

সমস্ত বস্তুরই এইরূপ জাতিবিচার করা চলে। যে-সব বস্তুকে ধরা-ছোঁওয়া বা দেখা যায়, কেবল সেই সব বস্তুরই যে এইরূপ জাতিবিচার হ'তে পারে, তা নয়। মানবমনের চিন্তাধারা, জ্ঞান, ধারণা, প্রবৃত্তি ইত্যাদি সব কিছুকেই এমনি ভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরভাবে ভেঙ্গে ফেলা যায়। এইরূপ জাতি-বিচারের ফলেই মানুষ আজ প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই পরিষ্কার ধারণা করতে পেরেছে এবং এই বস্তুবিচারের ফলেই আজ প্রকৃতি মানুষের দাসত্ব স্বীকার করেছে।

কিন্তু এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, এরূপ জাতিবিচার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং জাতিবিচার সব সময়েই ব্যক্তিগত। জাতিবিচার মানুষের পর্যবেক্ষণ ও অবধারণের শক্তির উপর নির্ভর করবে। প্রতি ক্ষেত্রেই বস্তুর নূতন নূতন চরিত্র অন্য কোন ব্যক্তির পর্যবেক্ষণে ধরা পড়তে পারে এবং তার ফলে বস্তুর সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হ'তে পারে। সুতরাং গুণ জুড়ে জুড়ে যত সূক্ষ্মভাবেই আমরা কোন বস্তুকে বিচার করতে চেষ্টা করি না কেন, নূতন গুণ জুড়ে দেবার সুযোগ সব সময়েই থাকে। বক্তিগতভাবে কোন একটি বস্তুর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু আর একজন ব্যক্তির কাছে তা সম্পূর্ণ না হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। এই কারণে জাতিবিচার এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন, যা'তে নূতন গুণ সব সময়েই জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন ধরুন, প্রাণযুক্ত হওয়ার জন্যে আগে কেবল জীবকেই প্রাণী বলা হ'ত। কিন্তু গাছেরও যে প্রাণ আছে, এ-ধারণা তখন কেউই করে নি। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু

দেখালেন যে, গাছেরও প্রাণ আছে। সুতরাং গাছকেও এখন প্রাণিজাতির মধ্যে ফেলা যায়। কেবল তা-ই নয়, তিনি বলে গেছেন, পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই প্রাণ আছে। সে-কথা যদি একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তা হ'লে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি বিপুল পরিবর্তন যে ঘটে যাবে, তা একবার চিন্তা করে দেখুন!

এরূপ ভুল থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের জাতিবিচার করতে হ'বে। তা না করলে হয়তো এ-পৃথিবীতে আমরা এক দিনের জন্যে বেঁচে থাকতে পারবো না। মানুষের যদি এরূপ বিচারশক্তি না থাকতো, তা'হলে সে পথ চলতে প্রতিপদে বিপদে পড়তো। একটা মোটরগাড়ী একজনকে চাপা দিল দেখে কোন মানুষ যদি বুঝতে না পারে যে, অনুরূপ অবস্থায় তার পক্ষেও মোটরে চাপা পড়া সম্ভব, তা হ'লে তাকেও চাপা পড়তে হ'বে। কেবল অভিজ্ঞতা কোনই কাজে লাগবে না, অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই।

পুস্তকের জাতি বা শ্রেণী-বিচার

এখন দেখা যাক, পুস্তক সম্পর্কে এরূপ জাতিবিচার কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বই সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা আগে বলেছি। আমরা বলেছি যে, পুস্তকের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং পুস্তকের সেরূপ অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না। অন্ততঃ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য। কোন বইয়ের অস্তিত্বকে সক্রিয় ও সার্থক করে তুলতে হ'লে চাই লেখক ও পাঠককে। এ-দু'জনের একজনের অভাবে বইয়ের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না।

বইয়ের আমরা যে সংজ্ঞা দিলাম, তা সম্পূর্ণ দর্শন শাস্ত্র-সম্মত। এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই সংজ্ঞার কতটা প্রয়োগ করা চলে, তা-ই দেখা যাক।

লেখকের নামানুসারে বই সাজানো

গ্রন্থাগারে আমরা লেখকের নামে বই সাজিয়ে রাখতে পারি। অর্থাৎ এক লেখকের যত বই, সেগুলিকে আমরা এক জায়গায় রাখতে পারি এবং এরূপ ভাবে বই সাজিয়ে রাখলে বই-সাজানোর মধ্যে একটা নিয়ম থাকবে।

এর ফলে কোন লেখকের কোন একখানি বই অনতিবিলম্বে খুঁজে বার করতে পারা যা'বে। লেখকের নামে বই-সাজানোয় আরও একটা লাভ হচ্ছে এই যে, এর ফলে কেবল যে কোন লেখকের লেখা বই জানা যায় তা নয়, বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও একটা ধারণা হয়। কারণ, এক-একজন লেখক এক-একটী বিশেষ বিষয় নিয়ে বই লেখেন। কোন পরিচিত বিজ্ঞানী বিজ্ঞান সম্বন্ধেই লেখেন, কোন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতি সম্বন্ধেই লেখেন। সেই কারণে লেখকের নামের সঙ্গে বইয়ের একটী স্থায়ী চরিত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। কিন্তু যদি কোন পাঠকের কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে কোন বইয়ের প্রয়োজন হয় এবং তার সেই বিষয়ের বই সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তা হ'লে তার পক্ষে সে-বই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হ'বে না। অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় বিষয়ের বই কয়েকখনি থাকলেও, সে বই খুঁজে পাবে না এবং ফলে সে দোষ দেবে গ্রন্থাগারকে। তার ধারণা হ'বে, গ্রন্থাগার তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। লেখকের নামে বই সাজালে, লেখকের নাম অনুসারে বই খোঁজার সুবিধা আছে। কিন্তু আজকালকার গ্রন্থাগারে কেবল যে বিশেষ বিশেষ লেখকেরই বই থাকবে, তার কোন মানে নেই। পত্রিকা, পুস্তিকা, কোন সঙ্ঘের বহু বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকাবলী, আলোকচিত্র, ছবি—সব কিছুই গ্রন্থাগারে থাকতে পারে এবং আজকালকার যুগে পাঠকের এই সব বস্তুরই বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু কেবল লেখকের নামে তো আর সব কিছুকেই সাজানো যাবে না। আর, যদিও বা কোন প্রকারে সাজানো যায়, তা হ'লেও সব বিষয়ের সংগেই লেখকের সম্বন্ধ ঠিক থাকবে না। সুতরাং গ্রন্থাগারে লেখকের নামে বই সাজালে, সে-সাজানো বিশেষ কার্যোপযোগী হ'বে না। এমন এক সময় ছিল বটে, যখন লেখকের নামে বই-সাজানো সকলের খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনবৃদ্ধির সংগে সংগে বইয়ের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বই-সাজানোর নিয়মেরও পরিবর্তন হ'য়ে গেছে।

মলাটের রং অনুসারে পুস্তকের শ্রেণী-বিভাগ

বইয়ের চরিত্রের মধ্যে হচ্ছে বইয়ের রং, বইয়ের নাম ও বইয়ের আকার।

এক-এক বিষয়ের বই এক-এক রঙের মলাটে বাঁধিয়ে সাজানো যেতে পারে। কিন্তু বিষয়ের সংখ্যা কত বেশী হ'তে পারে একবার ভেবে দেখলে, বিভিন্ন বিষয় অনুসারে বিভিন্ন রঙের ললাটে বই বাঁধিয়ে সাজানো আর সম্ভব হ'বে বলে মনে হয় না। বইয়ের রঙে বই সাজাতে গেলে একমাত্র উপায় হচ্ছে বইগুলিকে এক একটি ব্যাপক বিভাগে ভাগ করে সাজানো। কিন্তু তাতে বিভাগ সূক্ষ্ম হ'বে না এবং তার ফলে সে-বিভাগ পাঠকের বিশেষ কাজে লাগবে না।

বইয়ের আকার অনুসারে বই সাজাতে গেলেও উপরের মত অবস্থা হ'বে। কারণ, বইয়ের আকার খুব বেশী প্রকারের নয়। সুতরাং এক-একটি আকারের সাজানো বইয়ের সংখ্যা বহু হ'তে বাধ্য।

বইয়ের নাম অনুসারে বই সাজানো যেতে পারে। কারণ, বইয়ের নাম থেকে বইয়ের অন্তর্গত বিষয়ের কতকটা ধারণা করতে পারা যায়। কিন্তু তা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তার উপর, বইয়ের নাম অনেক সময় অন্য সংস্করণে পরিবর্ত্তিত হয়েও যায়। বইয়ের নামে বই সাজানোর আরো একটা মুস্কিল হচ্ছে এই যে, বইয়ের নামের গোড়াকার অক্ষরে বই সাজাতে হ'বে, কিন্তু তা'তে দলগতভাবে বই সাজানো হ'বে না। উপরন্তু বেশির ভাগ বইয়েরই সাজানোর সংগে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যেমন 'A Manual of Library Classification', 'An Introduction to Chemistry', 'A Treatise on Tuberculosis' etc.। প্রথম বইখানি সব কিছু বিষয়ের manual-এর সংগে পড়বে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইয়ের অবস্থাও হ'বে ঐ একই রকমের। সুতরাং আমরা দেখছি, বইয়ের নাম অনুসারে বই সাজানোরও বিশেষ কিছু মূল্য নেই। এখন তা হ'লে বাকী থাকে পাঠক।

পাঠক অনুসারে বই-সাজানো

অনেকে হয় তো বলবেন, পাঠক অনুসারে বই সাজানো কেমন করে সম্ভব! কিন্তু আমরা তো আগেই বলেছি, পাঠক আছে বলেই বই আছে। পাঠক না থাকলে বই থাকা না-থাকারই সামিল হ'য়ে পড়ে। বইয়ের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ করতে গেলে পাঠককে চাই। এবং পাঠক না থাকলে লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হয় না।

পাঠক বই পড়ে। তার কারণ, সে বই পড়ার প্রয়োজন অনুভব করে। তার বই পড়ার উদ্দেশ্য নিজেকে বেঁচে থাকবার মত করে গড়ে তোলা, অর্থাৎ **লেখকের সৃষ্ট বস্তুকে গড়ে তোলার সংগে সংগে পাঠক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেকেও গড়ে তুলতে থাকে।** নিজেকে নিত্য নূতন করে গড়ে তুলতে হ'লে পাঠককে নিত্য নূতন জ্ঞান অর্জন করতে হ'বে এবং সে-সুযোগ সে বইয়ের ভিতর থেকে সহজ উপায়ে পেতে পারে।

তা হ'লে এখন আমরা বুঝতে পারছি, গ্রন্থাগার যখন পাঠকের জন্যে, গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য যখন পাঠককে গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া, তখন বইয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান অনুসারে বইয়ের জাতিবিচার করলে সে-জাতিবিচার অন্যায় হ'বে না। প্রথমতঃ যার প্রয়োজন, তার মুখ চেয়ে বই সাজানো হ'বে, দ্বিতীয়তঃ লেখকের উদ্দেশ্য সফল করা হ'বে এবং তৃতীয়তঃ, বইয়ের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ করে তোলা হ'বে।

এ তো গেল বই-সাজানোর উদ্দেশ্যের কথা। কিন্তু জ্ঞানানুসারে বই সাজালে, সে-সাজানো কার্যোপযোগী হ'বে কিনা, তা-ই আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হ'বে।

অন্তর্নিহিত জ্ঞান অনুসারে বই ও লিখিত যে-কোন বস্তুকে বিচার করে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, সব রকমের লিখিত বস্তুর ভিতরে কোন-না-কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে। লেখক সৃষ্টি করেন, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলে কোন বস্তুর বা কোন বিষয়ের

যে-কোন গুণ তাঁর চেতনার পটে ফুটে ওঠে, সেগুলি তিনি ফুটিয়ে তোলেন কথার মাধ্যমে এবং আমাদের কাজ হচ্ছে লেখক ঠিক যে-জিনিসটুকু বলতে চান, ঠিক সেই জিনিস অনুসারে এক একখানি বইকে এক-একটি দলে ভাগ করে ফেলা এবং প্রত্যেক বিভাগ এমন হওয়া চাই যে, সেই বিভাগের অন্তর্গত সমস্ত বইয়ের বিষয় একই হ'বে।

ধরুন, একখানি বিশ্বকোষের কথা। বিশ্বকোষ এমন একখানি বই, যার ভিতরে সভ্যতাবিকাশের সংগে সংগে মানুষ যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, সেই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। যত দিন যাবে, বিশ্বকোষের কলেবরও ততই বাড়বে। কারণ, মানবসভ্যতার বিকাশ যত বেশী হ'তে থাকবে, মানুষের অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারও ততই বাড়তে থাকবে। এই বিশ্বকোষের ভিতর সব কিছু (আজ পর্যন্ত মানুষ যা জেনেছে) সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু সে-বিবরণ সাধারণ জ্ঞানের জন্যে কাজে লাগলেও, কোন বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানসঞ্চয় করতে হ'লে সে-বিবরণ যথেষ্ট হ'বে না। সে-বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত বই পড়তে হ'বে এবং কি কি বই পড়লে সেই বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ হ'তে পারে, তা বিশ্বকোষেই দেওয়া থাকবে। বিশ্বকোষের ভিতর বিষয়গুলি সাজানো থাকে বিষয়ের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে। বিশ্বকোষে যে নিয়মানুসারে বিষয় সাজানো হ'য়েছে, আমরা যদি সেই নিয়মে বই সাজাই, তা হ'লে কি হয়? বিষয়ের নামানুসারে বই সাজালে এক এক বিষয়ের বই এক এক স্থানে থাকবে বটে, কিন্তু বিষয়গুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তার ফলে কোন বিষয়ের একখানি বই খুঁজে বার করতে দেরি হ'বে। কারণ, বিরাট গ্রন্থাগারের মধ্যে কোন্‌খানে সে-বিষয়ের বই থাকবে, তা মনে করে রাখা সম্ভব হ'বে না। এরূপ বই-সাজানোর আরো অনেক অসুবিধা আছে। সে-সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই বলবো।

তবে এটুকু এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, পাঠকের দিক থেকে বই-সাজানোই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তা'তে পাঠকের চাহিদা মিটবে এবং বইগুলিও মঞ্চের উপর

মরে পড়ে থাকবে না। পাঠকের মুখ চেয়ে বই সাজাতে হ'লে, বইয়ের বিষয় অনুসারে, অর্থাৎ মানুষের **আজ পর্যন্ত** অর্জিত জ্ঞানের বিভাগ অনুসারে বই সাজাতে হ'বে।

এখন দেখা যাক, জ্ঞানের বিভাগ সম্ভবপর কিনা এবং যদিও তা সম্ভবপর হয়, তা কেমন করে পুস্তক-সাজানোর কাজে লাগানো যায়। আমরা বহুবার বলেছি, জ্ঞানের জাতিবিভাগ সম্ভব নয়। তার কারণ, মানবসভ্যতার উন্নতিরও যেমন শেষ নেই, মানুষের জ্ঞানের বোঝাও তেমনি ক্রমশঃই বাড়বে। অবশ্য, বলতে পারা যায় না, শেষ পর্যন্ত মানুষকে হয়তো এই বোঝার ভারেই ভেঙ্গে পড়তে হ'বে। এর পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে এবং সেই ভয়ে এখন মানুষ বিশ্ববন্ধুত্বের পিছনে ছুটছে।

জ্ঞানের জাতি বা শ্রেণী-বিভাগ

কোন বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যে কখনও সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, সে-কথা আমরা গোড়ার দিকেই বলেছি। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জাতিবিভাগ সেই জন্যে চিরকাল অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কিন্তু তবু আমাদের জ্ঞানের বিভাগ করতে হ'বে। কারণ, জ্ঞানের বিভাগ না করলে কোন বিষয় সম্বন্ধে আমরা নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারবো না! জ্ঞানের জাতিবিভাগের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি: **"কতকগুলি বস্তুকে কতকগুলি সমলক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন ভাগে সাজিয়ে রাখা এবং যে-বস্তুগুলির লক্ষণের মধ্যে মিল নেই, সেই বস্তুগুলিকে ভিন্ন করে রাখা।"**

বস্তুকে এইরূপে সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথমতঃ কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারাকে ঠিক পথে পরিচালনার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা এবং বিষয়গুলি যাতে সহজে আমাদের মনের পর্দায় আঁকা থেকে যায়, তার ব্যবস্থা করা।

জ্ঞানের জাতিবিভাগ প্রথম করেন বেকন (BACON)। বেকনের জাতিবিভাগের কিছু পরিবর্তন করেন হ্যারিস (HARRIS) এবং হ্যারিসের

জাতিবিভাগকে পুস্তকের জাতিবিচারের কাজে লাগান ডিউই (DEWEY)। তিনটি ছকই আমরা নীচে পাশাপাশি দিলাম ঃ

বেকন		হ্যারিস	ডিউই
ইতিহাস	**নীচু হইতে**	দর্শন	**বহু বিষয়ের বই**
	দর্শন	ধর্ম	দর্শন
		সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান	ধর্ম
			সমাজতত্ত্ব
			ভাষা-বিজ্ঞান
		ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান	ব্যবহারিক-বিজ্ঞান
কবিতা	কবিতা	কলা	কলা
		ললিতকলা	
		কবিতা	সাহিত্য
		উপন্যাস ও গল্প	
		অন্যান্য সাহিত্য	
দর্শন	ইতিহাস	ইতিহাস	ইতিহাস
		ভূগোল	জীবনী
		ভ্রমণ	ভূগোল ও ভ্রমণ
		ইতিহাস	
		জীবনী	

জাতি-বিভাগের ইতিহাসের মধ্যে ফ্রান্সিস্ বেকনের জাতি-বিভাগ হ'লো সর্ব-প্রধান এবং সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। এই জাতি-বিভাগের ছক প্রথম

ছেপে বার হয় ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'The Advancement of Human Learning' নামক পুস্তকে।

আমরা বহুবার বলেছি যে, এই পৃথিবীর অস্তিত্ব কেবল মানুষের চেতনা-শক্তির উপর নির্ভর করে। মানুষের চেতনা-শক্তির মুখোমুখী না হ'লে পৃথিবীর সব জিনিসই অবসাদগ্রস্ত জড়পদার্থের মত পড়ে থাকতো। প্রথম একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ে, দৃষ্টির অনুভূতির দ্বারা সেই বস্তুটীর একটী ছবি আমাদের মনের মধ্যে আঁকা হ'য়ে যায়। তার ফলে যখন খুশি, সেই জিনিসটিকে আমরা মনে মনে বিচার করতে পারি। কিন্তু বস্তুটি যতক্ষণ আমাদের চোখের সামনে থাকে, ততক্ষণ সে-ছবি আমাদের মনের মধ্যে থাকে। সে-ছবি থেকে বস্তুর অবর্তমানে যে-ছবি আমাদের মনের মধ্যে ফুটে ওঠে, সে-ছবি অনেক ভিন্ন। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, প্রথমটি উদ্ভূত হচ্ছে পর্যবেক্ষণ থেকে এবং দ্বিতীয়টি সৃষ্ট হচ্ছে আমাদের **কল্পনা** থেকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হ'বে।

ধরুন, রামের সঙ্গে আপনার প্রথম বন্ধুত্ব হয় কোন রেস্তোরাঁয়। সেই সময় থেকেই রামের ছবি আপনার মনে আছে। ইচ্ছে করলেই আপনি রামকে মনের ভিতরে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। রামকে যদি হাসিমুখে দেখতে চান, তা-ও দেখতে পারেন, আবার তাকে অন্য কোন স্থানে দেখতে ইচ্ছে করলে তা-ও দেখতে পারেন। কিন্তু চোখের সামনে রেস্তোরাঁয় রামকে যেমন দেখেছিলেন, ঠিক সে-রামকে আর দেখতে পাবেন না।

সুতরাং প্রথমতঃ বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি, তার পর স্মৃতি। তার পর কল্পনার দ্বারা একই জিনিসকে আমরা নানারূপে দেখতে চেষ্টা করি, আর না হয়, সেই একই জিনিসকে বিশ্লেষণ করে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবার চেষ্টা করি। সুতরাং আসলে মনের তিনটি ক্রিয়া হচ্ছেঃ স্মরণ করে রাখা, কল্পনা ও বিশ্লেষণ। এই তিনটী ক্রিয়ার বিষয় হচ্ছে—ইতিহাস, কবিতা ও

দর্শন। জ্ঞানের এই তিনটি ক্ষেত্র। প্রত্যেক ক্ষেত্রকে আবার ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন ধরুন, ইতিহাসকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ও স্বভাবের ইতিহাস।

বেকনের পূর্বেও যে জ্ঞানের জাতি-বিভাগের চেষ্টা হয় নি, তা নয়। জাতি-বিচারের বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে-ইতিহাস জেনে আমাদের বিশেষ লাভ নেই।

আধুনিক যুগের পুস্তকের জাতি-বিভাগের জন্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ছক হচ্ছে—**ডিউই-বিভাগ**। ডিউই নিজেই বলেন, তিনি ১৮৭০ সালে সেণ্ট লুই (St. Louis) গ্রন্থাগারের জন্য প্রস্তুত ডব্লু টি হ্যারিস-এর বিভাগের সাহায্য নিয়েছিলেন।

আগে পুস্তকের জাতি-বিভাগের যে তিনটি ছক পাশাপাশি দেওয়া হ'য়েছে, তা থেকে বেশ বোঝা যায়, মেলভিল ডিউই হ্যারিসের বিভাগকেই একটু অদল-বদল করে নিজের কাজের মত করে নিয়েছেন। ডিউই'র ছক সম্বন্ধেই আমরা বেশী করে বলবো, কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হ'বে, বিভাগের নিয়মগুলি কি?

বিভাগের নিয়ম

কতরকম উপায়ে বইয়ের বিভাগ করা যেতে পারে, তা আমরা পূর্বেই বলেছি এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, বইয়ের বিষয় অনুসারে বই সাজালেই তা কার্যোপযোগী হ'বে। তার কারণ, তাতে পাঠকের প্রয়োজন মেটান সুবিধাজনক হ'বে।

কোন বিষয়ের জাতি-বিভাগ যে সম্ভব নয়, তা আমরা জানি। যদিও বা বিষয়ানুযায়ী একটা বিভাগ করা সম্ভব হয়, আবার বইকে বিভাগ করা

সম্ভব নয়। একখানি বই, ধরুন—শরৎবাবুর 'দেবদাস', না হয় 'নববিধান'। আপনি পড়ুন, আরো দশজনকে পড়তে দিন। তার পর দশজনে এক সঙ্গে বসে কে বইখানি থেকে কি জেনেছেন, বলতে থাকুন। দেখবেন, দশজনের মতই বিভিন্ন হ'বে, অন্ততঃ বইখানি সম্বন্ধে সকলের মত সমান হ'বে না। কেউ বলবেন, শরৎবাবু 'নববিধানে' 'বাস্তবতা' নিয়ে লিখেছেন; কেউ বলবেন, তিনি 'ধর্মসংস্কার' করতে চেয়েছেন; কেউ বলবেন, তিনি 'আদর্শবাদী'; আবার কেউ বলবেন, তিনি 'নিজের মত একটি সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন'। প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত মতামতের রং অনুসারে ছবি যুটে উঠবে, এ-কথা আমি আগেই বলেছি।

আর একখানি বই তুলে নিন। ধরুন, একখানি প্রবন্ধের বই। বই-খানিতে দশটি প্রবন্ধ আছে। দশটি প্রবন্ধ দশটি বিষয় সম্বন্ধে লেখা। সে ক্ষেত্রে বইখানিকে কোন একটী বিভাগে ফেলা চলবে না, অথচ বইখানির দশখানি কপি কেনাও কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং বইখানিকে টুকরো টুকরো করে দশ জায়গায় রাখাও চলে না। সুতরাং এইরূপ একখানি বইকে একস্থানে রাখলেও আপনার বই-সাজানোর উদ্দেশ্য সফল হয় না।

পাঠক বই পড়তে চায় কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে। মানুষের চাহিদা ব্যক্তিগত। পুস্তকের চাহিদা না থাকলে পুস্তকের কোন মূল্য থাকে না এবং চাহিদা অনুসারে বই দিতে না পারলেও বই রাখার কোন মূল্য হয় না। সেই জন্যে **প্রত্যেকখানি বই এমন স্থানে রাখতে হবে, যেখানে বইখানি প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে** এবং তা করতে গেলে **বইগুলিকে সব সময় পাঠকের প্রয়োজন অনুসারে সাজাতে হ'বে।**

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, কোন একটী বিশেষ চরিত্র অনুসারে বস্তুর বিভাগ

করতে হ'বে এবং এই চরিত্র বস্তুর **অন্তর্নিহিত** চরিত্র হওয়া চাই। বইয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানই হ'লো বইয়ের চরিত্র। সুতরাং জ্ঞানের জাতি-বিভাগের অসম্পূর্ণতা থাকলেও তা আমাদের বইয়ের জাতি-বিভাগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হ'বে।

পূর্বে প্রদত্ত ডিউই'র বিভাগটী লক্ষ্য করুন:

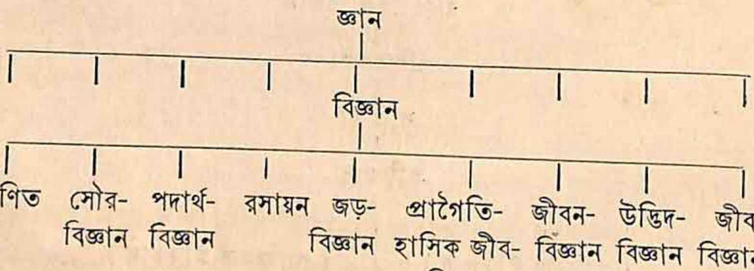
দর্শন
↓
ধর্ম
↓
সমাজবিজ্ঞান
↓
ভাষাবিজ্ঞান
↓
বিজ্ঞান
↓
ব্যবহারিক বিজ্ঞান
↓
ললিতকলা
↓
সাহিত্য
↓
ইতিহাস
↓ ↓ ↓
(পৃথিবীর ইতিহাস) (রাষ্ট্রীয় ইতিহাস) (ব্যক্তিগত ইতিহাস)

জ্ঞানের এই হ'লো নয়টী বিভাগ। ডিউই আর একটী বিভাগ করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'সাধারণ বিভাগ' (Generalia)। এই বিভাগটীকে বলা

যেতে পারে জ্ঞানের সাধারণ ক্ষেত্র। বাকী নয়টী ক্ষেত্র হচ্ছে জ্ঞান-ক্ষেত্রের এক একটি অংশ। অর্থাৎ এক-একটি ক্ষেত্রকে এক একটী গ্রন্থাগার ধরা যেতে পারে এবং সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রকে একত্রে যোগ করলে আমরা পাবো জ্ঞানের সাধারণ ক্ষেত্র।

উপরের প্রত্যেক ক্ষেত্রটি ডিউই'র বিভাগ অনুসারে আবার নয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং যে-ক্ষেত্রটিকে ভাগ করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রটীকে ধরলে প্রতি বারেই দশটী করে ক্ষেত্র হ'বে। কিন্তু মনে রাখবেন, প্রতিবারে এই যে দশটি করে বিভাগ, তা কেবল গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের খাতিরে এবং বিভাগের সুবিধার জন্য। প্রতি বারে এই দশটি করে বিভাগ করার জন্য ডিউই'র বিভাগের নাম হয়েছে **দশমিক বিভাগ**।

এবার কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্র ধরুন ঃ



উপরিউক্ত বিভাগটি লক্ষ্য করুন, দেখবেন—মূল চরিত্র হচ্ছে জ্ঞান। এই চরিত্র-বিভাগের প্রত্যেক অংশে বর্তমান প্রতিবারেরই জ্ঞানের সঙ্গে কেবল আর

একটি করে চরিত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে প্রতি ক্ষেত্রের বিস্তার কমে এসেছে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই গুণ বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ঃ

জ্ঞান+বিজ্ঞান=বিজ্ঞানের জ্ঞান
+গণিত=গণিতবিজ্ঞান
+সৌরজগৎ=সৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি

এই বিভাগে লক্ষ্য করবার আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, একটি বিভাগ তার আগের বিভাগের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। একটি বিভাগ তার আগের বিভাগ থেকে উঠে তার পরের বিভাগে গিয়ে পড়ছে। অর্থাৎ একটি বিভাগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকলে, তবেই তার পরের বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। যেমন ধরুন, সৌরবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে গেলে গণিতবিজ্ঞান সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই। আবার পদার্থবিজ্ঞানের উৎপত্তি হচ্ছে সৌর-বিজ্ঞান থেকে এবং পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকলে রসায়নের কিছুই বুঝতে পারা যাবে না।

এ তো গেল জ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্রের কথা। কিন্তু প্রথমে যে নয়টি ভাগ করা হ'য়েছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়? প্রথম ইতিহাস না হ'য়ে দর্শন হ'লো কেন? পঞ্চম বিভাগে বিজ্ঞানকে স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় বিভাগে সমাজবিজ্ঞানের স্থান হ'লো কেন? বিজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞান থাকাই তো যুক্তিযুক্ত ছিল?

সত্যি কথা বলতে কি, ডিউই'র এই নয়টি বিভাগের **পরস্পরের মধ্যে মিল নেই**। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্র থেকে আর একটি ক্ষেত্র উৎপত্তিলাভ করে পরের ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ছে না। কিন্তু জ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিক থেকে এই নয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে একটা সম্বন্ধ দেখানো যায়। ডিউই নিজেও এইরূপ একটা সম্বন্ধ দেখাবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

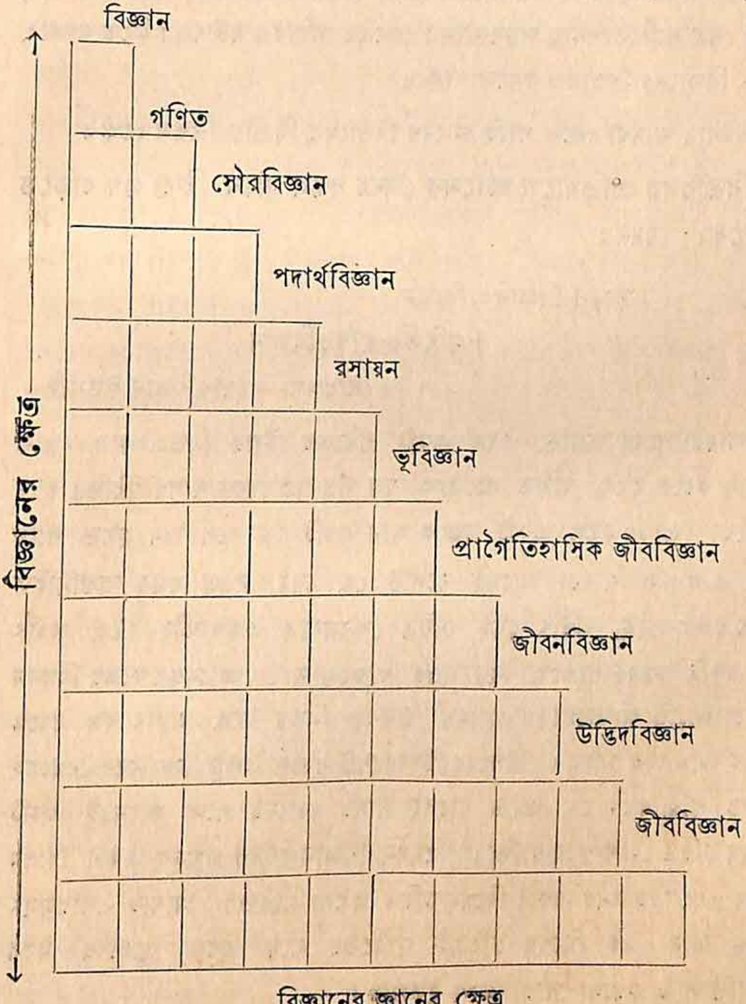
মানুষের উৎপত্তির প্রথম থেকেই তার চেতনাশক্তি ছিল কিনা, তা বলা

কঠিন। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা-শক্তিরও ক্রমবিকাশ হয়েছে। মানুষ যত বেশী সভ্য হচ্ছে, তত বেশী তার অনুভবশক্তি বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের চেতনাশক্তি বেড়ে চলেছে। মানুষের চেতনা-শক্তির যেদিন স্ফুরণ হ'লো, মানুষের মনে সেদিন প্রথম প্রশ্ন জাগলো ঃ "আমি কে ?" এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দর্শনের সৃষ্টি হ'লো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জাগলো, সে কোথা থেকে এলো। এই প্রশ্নের উত্তরে এলো তার ভগবান সম্বন্ধে ধারণা। মানুষের সংখ্যা যখন ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো এবং যখন তারা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে সুরু করলো, সম্ভবতঃ সেই সময় থেকে মানুষ সামাজিক হ'য়ে উঠলো এবং তার ফলে সমাজ-বিজ্ঞানের সুরু হ'লো। ক্রমশঃ একদলের সঙ্গে আর একদলের আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময় সুরু হ'লো। তার ফলে হ'লো ভাষাবিজ্ঞানের উৎপত্তি। এমনিভাবে ডিউই'র বিভাগের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার মধ্যে ফাঁকি যথেষ্ট আছে।

ডিউই'র প্রথম নয়টি বিভাগের মধ্যে একটা ক্রমিক নিয়ম না থাকলেও পরের বিভাগগুলির মধ্যে একটা ক্রমিক নিয়ম আছে। বিভাগ যেরূপই হ'ক না কেন, বিভাগের মধ্যে এরূপ ক্রমিক নিয়ম থাকা চাই। তাতে সুবিধা হয় এই যে, প্রত্যেক ধাপের সঙ্গে তার আগের বা পরের ধাপের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। তার ফলে মঞ্চে বই খুঁজে বার করার সুবিধা হয়। কেবল তাই নয়, কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করতে গেলে, সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোন্ কোন্ বিষয় অনুসন্ধান করতে হ'বে, তাও বুঝতে পারা যায়।

তা হ'লে জাতিবিভাগের **প্রথম নিয়ম** হচ্ছে, **বিভাগের এক ধাপের সঙ্গে অপর ধাপের ক্রমবিকাশের একটি সম্বন্ধ থাকবে।** অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্র থেকে আর একটি ক্ষেত্রের সৃষ্টি হ'বে। পরের ক্ষেত্রটি আগের ক্ষেত্রের একটি অংশ হ'লেও, প্রথম ধাপ অপেক্ষা পরের ধাপের প্রসার হ'বে কম এবং তার গুণ হ'বে বেশী।

নীচের ছকটী লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, প্রতি ধাপে জ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রতি ধাপে জ্ঞানের গুণের ক্ষেত্র বেড়ে যাচ্ছে :



বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হ'লে, আপনাকে গণিতের ধাপ থেকে আরম্ভ করতে হ'বে। যতই আপনি ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নেমে আসতে থাকবেন, ততই আপনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞান বাড়তে থাকবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রের পরিধিও সঙ্কীর্ণতর হ'তে থাকবে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিস্তারও কমতে থাকবে।

এইবার আমরা বলতে পারি জ্ঞানের বিভাগের **দ্বিতীয় নিয়ম** হচ্ছে ঃ

বিভাগের প্রতিধাপে জ্ঞানের ক্ষেত্র কমে যাবে, কিন্তু গুণ বাড়তে থাকবে। যেমন ঃ

জ্ঞান + বিজ্ঞান = বিজ্ঞান
+ গণিত = গণিতবিজ্ঞান
+ সৌরজগৎ = সৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি

আমরা পূর্বেই বলেছি, এমন একটি চরিত্রের উপর নির্ভর করে বস্তুকে বিভাগ করতে হ'বে, যা'তে প্রত্যেক বস্তু অন্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ'য়ে থাকবে। তা না হ'লে একটি বস্তুকে আর একটি বস্তু বলে ভ্রম হ'তে পারে এবং এ-কথাও আমরা আগেই বলেছি যে, সেই চরিত্র বস্তুর অন্তর্নিহিত চরিত্র হওয়া চাই, অর্থাৎ সেই চরিত্র কেবলমাত্র একজাতীয় হ'বে, অর্থাৎ তা একটি বস্তুরই থাকবে, অন্য বস্তুর থাকবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রের বিভাগ আমরা করেছি আগাগোড়া জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে, অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানই আমাদের চরিত্র। উপরের উদাহরণটি সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, প্রতি ধাপেই আমরা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানেরই একটি বিশেষ চরিত্র যোগ করে যাচ্ছি। যেমন বিজ্ঞান হ'লো জ্ঞানের একটী বিশেষ চরিত্র এবং বিজ্ঞানের একটী বিশেষ চরিত্র হ'লো গণিত। আবার সৌরজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান—এই বিশেষ চরিত্রটি গণিতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে উৎপত্তি লাভ করলো সৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি।

তা হ'লে এখন আমরা বলতে পারি যে, জাতিবিভাগের **তৃতীয় নিয়ম** হচ্ছে ঃ

আগাগোড়া একটি মাত্র চরিত্রের উপর নির্ভর করে বিভাগ করতে হ'বে এবং সেই চরিত্রটি বস্তুর অন্তর্নিহিত চরিত্র হওয়া চাই।

বিভাগের প্রত্যেকটি ধাপের একটি বিশেষ চরিত্র থাকার জন্য তা জ্ঞানের কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রকে বোঝাবে। সেই জন্যে একটি বিভাগ থেকে আর একটি বিভাগের উৎপত্তি হ'লেও, একটী বিভাগ আর একটী বিভাগের ক্ষেত্রে পা বাড়াবে না। অর্থাৎ গণিতবিজ্ঞান বলতে তা কেবল গণিতের ক্ষেত্রকেই বোঝাবে, পদার্থবিজ্ঞান বলতে তা কেবল পদার্থবিজ্ঞানই বোঝাবে। সুতরাং জাতিবিভাগের **চতুর্থ নিয়ম** হচ্ছে ঃ **প্রত্যেকটি বিভাগ স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া চাই।**

এই তো গেল জ্ঞানের বিভাগের নিয়ম। এবার দেখতে হ'বে, বিভাগের এই নিয়মগুলি পুস্তক-বিভাগের ক্ষেত্র প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা। কিন্তু এখানে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। আমরা বার বার বলেছি; মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং আজ যে-বিভাগের ছক তৈরী করা হবে, কাল তার পরিবর্তন করতে হ'বে। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কত নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে ও হ'বে। সেই নতুন বিষয়গুলিকে আমাদের বিভাগের মধ্যে স্থান দিতে হ'বে। স্থান দিতে না পারলে আমাদের জাতি-বিভাগ কার্যকর হ'বে না।

পুস্তকের জাতিবিভাগে জ্ঞানের জাতিবিভাগের প্রয়োগ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, পুস্তকের আকারগত বিশেষত্বের জন্য পুস্তকের জাতি-বিভাগ সম্ভব নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রের জাতি-বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে

জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে এমন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাজানো, যাতে প্রত্যেকটি ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন করে দেখবার, চিন্তা করবার এবং বিচার করবার, আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত জ্ঞানকে বিভাগ করবার সুবিধা হয়। এইরূপ বিভাগের ফলে জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্র সম্বন্ধে কি কি বই প্রকাশিত হয়েছে, তা একসঙ্গে বিচার করে দেখবার সুবিধা হয়। কেবল তাই নয়, বইগুলির একটি বিভাগের সঙ্গে আর একটি বিভাগের সম্বন্ধ এবং উভয় বিভাগের সীমারেখাও সুনির্দিষ্ট হ'য়ে ওঠে। তার ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরস্পরের ভিতরকার সম্বন্ধের একটি ছবিও পাঠকের চোখের সামনে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

বই কি, সে-কথা আমরা প্রথমেই বলেছি। আমরা দেখেছি যে, একখানি বইয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হ'তে গেলে পাঠকের প্রয়োজন। বইকে আমরা বস্তু বলে ধরে নিতে পারি। বস্তু কোন কাজেই লাগে না, যদি কেউ তা ব্যবহার না করে। অর্থাৎ বস্তু-জীবনের সার্থকতা ব্যবহারকারীর উপর নির্ভর করে। আর, গ্রন্থাগারের কাজই হচ্ছে পুস্তকের সঙ্গে ব্যবহারকারীর অর্থাৎ পাঠকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করে তোলা। পাঠকের বইয়ের প্রয়োজন হয় তার নিজের প্রয়োজনে এবং তার এই প্রয়োজনের মূলে রয়েছে নিজেকে গড়ে তোলার আগ্রহ। নিজেকে গড়ে তুলতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং আমরা দেখেছি যে, লেখক তাঁর অর্জিত জ্ঞান পুস্তকের ভিতর সন্নিবেশিত করেন।

পাঠক বই পড়তে আসে এই জ্ঞানেরই খোঁজে। তাহ'লে **আমরা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের দিক থেকে বলতে পারি যে, বই হচ্ছে লিখিত ও প্রকাশিত জ্ঞান।** বেশির ভাগ প্রকাশিত বইকেই এক-একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ফেলতে পারা যায়, কিন্তু সব বইকেই একটা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফেলা যায় না। তার কারণ, লেখক তাঁর চেতনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবশে বই লিখেছেন। একটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলতে পারেন। যেমন ধরুন, যক্ষ্মা সম্বন্ধে বলতে

গিয়ে তিনি যক্ষ্মার বীজাণু সম্বন্ধে বলতে পারেন, যক্ষ্মার চিকিৎসা সম্বন্ধে বলতে পারেন, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় সম্বন্ধে বলতে পারেন, যক্ষ্মা হওয়ার মূলে বর্তমান বংশগত কারণের কথাও বলতে পারেন, আবার মানুষের শরীরের এক-একটি অঙ্গের উপর যক্ষ্মার আক্রমণের বিষয়ও বলতে পারেন। কেবল তাই নয়, যক্ষ্মা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যক্ষ্মার ধাতুগত আকৃতি সম্বন্ধেও বলতে পারেন। এই সকল ক্ষেত্রেই যক্ষ্মা একটি রোগ বটে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই যক্ষ্মা এক একটি পৃথক চরিত্রযুক্ত রোগ ও সেই রোগসংক্রান্ত বিষয়। সেই কারণে যক্ষ্মার সব ক্ষেত্রেরই বইগুলি যদি এক স্থানে ফেলা হয়, তা হ'লে ভুল হ'বে। অথচ পাঠককে জানা'তে হ'বে, কোন্ কোন্ বইয়ের ভিতর যক্ষ্মার কোন্ কোন্ ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান কি করে করা যায়, তা আমরা পরে বলবো। এখন দেখা যাক, কি করে জ্ঞানের বিভাগকে আমাদের কাজে লাগানো যায়।

বই জ্ঞানের প্রকাশিত সুসংবদ্ধ আধার হ'লেও, বইয়ের নিজস্ব কতকগুলি চরিত্র আছে। সেই চরিত্রগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না এবং সেই কারণেই **জ্ঞানের বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পুস্তক-বিভাগের কাজে লাগানো সম্ভব নয়।** যেমন ধরুন, ইতিহাস হচ্ছে জ্ঞানের একটী ক্ষেত্র। কিন্তু প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রেরই আবার ইতিহাস আছে।

সুতরাং বিজ্ঞানের ইতিহাসকে সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফেললে বইখানি সাধারণ বিজ্ঞানের বইয়ের সঙ্গে মিশে যাবে এবং পাঠক বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়তে এসে বইখানিকে খুঁজে পাবে না। বইখানি যে বিজ্ঞানের বইয়ের সঙ্গে রাখলে ঠিক জায়গায় রাখা হ'বে না, তা আমাদের বিভাগের নিয়মানুসারে চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবেন :

জ্ঞান + বিজ্ঞান = বিজ্ঞান
+ ইতিহাস = বিজ্ঞানের ইতিহাস

দ্বিতীয় ধাপে দেখুন, এমন একটি চরিত্র যোগ করা হয়েছে, যা আমাদের বিভাগের চরিত্র নয়। সুতরাং এ-বিভাগে আমাদের বিভাগের নিয়ম মানা হয়নি। অথচ এরকম বিভাগ আমাদের প্রয়োজন। পুস্তকের এইরূপ চরিত্রের নাম হচ্ছে **দৃষ্টিকোণ**। নানাপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক কোন বিষয় সম্বন্ধে বই লিখতে পারেন, পাঠকও নানাপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বই অনুসন্ধান করতে পারে। এইরূপ দৃষ্টিকোণের মধ্যে আর একটি প্রধান দৃষ্টিকোণ হচ্ছে 'দর্শন'। দর্শন একটি বিষয়, আবার প্রত্যেক বিষয়েরও দর্শন থাকতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, কোন বিষয়ের সঙ্গে দৃষ্টিকোণ-রূপ চরিত্র যোগ করলে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র কমবে না, অথচ বিজ্ঞানের চরিত্র বাড়বে। সুতরাং আমাদের নিয়মের আর একটি ব্যতিক্রম হ'বে।

কিন্তু পুস্তকের জাতি-বিভাগের খাতিরে আমাদের বিভাগের নিয়মের এরূপ ব্যতিক্রম করতে হ'বে। এরূপ ব্যতিক্রম না করলে আমাদের পুস্তক-বিভাগ কার্যকর হয় না।

পুস্তকের এরূপ বহু চরিত্র আছে, যার জন্যে প্রতিপদে নিয়মের বাইরে যেতে হ'বে। যেমন ধরুন, ভূ-বিজ্ঞান জ্ঞানের একটি ক্ষেত্র এবং বিজ্ঞানের বিভাগের একটি ধাপ। কিন্তু ধরুন, ভারতের ভূ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা একখানি বই। এরূপ একখানি বইকে কেবল ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফেললে বইখানিকে ঠিক দলগতভাবে রাখা হ'বে না। কারণ, বইখানিতে ভূ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে বটে, কিন্তু তার দৃষ্টিকোণ হচ্ছে ভারত। এই 'ভারতীয়' চরিত্রটিকে আমাদের বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি পৃথক স্থান দিতে হ'বে। ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিজ্ঞানের মধ্যেই পড়বে বটে, কিন্তু ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানের বই ভূ-বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন করে রাখতে হ'বে।

আবার ধরুন 'মজুর' সম্বন্ধে একখানি বই। বইখানিকে অর্থ-বিজ্ঞানের

কোন একটি ক্ষেত্রে বা উপবিভাগে ফেলা যাবে। কিন্তু 'খনিতে' কাজ করে, এমন মজুরদের সম্বন্ধে লেখা বই 'মজুরে'র বিভাগে ফেলতে পারা যাবে না। এরূপ বইয়ের জন্যেও বিশেষ বিভাগ করতে হ'বে।

এখন আমরা বুঝতে পারছি, জ্ঞানের ক্ষেত্র-বিভাগ করবার সময় একটিমাত্র চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বিভাগ করা হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্র-বিভাগের ব্যাপারে পুস্তকের জাতি-বিভাগের প্রয়োগে বইয়ের অন্যান্য চরিত্রকেও স্থান দিতে হ'বে। কেবল তাই নয়, বইয়ের আকারগত বিশেষত্বও অনেক সময় গোল বাধায়। যেমন ধরুন, অতি বৃহৎ আকারের বই। এ বইগুলিকে সাধারণ আকারের বইয়ের সঙ্গে রাখলে, পুস্তক-মঞ্চের স্থান অনেক নষ্ট হ'বে। স্থানের অভাবই আজকালকার গ্রন্থাগারে প্রধান সমস্যা। সে কারণে একদলের বই হ'লেও সেগুলিকে আলাদা করে রাখতে হ'বে। আবার অতি ক্ষুদ্র আকারের বই বা পুস্তিকাগুলিকে সাধারণ বইয়ের সঙ্গে রাখলে বৃহৎ আকারের বইয়ের চাপে সেগুলির নষ্ট হ'য়ে যাবার ভয় থাকে বা পুস্তকের সারির পিছনে পড়ে থাকারও সম্ভাবনা থাকে এবং তার ফলে বইখানিকে খুঁজে বার করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। এই কারণে ক্ষুদ্র বই বা পুস্তিকার জন্যেও মঞ্চে পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। এরূপভাবে বই-সাজানোকে বলে **'সমান্তরাল নিয়ম।'** অবশ্য, পুস্তক-বিভাগের ছকে এ-সব বইয়ের জন্য আমাদের কোন বিশেষ স্থান সৃষ্টি করতে হয় না। কিন্তু বইগুলি যে অন্য স্থানে রাখা হয়েছে, তা পাঠককে জানাবার জন্যে ব্যবস্থা করতে হ'বে। কি করে সে ব্যবস্থা করতে হ'বে, তা আমরা পরে বলবো।

জ্ঞানের ক্ষেত্র-বিভাগের ছক যে ক্রমবর্ধনশীল হওয়া চাই, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। জ্ঞানের বিভাগের উপর নির্ভর করে পুস্তক-বিভাগের জন্যে যে ছক তৈরী করা হ'বে, সে ছকও এরূপ ক্রমবর্ধনশীল বা পরিবর্তনসাধ্য হওয়া চাই, যাতে প্রয়োজন অনুসারে তার পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করা যায়। তা সম্ভব না হ'লে, সে ছককে ভিত্তিসমেত ভেঙ্গে ফেলতে হ'বে। এখনকার সমাজের

কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পর মানবসমাজ সভ্যতার পথে এত বেশী অগ্রসর হয়েছে এবং তার ফলে মানুষ আজ এত বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, তার চিন্তাধারায় একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। আগেকার বিশ্বাস, আগেকার ধারণা, আগেকার আচার-ব্যবহারের সংগে মানুষ আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মানুষের এক-একটি দল যতদিন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ছিল, ততদিন তারা নিজেদের সমাজের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পেরেছিল। আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না। সকল প্রকারের চিন্তাধারাকে তারা আর সমাজের মধ্যে স্থান দিতে পারছে না। কম্যুনিজ্‌ম্, ফ্যাসিজ্‌ম্, সোস্যালিজ্‌ম্, ডেমোক্রেসি—একে অন্যের ক্ষেত্রে পা বাড়াবার চেষ্টা করছে। তার ফলে কেউ কাউকে মেনে নিতে পারছে না এবং সারা বিশ্ব আজ চেষ্টা করছে এমন একটি চরিত্রের ছাঁচে বিশ্বসমাজকে গড়ে তুলতে, যা পৃথিবীর সকল মানুষ মেনে নিতে পারবে। যত শীঘ্র এরূপ একটি চরিত্র খুঁজে বার করা সম্ভব হ'বে, ততই মঙ্গল। তা না হ'লে সমাজের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

পুস্তকের জাতিবিভাগের অবস্থাও ঠিক তেমনি। নানাপ্রকারের জাতিবিভাগের ছক তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু মানুষের অগ্রগতির ফলে এত বেশী নতুন ধরণের বই ছাপা হচ্ছে যে, ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে সে-সব বইকে আর স্থান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কোন রকমে স্থান দেওয়া সম্ভব হ'লেও নতুন বিষয়গুলির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের আর সম্বন্ধ থাকছে না। তার ফলে বিষয়গুলি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে, দলগতভাবে আর থাকতে পারছে না। নতুন বিষয়গুলি যেন এক একজন **'উদ্বাস্তু'**,—পথে ঘাটে পড়ে জীবন কাটাচ্ছে।

বইয়ের নিজস্ব চরিত্রের জন্য আমাদের ছকের মধ্যে যে-সব বিশেষ ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে, সেগুলি হ'লো ঃ

১। **সাধারণ বিভাগ ঃ** এই বিভাগে পড়বে—বিশ্বকোষ, অভিধান, সংবাদপত্র, সাধারণ পত্রিকা, পুস্তক-বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ইত্যাদি।

২। **দৃষ্টিকোণঃ** দর্শন, কোন বিষয়ের প্রাথমিক পুস্তক, কোন বিষয়ের অভিধান, প্রবন্ধ, কোন সঙ্ঘের প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকা, বক্তৃতা, সংকলন, ইতিহাস ইত্যাদি।

৩। **সাহিত্যের রূপ-অনুযায়ী বিভাগঃ** কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

৪। **ইতিহাসের যুগ-অনুযায়ী বিভাগঃ** হিন্দু-আমল, মুসলমান-আমল, কোম্পানির আমল, ইংরেজ-আমল, কংগ্রেসী আমল ইত্যাদি।

এ-ক'টি বিভাগই প্রধান। এ ছাড়া আরো বিশেষ বিশেষ বিভাগের প্রয়োজন হয়! সে সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই বলবো।

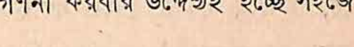
জ্ঞানের ক্ষেত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করে একটি ছক সৃষ্টি করা হ'লো। কিন্তু একখানি বইকে যে বিশেষ কোন একটি দলে ফেলা হ'লো, বইখানি দেখে কি করে তা বোঝা যাবে এবং বইখানি দেখে কি করেই বা বোঝা যা'বে যে, বইখানি কোন্ বিষয় সম্বন্ধে লেখা? কেবল তা-ই নয়, বইখানিকে দল থেকে বার করে এনে, আবার কি করে সেই দলের মধ্যে তার নিজস্ব জায়গায় রাখা যাবে? ভেবে-চিন্তে দেখে, বইখানিকে পুনরায় তার ঠিক জায়গায় রাখা সম্ভবপর হ'বে না। তার কারণ, সারাদিনে কত বই যে তাদের স্ব স্ব দল থেকে বার করতে হ'বে, তার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং **বইয়ের উপরে এমন একটি চিহ্ন দিতে হ'বে, যা কেবল বইয়ের বিষয়ই নির্দেশ করবে না, অধিকন্তু বইখানির নিজস্ব স্থানও নির্দেশ করবে।**

চিহ্ন (Notation)

চিহ্ন বলতে কোন বিষয় সম্বন্ধে সঙ্কেত বোঝায়। মানবসভ্যতার কোন্ যুগে যে সঙ্কেতের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে পৃথিবীর অতি আদিম অধিবাসীরাও যে কোন কোন বিষয় বোঝাবার জন্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতো, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর কোন আদিম যুগে হয়তো

কোন এক অরণ্যচারী, পর্বতগুহাবাসী, লোমশ মানুষ একটা হরিণ শিকার করে, সে যে একটা হরিণ মেরেছে, তার প্রমাণ রাখবার জন্যে তার পাথরের কুড়ুল দিয়ে কোন একটা গাছে আঘাত করেছিল। তার ফলে গাছের গায়ে কুড়ুলের একটি দাগ চিহ্নিত হ'য়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন যখনই সে কোন একটি জন্তু শিকার করেছে, তখনই গাছের গায়ে পূর্বের আঘাতের পাশে সে আর একটি করে আঘাত-চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এমনি করে সেই আঘাত-চিহ্নগুলি দেখে কিছুদিন বাদে সে বুঝতে পেরেছিল, কতগুলি পশু সে শিকার করেছে। গাছের গায়ে তার আঘাত করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল—সে যত পশু শিকার করেছে, তার সংখ্যা মনে রাখা।

আজও দেখুন, মনে রাখবার জন্যে ঐ আঘাত-চিহ্নের মত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন ভোট-গণনার সময় এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।



এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করে কোন কিছু গণনা করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সহজে মনে রাখা এবং গণনায় ভুল না হওয়া।

আবার দেখুন, UNESCO—এই সাঙ্কেতিক কথাটি তো সকলেই জানেন। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, এর সম্পূর্ণ কথাটি কি। কিন্তু একবার যদি জানেন, এই ক'টি অক্ষর কিসের সঙ্কেত, তা হ'লে এই ক'টি অক্ষর দ্বারা যে-কথাটি বোঝানো হয়, তা আর ভুল হ'বে না। আজকাল এরূপ কত চিহ্ন যে ব্যবহার করা হয়, তার সংখ্যা নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। যেমন ধরুন, রসায়ন-বিজ্ঞানের যা-কিছু সবই চিহ্নের দ্বারা লেখা হয়, যেমন—H_2O, O_3 ইত্যাদি। মানুষের মনের আদান-প্রদানও চিহ্নের সাহায্যেই হচ্ছে। কারণ, ভাষা তো কতকগুলি চিহ্নের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। ৮ একটি চিহ্ন। আট অনেক কিছুই বোঝাতে পারে, যেমন ধরুন—পরিমাণ, ওজন, সংখ্যা ইত্যাদি। কোন দোকানে যখন কোন জিনিস কিনতে যান, বিশেষ করে কাপড়-জামার দোকানে, তখন 'দাগ' বলে একটা কথা আপনার কানে

আসে। কিন্তু এই দাগ বলতে সত্যি কি যে বোঝায়, তা আপনি জানেন না এবং 'দাগ'টি দেখালেও তার মানে আপনি বুঝতে পারবেন না, আর দোকানদারও তা আপনাকে জানতে দিতে চায় না। কারণ, এই দাগের সাহায্যে সে নিজেই কেবল জানতে পারে, জিনিসটি সে কত দামে কিনেছে. এবং কত দামে সে তা বেচতে পারে।

সুতরাং চিহ্নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১। **সংক্ষেপে একটি বিষয়কে প্রকাশ করা,**

২। **কোন একটি বিষয়কে সহজে মনে রাখা,** এবং

৩। **কোন একটি বিষয় গোপন রাখা ;** যেমন—Code words বা সাঙ্কেতিক শব্দ।

পুস্তকের ক্ষুদ্র বিভাগগুলিকেও এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং সেই চিহ্নগুলি পুস্তকের 'পুটে' বা শিরদাঁড়ায় মেরে দিলেই বইখানির স্থাননির্ণয় করতে আর কোনই অসুবিধা হ'বে না। কেবল তা-ই নয়, বইখানির ভিতর কি বিষয় লেখা আছে, তা-ও সহজে বুঝতে পারা যাবে।

চিহ্ন দু'রকমের হ'তে পারে : **অবিমিশ্র ও মিশ্র।**

অবিমিশ্র চিহ্ন হচ্ছে যে চিহ্নে একই রকমের চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে ; যেমন—১২৩, কখগ বা ILO।

আর মিশ্র চিহ্ন হচ্ছে যাতে একাধিক রকমের চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—H_2O বা $3\angle$s of a $\triangle = 2$Ls।

তবে চিহ্নের মধ্যে জটিলতা যত কম থাকে, ততই ভালো। তার কারণ, অনেকগুলি চরিত্র এক সঙ্গে মনে রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ে। সহজে মনে রাখাই যখন চিহ্ন ব্যবহার করার উদ্দেশ্য, তখন চিহ্ন এমন ধরণের হওয়া চাই, যাতে সকলে তা সহজে বুঝতে পারে।

আমাদের বিভাগের ছকে যে-কোন প্রকারের চিহ্নই ব্যবহার করি না কেন, সে-চিহ্ন কিন্তু ক্রমবর্ধনশীল হওয়া চাই। তা না হ'লে জ্ঞানের ক্ষেত্র-বিভাগের

সংখ্যা যেমন বেড়ে যাবে, সেই সংগে আমাদের চিহ্ন সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে না। তার ফলে আমাদের চিহ্নও অকেজো হ'য়ে পড়বে।

তার উপর মনে রাখতে হ'বে, আমাদের গ্রন্থাগার মৃতদেহের মত নয়, যার কেবল ক্ষয়ই হ'তে থাকবে, বৃদ্ধি কখনও হ'বে না। আধুনিক গ্রন্থাগার ক্রমশঃই বেড়ে চলবে এবং পুস্তক-সংখ্যার সীমা নেই। তার কারণ, মানুষের জ্ঞান-সঞ্চয়েরও কোন সীমা নেই। সেই কারণে চিহ্নের সাহায্যে ক্রমবর্ধনশীলতারও কোন সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। বারবার বই-সাজানোর নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে বই সাজাবার মত সময় গ্রন্থাগারের কর্মীদের নেই। বইয়ের চিহ্ন বারবার নতুন করে দেওয়াও তাদের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সে সময়ও তাদের নাই। কারণ, বেশির ভাগ সময় তাদের নজর দিতে হ'বে পাঠকদের উপর। পাঠক গ্রন্থাগারের প্রাণস্বরূপ,—এ-কথা গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভালো।

চিহ্নের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, বিভাগের ছকে যেমন একটি বিষয় আর একটি বিষয়ের সংগে সম্বন্ধযুক্ত হ'বে, তেমনি একটি সংখ্যা বা চিহ্ন আর একটি সংখ্যা বা চিহ্নের সংগে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই।

চিহ্নের তৃতীয় কথা হচ্ছে এই যে, চিহ্নের দ্বারা বিভাগের প্রতি ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত চরিত্র তো প্রকাশ পাওয়া চাই-ই, উপরন্তু চিহ্ন এমনভাবে ব্যবহার করতে হ'বে, যাতে দৃষ্টিকোণগুলিও চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

এখন বুঝতে পারছেন, একটি বিষয়ের কত বই আছে, তা বোঝানো বইয়ের উপর সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়। কোন্ বিষয়ে কত বই আছে, তা জেনে আমাদের লাভ নেই। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেক বইখানির নিজস্ব স্থাননির্ণয় করা।

বিষয়-চিহ্নের দ্বারা এক বিষয়ের বইগুলিকে চিহ্নিত করে এক স্থানে রাখা হ'লো। কিন্তু তা'তেই কি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে, একখানি বইয়ের স্থান নির্দিষ্ট করা হ'বে? ধরুন, শিক্ষাবিষয়ক একখানি বই। এ-বইখানির চিহ্ন

দেওয়া হ'লো ৩৭০। এখন ঐ একই বিষয়ের আরো ৭০ খানি বই থাকতে পারে। বইগুলি ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হ'তে পারে। একই লেখকের একই বইয়ের দশটী সংস্করণের দশখানি কপিও থাকতে পারে; আবার একই বিষয়ে বিশদভাবে লেখা এবং প্রাথমিক পুস্তক (introduction) থাকতে পারে। এরূপ অবস্থায় চিহ্ন দেখে কি করে এক-একখানি বই চিনতে পারা যাবে? এরূপ অবস্থায় কি পন্থা অবলম্বন করতে হ'বে, তা আমরা পরে বলবো।

পৃথিবীতে নানা দেশের গ্রন্থাগারে নানা প্রকারের পুস্তক-বিভাগের ছক ব্যবহার করা হয়। সব ছকেরই ভালো-মন্দ দু'টি দিকই আছে। কারণ, একেবারে দোষ-ত্রুটিহীন ছক হওয়া যে সম্ভব নয়, তা আমরা বার বার বলেছি।

পুস্তকের জাতি-বিভাগের ইতিহাস

এসিরিয়ায় রক্ষিত 'অসুর-বান-ই-পালে'র গ্রন্থাগারে মাটির যে সমস্ত ফলক (tablets) ছিল, সেগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হ'তো। একটি ভাগ হচ্ছে পৃথিবী-সংক্রান্ত জ্ঞান-সম্বন্ধীয় এবং আর একটি ভাগ হচ্ছে স্বর্গের (Heaven) জ্ঞান-সম্বন্ধীয়। পুরাকালে এরূপভাবে সব-কিছুকেই বিভাগ করবার একটি রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন ধরুন, মানুষকে বিভাগ করা হ'তো, স্বর্গ, মর্ত্য ও জল এই তিনটি ভাগে।

ষ্ট্রাবো (Strabo)'র বই থেকে জানা যায়, এরিস্টট্‌ল্ তাঁর নিজের সংগৃহীত পুস্তকের একটি জাতিবিভাগ করেছিলেন এবং গ্রন্থাগার কি করে সাজাতে হয়, তা তিনি রাজা-রাজড়াদের শিক্ষা দিতেন।

কালিমেকাস খৃঃ পূঃ ২৬০-২৪০ অব্দের মধ্যে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার এরিস্টট্‌লের বিভাগ অনুসারে সাজান। এর পরে বহুকাল ধরে গ্রন্থাগার সাজাবার আর কোন পদ্ধতি পাওয়া যায় নাই।

ফ্রান্সই হ'লো এ-বিষয়ে প্রথম অগ্রণী। ১৬৪৩ খৃস্টাব্দে গাব্রিয়েল নোদে (Gabriel Naudet) লেখেন 'Advis pour dresser une bibliotheque'

('আভি পুর ব্রেসে য়ুন বিবলিওথেক্')। তিনি সব বইকে বারটি ভাগে ভাগ করতে বলেন।

নোদের পর পুস্তক-বিক্রেতাদের বিখ্যাত বিভাগপদ্ধতি বার হয়। এ বিভাগ যে কে করেছিল, তা বলা যায় না। অনেকে বলেন জঁা গার্নিয়ে, কেউ বলেন গাব্রিয়েল্ মার্তঁ্যা। শেষোক্ত ব্যক্তি 'দে থু' নামক পুস্তক-বিক্রেতাদের পুস্তক-সম্ভারের এক বিভাগ করেন।

এর পরে জাক শর্ল ব্রুনে একটি পুস্তক-তালিকা সংকলন করেন। এই পুস্তক-তালিকা প্রথম বার হয় ১৮০৯ সালে। এই তালিকায় সমস্ত বই পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়: ধর্ম, আইন, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য।

এরপর আসে আধুনিক গ্রন্থাগারযুগের পুস্তকের জাতিবিভাগ:

রিচার্ডসনের বিভাগ—১৮৯১

জেমস্ ডাফ্ ব্রাউনের বিভাগ—১৮৯৮

ব্লিসের বিভাগ—১৯২৯

এ-সব বিভাগ ব্যতীত আরো কতকগুলি বিভাগ আছে।

ডিউই'র দশমিক বিভাগ

আধুনিক যুগের পুস্তকের জাতি-বিভাগের জন্যে যে-সকল ছক তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে জন মেলভিল্ ডিউই'র দশমিক জাতি-বিভাগই হ'লো সর্বপ্রধান এবং এই ছকটিই আজ সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হয়তো এই বিভাগের অবিমিশ্র চিহ্ন এবং এর সম্প্রসারণশীলতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ডিউই'র এই বিভাগ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। এ-বিভাগের জন্য তিনি হ্যারিসের কাছে কতকটা ঋণী এবং হ্যারিস আবার বেকনের কাছে ঋণী। ডিউই'র বিভাগের দোষ অনেক আছে। এই বিভাগের এমন অনেক দোষ দেখানো যায়, যার যুক্তিযুক্ত উত্তর কিছু দেওয়া যায় না।

তবু এ-কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ডিউই'র ছক পুস্তক-বিভাগের কাজে লাগছে এবং সেই কারণেই এ-বিভাগের এত বেশী প্রচার।

জন মেলভিল্ ডিউই'র জন্ম হয় নিউইয়র্কের অ্যাডাম্'স্ সেণ্টারে (Adam's Centre, NY.) ১৮৫১ সালে। তিনি আমহার্স্ট কলেজে লেখাপড়া শেষ করেন ১৮৭৪ সালে এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হ'ন। এই সময় তিনি অ্যামেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে তিনি নিউইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরি'র গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই তিনি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের স্কুল খোলেন। ডিউই'র নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দশমিক বিভাগের প্রচার হ'বার পর।

ডিউই হ্যারিসের বিভাগ গ্রহণ করেন এবং সেগুলির ০—৯ পর্যন্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন:

০	সাধারণ জ্ঞান	৫	বিজ্ঞান
১	দর্শন	৬	ব্যবহারিক বিজ্ঞান
২	ধর্ম	৭	ললিতকলা
৩	সমাজতত্ত্ব	৮	সাহিত্য
৪	ভাষাবিজ্ঞান	৯	ইতিহাস

ডিউই'র সাঙ্কেতিক চিহ্নের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি। সেই কারণে আমরা বলতে পারি:

০০০	সাধারণ জ্ঞান	৫০০	বিজ্ঞান
১০০	দর্শন	৬০০	ব্যবহারিক বিজ্ঞান
২০০	ধর্ম	৭০০	ললিতকলা
৩০০	সমাজতত্ত্ব	৮০০	সাহিত্য
৪০০	ভাষাবিজ্ঞান	৯০০	ইতিহাস

অবশ্য দর্শন বলতে আপনি ১ই বলুন, আর ১০০ই (এক শূন্য শূন্যই) বলুন, তাতে কিছু এসে যায় না। তার কারণ, দশমিক সংখ্যায় ডান

দিকের শূন্যের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ-কথাও ভুললে চলবে না যে, ডিউই'র সংখ্যা ঠিক গণিতের দশমিক সংখ্যা নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রকে ১০টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে বলে এই বিভাগের নাম দশমিক বিভাগ। কোন সংখ্যার গোড়ায় এক থাকলে বুঝতে হ'বে সংখ্যাটির মূলক্ষেত্র দর্শন। যেমন ধরুন ১৫০। একশত পঞ্চাশ বলতে বুঝতে হবে :

১০০ দর্শন

৫০ মনোবিজ্ঞান

অর্থাৎ দর্শনের সঙ্গে তার বিশেষ চরিত্র মনোবিজ্ঞান জুড়ে দেওয়ায় দর্শনের একটি নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হ'লো এবং সেই ক্ষেত্রটি হ'লো দর্শনের পঞ্চম ভাগ। দর্শনের অন্যান্য ভাগ হ'লো :

০০০ দর্শন	১৫০ মন
১১০ অধ্যাত্মবিদ্যা	১৬০ তর্কশাস্ত্র
১২০ " (বিশেষ ক্ষেত্র)	১৭০ নীতিশাস্ত্র
১৩০ মন ও শরীর (মনস্তত্ব)	১৮০ পুরাকালের দার্শনিকগণ
১৪০ দর্শনের বিভিন্ন প্রণালী	১৯০ আধুনিক কালের দার্শনিকগণ

এই হ'লো দর্শনের নয়টী ভাগ। মূলক্ষেত্র দর্শনকে ধরলে হয় দশটী ক্ষেত্র। এই দশটী ক্ষেত্রের মধ্যে যে-কোন একটী ক্ষেত্রকে আবার দশটী ভাগে ভেঙ্গে ফেলা যায়। তার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে যত সূক্ষ্মভাবে সম্ভব, ভাগ করার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ আর একটী বিভাগের কথা ধরুন :

৪০০ ভাষাবিজ্ঞান	৪৫০ ইতালীয় ভাষা
৪১০ তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৪৬০ স্পেনীয় "
৪২০ ইংরেজী ভাষা	৪৭০ ল্যাটিন "
৪৩০ জার্মাণ "	৪৮০ গ্রীক "
৪৪০ ফরাসী "	৪৯০ অন্যান্য "

ভাষাবিজ্ঞানের এই হ'লো দশটী ভাগ। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, এই বিভাগের মধ্যে কেবল পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলিকে অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে এমন একটী ক্ষেত্র (৪৯০ অন্যান্য) বাকী আছে, যাকে বিভাগ করে পৃথিবীর আর সকল ভাষাকেই তার মধ্যে ফেলা যায়। এ-বিভাগের মধ্যেও একটা নিয়ম মেনে চলা হয়। তার কারণ, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলির সব ক'টিরই ল্যাটিন ভাষা থেকে উৎপত্তি, কেবল স্লাভিক (Slavic) জাতীয় ভাষা বাদে। এখন ৪৯০কে ভাগ করে ৪৯১ দিয়ে আমরা ল্যাটিন ভাষার নিকট-আত্মীয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রটিকে প্রকাশ করতে পারি। বাংলা ভাষা ঐ ক্ষেত্রেরই একটি অংশ। সুতরাং বাংলা ভাষায় আসতে হ'লে আমাদের বিভাগ হ'বে:

৪০০	ভাষাবিজ্ঞান
৪৯০	(৯ম ভাগ) অন্যান্য
৪৯১	(১ম ভাগ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা
৪৯১'৪	ভারতীয় ভাষা
৪৯১'৪৩	হিন্দী ,,
৪৯১'৪৪	বাংলা ,,

সম্পূর্ণ বিভাগটি আমরা দিলাম না। ৪৯০-এর প্রথম ভাগের চতুর্থ ভাগ হ'লো ভারতীয় ভাষা, চতুর্থ ভাগের তৃতীয় ভাগ হ'লো হিন্দী, এবং চতুর্থ ভাগ হ'লো বাংলা।

৪৯১-এর পর একটি বিন্দু দিয়ে তবে পুনরায় বিভাগ করা হয়েছে। **যখনই জ্ঞানের ক্ষেত্রের তৃতীয় ভাগের আরো বিভাগ করা হয়, তখনই একটি বিন্দু ব্যবহার করে তবে বিভাগ করতে হয়।**

ডিউই'র এই ভাষা-বিভাগটি অতি প্রয়োজনীয়। কেন প্রয়োজনীয়, তা আমরা বলছি। ভাষা-বিজ্ঞানের সংখ্যার প্রথম সংখ্যা ৪ নির্দেশ করছে ভাষা।

৪-এর স্থানে যদি ৮ ব্যবহার করেন, তা হ'লেই আপনি সাহিত্যের ক্ষেত্রটি পেয়ে যাবেন। ডিউই'র ১৪শ সংস্করণের ৮০০-এর প্রথম বিভাগ হচ্ছে আমেরিকার সাহিত্য। কিন্তু আমেরিকার ভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় কোন প্রভেদ নাই বলে ১৬শ সংস্করণে তার পরিবর্তন করা হ'য়েছে। আমরা ১৪শ সংস্করণের ভাগ এখানে দিলাম :

সাহিত্য

৮০০	সাহিত্য	৮৫০	ইতালীয় সাহিত্য
৮১০	আমেরিকার সাহিত্য	৮৬০	স্পেনীয় "
৮২০	ইংরেজী "	৮৭০	ল্যাটিন "
৮৩০	জার্মান "	৮৮০	গ্রীক "
৮৪০	ফরাসী "	৮৯০	অন্যান্য "

এখানে দেখুন, ভাষার দশটি বিভাগের কেবল সাহিত্যের সংখ্যাটি (৮) ব্যবহার করা হ'য়েছে। তার ফলে আমরা ভাষা-অনুযায়ী সাহিত্য পেয়ে গেলাম।

এখন যদি এই সাহিত্যের নবম ক্ষেত্রকে পুনরায় বিভাগ করেন, তা হ'লে আপনি অন্যান্য ভাষার সাহিত্য পেয়ে যাবেন। সুতরাং ডিউই'র ১৪শ সংস্করণে সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিভাগ যদিও দেওয়া নেই, তা হ'লেও সাহিত্যের কোন একটি ক্ষেত্রের বিভাগ পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। যেমন ধরুন, যদি আমাদের বাংলা সাহিত্যের জন্য সংখ্যার প্রয়োজন হয়, তা হ'লে আমাদের ভাষার বিভাগ থেকেই সে-সংখ্যা বার করতে হ'বে। বাংলা ভাষা হ'লো ৪৯১·৪৪। এখন প্রথম সংখ্যা ৪ (ভাষা)-এর স্থলে ৮ (সাহিত্য) বসিয়ে দিলে হয় ৮৯১·৪৪। এই সংখ্যাটি বোঝাবে বাংলা সাহিত্য।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, বিষয়ের বিশেষ চরিত্র আছে। সেই রকম সাহিত্যেরও বিশেষ রূপ আছে, যেমন—কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ,

বক্তৃতা, পত্র, কৌতুক। এই রূপগুলির দ্বারা ভাষাকে প্রথমে বিভক্ত করতে হ'বে। বাংলা সাহিত্যের রূপ-অনুযায়ী ভাগ করলে দাঁড়ায় এই :

৮৯১'৪৪ বাংলা সাহিত্য
৮৯১'৪৪১ + কবিতা
৮৯১'৪৪২ + নাটক
৮৯১'৪৪৩ + গল্প ও উপন্যাস
৮৯১'৪৪৪ + প্রবন্ধ
৮৯১'৪৪৫ + বক্তৃতা
৮৯১'৪৪৬ + পত্র
৮৯১'৪৪৭ + কৌতুক
৮৯১'৪৪৮ + প্রবাদ, ছড়া, উদ্ধৃতি
৮৯১'৪৪৯ + অন্যান্য

এই ক্ষেত্রগুলির যে-কোন একটিকে বিভাগ করা চলে—প্রথমে সাহিত্যের যুগ অনুসারে, তার পর লেখক অনুসারে। বাংলা কবিতার বিভাগ কিরূপে করা যেতে পারে, দেখুন :

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা
৮৯১'৪৪১১ আদিযুগ
২ মধ্যযুগ
৩ আধুনিক-পূর্ব যুগ
৪ আধুনিক (প্রথম যুগ)
৫ " (দ্বিতীয় যুগ)
৬ " (তৃতীয় যুগ)
৭ }
৮ } ভবিষ্যৎ যুগের স্থান
৯ }

এখন যদি আদিযুগকে বিভাগ করেন, তা হ'লে দাঁড়ায় :

৮৯১·৪৪১১১
২
৩
৪
৫ রামায়ণ
৬ মহাভারত
৭ ভাগবত
৮
৯ অন্যান্য

মধ্যযুগকে বিভাগ করলে দাঁড়ায় :

৮৯১·৪৪১২১ শিবমঙ্গল
২ মনসামঙ্গল
৩ চণ্ডীমঙ্গল
৪ অন্নদামঙ্গল
৫ ধর্মমঙ্গল
৬ কালিকামঙ্গল
৭ বৈষ্ণব পদাবলী
৮
৯ অন্যান্য

আধুনিক প্রথম যুগকে ভাগ করলে দাঁড়ায় ঃ

৮৯১.৪৪৪ আধুনিক (প্রথম যুগ)

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ মাইকেল
৪ হেমচন্দ্র
৫ নবীনচন্দ্র সেন
৬ অক্ষয়চন্দ্র
৭ ঈশানচন্দ্র
৮ রাজকৃষ্ণ রায়
৯ অন্যান্য

এমনিভাবে আমরা বাংলা সাহিত্যকে ভাগ করে যেতে পারি। যে-কেউ বাংলা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস-পুস্তকের সাহায্যে এরূপ বিভাগ করে নিতে পারেন। তবে এমন একটি বিভাগ হওয়া চাই, যা সকলে মেনে নিতে পারে।

সাহিত্যের সাধারণ ক্ষেত্রকে আবার দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিভাগ করা চলে এবং তার প্রয়োজনও আছে। কেবল সাহিত্যের সাধারণ ক্ষেত্রেরই যে এরূপ বিভাগ করা প্রয়োজন তা নয়, যে-কোন সাহিত্যকে এরূপে ভাগ করা চলে। কেন না, সাহিত্যের ইতিহাস যেমন থাকতে পারে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও থাকতে পারে।

দৃষ্টিকোণ

১ দর্শন
২ সংক্ষিপ্তসার
৩ অভিধান
৪ প্রবন্ধ
৫ পত্রিকা
৬ সাহিত্য-সঙ্ঘ
৭ শিক্ষা, গবেষণা
৮ সংগ্রহ
৯ ইতিহাস

ব্যবহারের নিয়ম

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, দৃষ্টিকোণগুলি কোন বিষয়ের বিশেষ চরিত্র, অর্থাৎ অন্তর্নিহিত চরিত্র নয়। আমরা যদি বলি বাংলা কবিতার ইতিহাস, তা হ'লে বোঝায় এই :

সাহিত্য+বাংলা (ভাষা)+কবিতা (রূপ)+ইতিহাস (দৃষ্টিকোণ)

এক্ষেত্রে দেখুন, আমাদের বিভাগের নিয়ম বার বার ভঙ্গ করতে হয়েছে। চরিত্র এখানে তিনটি : ভাষা+কবিতা+ইতিহাস।

মূল চরিত্র হচ্ছে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান :

০ জ্ঞানের সাধারণ ক্ষেত্র
৮ (অষ্টম বিভাগ) সাহিত্য
৯ অন্যান্য সাহিত্য
১৪৪ বাংলা সাহিত্য
১৪৪১ কবিতা-রূপ বাংলা সাহিত্য
·০৯ বাংলা কবিতার ইতিহাস

দেখুন, দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করবার সময় শূন্য ব্যবহার করে তবে দৃষ্টিকোণের সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। এই শূন্যের (০) একটি বিশেষ ব্যবহারিক মূল্য আছে। যখনই কোন একটি সংখ্যার ভিতরে এরূপ শূন্য থাকবে, তখনই বুঝতে হ'বে বিভাগের চরিত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। আর একটি উদাহরণ :

৫০০	বিজ্ঞান
৫০১	বিজ্ঞান+দর্শন
৫১০	অঙ্ক
৫১০·১	অঙ্কের দর্শন
৫১২	বীজগণিত
৫১২·০৯	বীজগণিতের ইতিহাস

এই বিভাগের মধ্যে দেখুন মূল চরিত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। চরিত্রের পরিবর্তন যে করা হচ্ছে, তা শূন্যের (০) দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে। ৫০১ বলতে বিজ্ঞানের দর্শন। ৫১২ = বিজ্ঞান + গণিত + বীজগণিত। এখানে বিজ্ঞানের চরিত্র তিনটি বিভাগেই রয়েছে এবং সেই চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই বিভাগ হচ্ছে। ৫১২-এর পর একটি শূন্য দিয়ে ৯ ব্যবহার করা হ'লো। এখানে শূন্য (০) দেওয়ার ফলে মূল চরিত্র-অনুযায়ী বিভাগ বন্ধ করে অন্য চরিত্রের উপর নির্ভর করে যে বিভাগ হচ্ছে, তা বুঝতে পারা গেল এবং শূন্যের পর যেই ৯ দেওয়া হ'লো, তখনই বোঝা গেল ৫১২-এর ইতিহাস অর্থাৎ বীজগণিতের ইতিহাস।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হ'বে, **যেখানে এইরূপ দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিভাগ না করলে নয়, কেবল সেই ক্ষেত্রেই ডিউই এইরূপ বিভাগ ব্যবহার করেছেন।** সুতরাং চোখ বুজে এরূপ দৃষ্টিকোণ-সূচক সংখ্যার ব্যবহার করলে ভুল হ'বে। যে-সব ক্ষেত্রে এরূপ বিভাগ নির্দেশ করা আছে, কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই এইরূপ বিভাগ করতে হ'বে। অন্য কোন ক্ষেত্রে এরূপ বিভাগের প্রয়োজন হ'লে, তা ব্যবহার করতে হ'বে ডিউই'র বইয়ের শেষের দিকে যে ছক দেওয়া আছে, সেই ছক অনুসারে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিভাগ আছে। সে-ক্ষেত্রে এইরূপ বিভাগ যুগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়ঃ

ইতিহাসের বিভাগ

৯০০ ইতিহাস
৯১০ ভূগোল, ভ্রমণ, বর্ণনা
৯২০ ব্যক্তির ইতিহাস (জীবনী)
৯৩০ প্রাচীন ইতিহাস
৯৪০ ইউরোপের ইতিহাস
৯৫০ এশিয়ার ইতিহাস
৯৬০ আফ্রিকার ,,
৯৭০ উত্তর আমেরিকার ইতিহাস
৯৮০ দক্ষিণ আমেরিকার ,,
৯৯০ মেরু-প্রদেশের ,,

এই বিভাগে লক্ষ্য করছেন, সারা পৃথিবীকে ৬টী ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রকে পুনরায় ৯টি ভাগে ভাগ করা যায়:

৯০০ ইতিহাস
৯৫০ এশিয়ার ইতিহাস
৯৫১ চীনের ইতিহাস
৯৫২ জাপানের ইতিহাস
৯৫৩ আরবের ইতিহাস
৯৫৪ ভারতের ইতিহাস

এর পর আবার ভারতের প্রদেশ-অনুযায়ী বিভাগও করা যায়:

৯৫৪ ভারতের ইতিহাস
৯৫৪.১ বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহার
৯৫৪.২ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি

কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ-অনুযায়ী বিভাগ করার প্রয়োজনও আছে। কারণ, বিশেষ বিশেষ যুগ সম্বন্ধে লেখা বহু বই থাকতে পারে। দৃষ্টিকোণের সংখ্যাগুলিই যুগনির্ণয় করবার জন্য ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

৯৫৪ ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস
.০১ মধ্যযুগ
.০২ মোগল-রাজত্বকাল
.০৩
.০৪
.০৫ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি
.০৬
.০৭
.০৮ বৃটিশ রাজত্বকাল
.০৯ স্বাধীন ভারত

প্রত্যেক বিভাগের আবার আরো সূক্ষ্মতর বিভাগ করা যেতে পারে।

ডিউই দেশবিদেশের ইতিহাসের সংখ্যা দিয়েছেন ৯৩০ থেকে ৯৯৯-এর মধ্যে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস হচ্ছে ৯৩৪। এই বিভাগেরও আরো বিভাগ করা চলে।

ইতিহাসের সংখ্যাগুলি অতি প্রয়োজনীয়। তার কারণ, যে-কোন বিষয়েই দেশ অনুসারে বই লেখা হ'তে পারে। সেই কারণে যে-কোন বিষয়কেই দেশানুযায়ী বিভাগ করবার প্রয়োজন হয়। যেমন্ ধরুন, ভারতের ভূবিজ্ঞান, ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা, ভারতীয় মজুর, ভারতীয় বেকার-সমস্যা ইত্যাদি। যে-সব ক্ষেত্রে এরূপ দেশানুযায়ী বিভাগের প্রয়োজন, ডিউই তাঁর ছকে লিখেছেন, সে-সব ক্ষেত্রে বিষয় ৯৩৩—৯৯৯ অনুসারে বিভাজ্য। কোন বিষয়ের দেশানুযায়ী বিভাগ করবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমতঃ বিষয়ের সংখ্যাটি বার করে, তাতে দেশের সংখ্যাটি জুড়ে দিতে হয়। ৯৫৪ সংখ্যাটি ভারতবর্ষের ইতিহাস, কিন্তু ভারতবর্ষের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪। সুতরাং যখনই কোন দেশের সংখ্যা বার্ করতে হ'বে, তখনই ইতিহাসের সংখ্যা ৯ বাদ দিতে হবে।

৩৫৪ শাসন-পদ্ধতি হ'লে—

৩৫৪'৪২ ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি

৩৫৪'৪৩ জার্মানীর „

কিন্তু এরূপ বিভাগে বিপদ আছে। কারণ, এমনিভাবে যে-কোন বিষয়ের সংখ্যায় দেশের সংখ্যা ব্যবহার করলে, অন্য বিষয়ের সংখ্যার সঙ্গে গোল বাধতে পারে। সেইজন্যে যে-সব ক্ষেত্রে গোল বাধবার সম্ভাবনা আছে, সে-সব ক্ষেত্রে ডিউই'র ২নং ছক ব্যবহার করতে হয়।

ভূগোল

৯১০ হ'লো ভূগোলের বিভাগ। এই বিভাগ যে কেবল ভূ-বর্ণনা বোঝায় তা নয়, দেশ-বিদেশের সামাজিক অবস্থাও বোঝায়। এই বিভাগকে

ইতিহাসের বিভাগ অনুসারে ভাগ করা যায়। এই বিভাগকে সম্প্রসারণ করবার একটি সোজা উপায় হচ্ছে, প্রথমতঃ কোন দেশের ইতিহাসের সংখ্যা বার করে, সেই সংখ্যায় ইতিহাসের সংখ্যা ৯-এর পর একটি ১ বসিয়ে দিলেই কাজ মিটে যায়। যেমন ধরুন, বাংলার ইতিহাস হচ্ছে ৯৫৪·১। এখন বাংলার ভূগোল, বাংলার অবস্থা, বা বাংলায় ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয় বোঝাতে এই সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হ'লে সংখ্যাটী হ'বে ৯১৫·৪১। অর্থাৎ—

৯ ইতিহাস
১ ভূগোল
৫ এশিয়া
৪ ভারতবর্ষ
১ বাংলাদেশ

ধরুন, আর একখানি বই, যেমন ভারতীয় অর্থনীতি। ভারতীয় অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়? অর্থনীতি একটী বিশেষ ধরণের জ্ঞান। এ জ্ঞান দেশ-দেশান্তর হিসাবে ভিন্ন হ'তে পারে না। কারণ, জ্ঞান সব সময়ে সত্য, অন্ততঃ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়—যদিও তা যে সত্য নয়, সে-কথা আমরা বহুবার বলেছি। যা সত্য, তা সকল দেশের পক্ষেই সত্য এবং তার প্রয়োগও সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে হবে। ভারতের অর্থনীতি বলতে সত্যিই অর্থনীতি বোঝায় না, ভারতের অর্থনীতি বলতে বোঝায় ভারতের আর্থিক অবস্থা। অবশ্য এ-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ এরূপ বইয়ের সংখ্যা তৈরী করেন ৩৩০·৯৫৪ দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংখ্যা ৯১৫·৪ হ'লেই ভালো হয়। ডিউই নিজে বহু ক্ষেত্রে এইরূপ সংখ্যাই ব্যবহার করেছেন। কোন দেশের আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি দেশের বর্ণনার সংখ্যা ব্যবহার করতে বলেছেন।

জীবনী

জীবনী দু'রকমের হ'তে পারে। প্রথম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনী। ব্যক্তি-জীবনী বলতে ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস বলতে এই ব্যক্তিগত

জীবনের ইতিহাসের সমষ্টিকে বোঝায়। ভারতের ইতিহাস বলতে কি সত্যিই আমরা ভারতের মানুষের ইতিহাস বুঝি? স্কুল-কলেজে আমরা এই কথাই শুনে আসছি বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এ-কথা কী সাংঘাতিক ভ্রমাত্মক! ইতিহাসের ভিতরে আমরা কি পাই? কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের বিবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এরূপ ইতিহাসকে রাষ্ট্রিক ইতিহাস বলাই ভালো। তা বললে কিন্তু আর এক সমস্যা ওঠে। এরূপ ইতিহাসকে অর্থনৈতিক ইতিহাসও (Economic History) বলা যেতে পারে। এ-সব ক্ষেত্রে বিভাগের নিয়ম হচ্ছে, বইয়ে যে-বিষয়ের প্রাধান্য থাকে, তার উপর নির্ভর করে বিভাগ করা। ইতিহাস অপেক্ষা রাষ্ট্র যদি প্রধান হয়, তা হ'লে সেরূপ বইকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভিতর দেশীয় বিভাগ দিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত।

এখন জীবনীর কথা ধরুন। প্রথম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনী, যেখানে ব্যক্তিই প্রধান। আবার ব্যক্তিগত জীবনী এমন হ'তে পারে, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তি যে-বিষয়ের লোক, সেই বিষয়ই প্রধান। সুতরাং জীবনীকে দু'রকম ভাবে ভাগ করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনীতে যেখানে বিষয়ের প্রাধান্য থাকে, সেখানে সেই জীবনীর বই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিতর রাখতে হবে। নতুবা ব্যক্তিগত জীবনীকে বিষয়ের প্রাধান্য অনুসারে ভাগ করতে হ'বে, যেমন:

৯২০	জীবনী	
৯২১	„	(দর্শন)
৯২২	„	(ধর্ম)
৯২৩	„	(সমাজতত্ত্ব)
৯২৪	„	(ভাষা)
৯২৫	„	(বিজ্ঞান)
৯২৬	„	(ব্যবহারিক বিজ্ঞান)
		ইত্যাদি

এখন ধরুন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী। এরূপ একখানি বইয়ের সংখ্যা হবে ঃ

৯২৫ বিজ্ঞানের লোক

৯২৫·৪ রসায়ন শাস্ত্রের লোক

কিন্তু এতেও সূক্ষ্ম বিভাগ হ'লো না। কারণ, এই সংখ্যা বিদেশী কোন রাসায়নিকের জীবনীও বোঝাতে পারে। সুতরাং দেশানুযায়ী বিভাগ করতে হবে। তা হ'লে আমাদের সংখ্যাটি হবে ৯২৫·৪৫৪। কিন্তু এ-বিভাগেও ভারতীয় অন্য কোন রাসায়নিক পড়তে পারেন। এখন দেখতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রসায়নের কোন্ ক্ষেত্র সম্পর্কে কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে Iodides। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে তাঁকে প্রথমতঃ Iodide-এর ভিতর ফেলে, তবে দেশানুযায়ী বিভাগ করতে হয়।

জীবনীকে বিষয়ের ভিতরও ফেলা চলে। ডিউই'র বইয়ে তার ইঙ্গিত আছে।

এই হ'লো সংক্ষেপে ডিউই'র বিভাগের বর্ণনা।*

বিষয় অনুসারে জাতিবিচারের অসুবিধা

আমরা বার বার বলেছি, পাঠকের জন্যেই বই এবং পাঠকের জন্যেই গ্রন্থাগার। সুতরাং গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে গেলে, তা পাঠকের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বইয়ের জাতিবিভাগ করতে গেলে, বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়টি নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিশীলতার উপর নির্ভর করে বিচার করলে চলবে না। বইখানিকে সব সময়ে বিচার করতে হবে পাঠকের দিক থেকে, পাঠকের মন দিয়ে, পাঠকের প্রয়োজনানুসারে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ব্যাপারটিকে যে সম্ভবপর বলে মনে হয় না, তা খুবই সত্যি। কিন্তু যাঁরা

* পরিশিষ্ট দেখুন।

গ্রন্থাগারে কাজ করছেন, তাঁরা জানেন যে, এরূপভাবে বইয়ের জাতিবিচার করা সম্ভবপর এবং সে-জ্ঞান পাঠকের সঙ্গে ও পাঠক-মনের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচিত হওয়ার ফলে অর্জন করা যায়।

লেখক কি বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা বোঝা যাবে বইয়ের কয়েকটী অংশ দেখে। **প্রথমতঃ** বইয়ের নাম। বইয়ের নাম দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইয়ের বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের নাম থেকে বিষয় ধরে নিয়ে পুস্তকের জাতিবিচার করলে তা খুবই ভুল হ'তে পারে। যেমন 'ব্ল্যাক ওপিয়াম', 'মার্স' ইত্যাদি বই। 'ব্ল্যাক ওপিয়াম' দেখলেই মনে হবে আফিং-সম্বন্ধীয় বই এবং 'মার্স' (Mars) দেখলেই বইখানি জ্যোতিষ-সংক্রান্ত ও গ্রহনক্ষত্র-বিজ্ঞান বিষয়ের মনে হ'তে পারে। **দ্বিতীয়তঃ** পুস্তকের সূচীপত্র দেখলে পুস্তকের বিষয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হবে।

এতেও যদি বইখানি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারা না যায়, তা হ'লে বইয়ের কিছু কিছু অংশ পড়ে দেখা প্রয়োজন।

আবার এমন অনেক বই আছে, যার বিষয় ঠিক করতে পারা গেলেও, স্থান-নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। যেমন ধরুন, মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য'। এখানে যদি বইখানিকে প্রবন্ধের পর্যায়ে ফেলেন, তা হলে ভুল হবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে যারা পড়বে, তারা খোঁজ করবে এই বইখানির। এরূপ ক্ষেত্রে বইখানিকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।

আবার ধরুন, রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব। এরূপ বই বিহারীলালের বইয়ের সঙ্গে না রেখে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে প্রভাবিত বিষয়টীর মধ্যে বইখানিকে রাখা।

তার পর ধরুন, একখানি প্রবন্ধের বই, যাতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ আছে। এরূপ বইকে প্রথম প্রবন্ধের বিষয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু অন্য যে বিষয়গুলি বইখানির ভিতর আছে, তা-ও পাঠককে জানাতে হবে এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে পুস্তকতালিকায় অবশিষ্ট বিষয়গুলির তালিকা করা।

এরূপ আরো বহু নিয়ম আছে। সে-সব নিয়মের বর্ণনা দেবার মত স্থান এখানে নেই। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হ'লে 'Classifier's Code' নামক বইখানি পড়া দরকার।*

আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পুস্তকের জাতিবিচার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সেই কারণে বহু ক্ষেত্রে দু'জনের একই বইয়ের জাতিবিচার ভিন্ন হ'য়ে যায়। সেই জন্যে যে-বইয়ের জাতিবিচার করতে হবে, সেই বইখানি বা ঠিক সেই রকমের কোন বই গ্রন্থাগারে আছে কিনা, তা দেখে নেওয়া দরকার। যদি দেখা যায়, সেরূপ বই আছে, তা হ'লে যে-সংখ্যা সেই বইয়ে দেওয়া আছে, নতুন বইয়েও সেই সংখ্যা দেওয়া উচিত। পুরাতন সংখ্যা একেবারে ভুল না হ'লে, তার পরিবর্তন করা উচিত নয়। এরূপ সতর্কতার সঙ্গে বইয়ে চিহ্ন দিলে একই বইয়ে দু'রকমের চিহ্ন হ'বে না।

অনেকে হয়তো বলবেন, পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধ তো পুস্তকের তালিকার। মঞ্চে বই-সাজানোর জন্যে তবে এত চিন্তা কেন? আপনি যেভাবেই পুস্তকের জাতিবিচার করুন না কেন, পাঠকের তা জানবার প্রয়োজন কি? কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারে পাঠকের গতায়াতের বাঁধাবাঁধি নেই। মঞ্চ পাঠকের কাছে সব সময়েই খুলে দেওয়া হয়। যদি মঞ্চে পাঠকের যাবার অধিকার না-ও থাকে, তা-হ'লেও কোন একটি নিয়মানুসারে যে বই-সাজানো প্রয়োজন, সে-কথা কেউই অস্বীকার করবে না। বইয়ের চিহ্নও একটি নিয়মানুসারে দিতে হবে। তা না হ'লে চাইবা মাত্র বই খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হবে না। আবার যদি কোন পাঠক আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, গ্রন্থাগারে 'উদ্বাস্তু' সম্বন্ধে কি কি বই আছে, তা হ'লে তখন আপনি তাকে কি উত্তর দেবেন? বিষয়ানুসারে বই সাজানো না থাকলে এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

---

* পরিশিষ্ট দেখুন।

লেখক-সংখ্যা

বই তো বিষয়ানুসারে সাজানো হ'লো, এখন একই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা বইগুলিকে কেমন করে পৃথক করতে হ'বে? একই বিষয়ের মধ্যে আবার বিভাগ করতে গেলে এক-একখানি বইয়ের কোন একটি চরিত্র অনুসারে ভাগ করতে হবে।

এক বিষয়ের বইগুলিকে পৃথক পৃথক বিভাগে ভাগ করবার জন্যে যে-কোন সংখ্যা কাজে লাগানো যেতে পারে। এরূপ বিভাগের জন্যে বিষয়-সংখ্যার নীচে ০০০—৯৯৯ সংখ্যা ব্যবহার করা চলে। যেমন ধরুন, সাহিত্যের ইতিহাসের উপর দশখানি বই আছে। এই বই দশখানিকে চিহ্নিত করতে হ'লে এইরূপ চিহ্ন হবে: $\frac{৮০৯}{০০১}$, $\frac{৮০৯}{০১১}$, $\frac{৮০৯}{১১১}$, $\frac{৮০৯}{১১২}$, $\frac{৮০৯}{১২২}$, $\frac{৮০৯}{২২২}$, $\frac{৮০৯}{২২৩}$, $\frac{৮০৯}{২৩৩}$, $\frac{৮০৯}{৩৩৩}$, $\frac{৮০৯}{৩৩৪}$। এক বিষয়ের ২৭ খানি বইকে এইরূপ চিহ্নের দ্বারা সাজাতে পারা যাবে। বিভাগের প্রত্যেক ক্ষেত্রের চিহ্নের সঙ্গে এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে। এইরূপ চিহ্ন-ব্যবহারের আর একটি সুবিধা হচ্ছে, কোন্ বিষয়ে কতগুলি বই আছে, তা শীঘ্র জানা যাবে। কিন্তু বেশী বড় গ্রন্থাগারে এরূপভাবে চিহ্ন ব্যবহার করলে মুশকিল হ'তে পারে। কারণ, এরূপ গ্রন্থাগারে এক-একটি বিষয়ের বহু বই থাকতে পারে।

সাধারণতঃ লেখকের নামানুসারে বই সাজানো হয় এবং সেজন্য **'লেখক-সংখ্যা'** ব্যবহার করা হয়। এইরূপ ছাপা লেখক-সংখ্যা কিনতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর প্রণীত 'লেখক-সংখ্যা' ব্যবহার করা চলে। এই বইখানি ইংরেজী 'লেখক-সংখ্যা'র অনুকরণে লিখিত।

ডাক-সংখ্যা

বইয়ের জাতিবিভাগের ফলে বইয়ের গায়ে একটী বিষয়-সংখ্যা পড়লো এবং লেখকের নামানুসারে বইয়ে আর একটি সংখ্যা পড়লো। প্রথম

সংখ্যাটির নাম হ'লো 'জাতি-সংখ্যা' বা 'বিষয়-সংখ্যা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটির নাম হ'লো 'লেখক-সংখ্যা'। এই দু'টি সংখ্যায় মিলে হয় **'ডাক-সংখ্যা'।** কারণ, এই দু'টি সংখ্যা দিয়ে পাঠক বইখানিকে "ডাক দেয়," অর্থাৎ চায়।

এই ডাক-সংখ্যাটি প্রথমতঃ বইয়ের নামের পাতার পিছন দিকে পেন-সিলে লিখতে হয়। সময় সময় বইয়ের সংখ্যা পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই এই সংখ্যা পেনসিলে লেখা উচিত। বইয়ের গোড়ার দিকে অনেক সময় খালি পাতা থাকে। এই খালি পাতার উপর কখনও ডাক-সংখ্যা লেখা উচিত নয়। কারণ, বই বাঁধাবার সময় সেই পাতার পরিবর্তে নতুন কাগজ দেওয়া হয়। আর একটি ডাক-সংখ্যা দিতে হয় বইয়ের 'পুটে' বা শিরদাঁড়ায়। আর, বই খুব পাতলা হ'লে ডাক-সংখ্যা দেওয়া উচিত বইয়ের পিছনের মলাটের বাইরের দিকের উপরে—বাঁ কোণে।

কোন নূতন গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের জাতি-বিভাগ করতে হ'লে, প্রথমতঃ বইগুলিকে ডিউই'র বিভাগ অনুসারে দশটি ভাগে যেমন-তেমন করে সাজিয়ে নিতে হয়। তারপর ০ থেকে ৯ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সংখ্যা দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সংখ্যা দেখার আগে চিন্তা করে নিতে হয় যে, ডিউই'র সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত বিভাগ ব্যবহার করা হবে, অথবা ডিউই'র সংক্ষিপ্ত বিভাগ ব্যবহার করতে হবে। তবে পরিবর্ধিত বিভাগই ব্যবহার করা ভালো। কারণ, গ্রন্থাগার ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। সংক্ষিপ্ত বিভাগ ব্যবহার করলে সব বইকে শেষ পর্যন্ত স্থান না-ও দেওয়া যেতে পারে। তখন গ্রন্থাগারকে আবার নতুন করে গড়তে হয়। কিন্তু তা বড় কষ্টকর। বিভাগের ছক যতটা স্মরণ থাকে, সেই অনুসারে প্রথমতঃ বইগুলিকে মঞ্চে সাজিয়ে নেওয়ার একটা প্রধান সুবিধা হচ্ছে, ছক অনুসারে বিভাগ করবার পূর্ব থেকেই পুস্তকের একটি স্থান নির্ণয় করে নেওয়া হয়। এতে যিনি জাতি-বিচার করছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তিরও একটা অনুশীলন হয়, এবং ছক সম্বন্ধে ধারণাও ক্রমশঃ গভীর হ'তে থাকে।

জাতি-বিচার বনাম তালিকা-প্রণয়ন

বড় বড় গ্রন্থাগারে পুস্তকের জাতি-বিচারের ভার একজনের উপরই থাকে এবং তিনি এই বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হন। ছোটখাটো গ্রন্থাগারে জাতি-বিচারের কাজ ও তালিকা-প্রস্তুতের কাজ করেন একজনেই। অনেকে বলেন, এই দু'টি কাজ পৃথক ব্যক্তির দ্বারা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এ-দু'টি কাজের মধ্যে একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এ-কথা সত্যি নয়। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, দু'টি কাজের উদ্দেশ্য এক। যিনি পুস্তকের জাতি-বিচার করছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠক যাতে সহজে বই খুঁজে পায়, এক জায়গায় এক বিষরের বই দেখতে পায় এবং বিষয়গুলির ভিতরকার একটা সম্বন্ধ তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যিনি তালিকা প্রস্তুত করছেন, তাঁর উদ্দেশ্যও ঐ একই, অর্থাৎ তিনিও পুস্তকের **'লিখন'** (entry) এমনভাবে তৈরী করছেন, যা'তে একটি 'লিখন' দেখে পাঠক বই-খানির **বিষয় ও লেখকের নাম** সম্বন্ধে সব কিছুই জানতে পারে। কেবল তাই নয়, জাতি-বিচারক বইখানির বিষয় কি ঠিক করলেন, তা-ও পুস্তকতালিকা-প্রস্তুতকারকের জানা প্রয়োজন। তার কারণ, তাঁকেও **বিষয়-লিখন** লিখতে হবে। দু'জনের সঙ্গে একটা মতের আদান-প্রদান থাকলে ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা কেউই প্রভাবান্বিত হ'তে পারবেন না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জাতি-বিচারের কাজে ব্যক্তিগত প্রভাব অনেক সময় বিপজ্জনক হ'য়ে দাঁড়ায়। এই সব নানাকারণে জাতি-বিচার যিনি করছেন, তাঁর সঙ্গে পুস্তকতালিকা-প্রস্তুতকারকের সম্বন্ধ যে অবশ্য থাকা চাই, একথাও মনে রাখতে হবে। জাতি-বিচারের সময় বইখানিকে জ্ঞানের যে ক্ষেত্রে ফেলা হয়েছে, সে-ক্ষেত্রের নাম যেন পুস্তকতালিকা-প্রস্তুতকারক বিষয়-লিখনে ব্যবহার না করেন। তাতে বইয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ না হ'তে পারে এবং ব্যবহৃত নামটি বোধগম্য না-ও হ'তে পারে।

পুস্তকের তালিকা-প্রণয়ন

তালিকার উদ্দেশ্য

সারা পৃথিবীতে কত বই যে ছাপা হয়, তার ঠিক নেই। কেবলমাত্র ইংরেজী বইই বছরে ১৬,০০০ ছাপা হয়। গ্রন্থাগারে বই কেনা হয়। কিন্তু বই কেনা হ'লেই কাজ শেষ হ'য়ে যায় না। কারণ, বইয়ের ব্যবহার না হ'লে বইয়ের কোন মূল্য থাকে না। পাত্র অনুসারে বইয়ের পরিবেশন না হ'লে বই কেনার উদ্দেশ্য সফল হয় না। নানা রকমের পাঠক নানারকম বিষয়ের নানা ধরণের বই নানাবিধ উদ্দেশ্যে পড়তে চায়। পুস্তকাগারে কি কি বিষয়ের কি ধরণের বই আছে, তা পাঠকদের প্রদর্শন করতে হবে। সেই কারণেই পুস্তক-তালিকার প্রয়োজন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে, পুস্তকের 'নামপত্র' লিখতে পারলেই পুস্তক-তালিকা তৈরী হ'য়ে গেল। পুস্তকাগারে প্রত্যেকখানি বইই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে কেনা হয়। সেইজন্যে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম লেখার সঙ্গে সঙ্গে বই কেনার উদ্দেশ্যও জানানো দরকার। বইখানি ছাপার উদ্দেশ্য, বইয়ের ভিতরের বিষয়-সূচী, সেই সকল বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বইয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ—এ-সবই পুস্তকের তালিকা থেকে বোঝা যাওয়া চাই। তা না হ'লে অতি প্রয়োজনীয় বইও হয়তো কোন কাজে লাগবে না।

পুস্তকের তালিকা হচ্ছে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের চাবি। এই চাবি না থাকলে পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য সফল হয় না। পুস্তকতালিকা-বিহীন পুস্তকাগারকে বইয়ের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। পাঠকের যদি পুস্তকাগারের রত্ন-সম্ভারের সন্ধান জানবার প্রয়োজন হয়, তা হ'লে পুস্তক-তালিকার যে প্রয়োজন আছে, সে-কথা কেউই অস্বীকার করবে না।

পুস্তক-তালিকার কাজ কি? তালিকার কাজ হচ্ছে নিম্নরূপ চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঃ

(১) এই লেখকের কি কি বা ক'খানি বই আছে?
(২) এই-বিষয়ের কি কি বা ক'খানি বই আছে?
(৩) এই নামে কোনো বই আছে কিনা?
(৪) এই সিরিজের কতগুলি বা কি কি বই আছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় লেখকের নামের তালিকা থেকে;
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় বিষয়ের তালিকা থেকে;
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় পুস্তকের নামের তালিকা থেকে এবং
চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সিরিজের তালিকা থেকে।

তালিকার বিভিন্ন রূপ

তা হ'লে পুস্তকের তালিকায় থাকা চাই ঃ **(১) লেখকের নাম, (২) বিষয়ের নাম, (৩) বইয়ের নাম ও (৪) সিরিজের নাম।**

'লেখক' কথাটির পরিবর্তে 'প্রণেতা' কথাটাই ব্যবহার করা ভালো। কারণ, কেবল লেখকই যে পুস্তকের স্থষ্টিকর্তা, তা নয়। কোন সম্পাদকের সম্পাদনায় একখানি পুস্তকের স্থষ্টি হ'তে পারে; সংকলন করেও একখানা পুস্তক স্থষ্টি করা যেতে পারে, আবার কোন সঙ্ঘের দ্বারাও একখানি বই প্রকাশিত হ'তে পারে। সেই কারণে 'লেখক' বলতে আমরা বুঝবো 'পুস্তক-প্রণেতা'কে।

প্রণেতার নামের তালিকা এমনভাবে তৈরী করা চাই, যাতে নামের আদ্য-ক্ষরের ক্রমানুসারে পুস্তক-প্রণেতার নামগুলি পর পর স্থান পায় এবং এক প্রণেতার যতগুলি বই থাকে, সে-সমস্ত বইয়ের নামই এক স্থানে দেখা যায়। এইরূপ তালিকা হ'লে কোন পুস্তক-প্রণেতার বিশেষ কোন একখানি বই

সহজে খুঁজে বার করা যাবে এবং একজন প্রণেতার কি কি বিষয়ের কতগুলি বই আছে, তা-ও সহজে জানা যাবে।

এক-একটি বিষয়ের বইয়ের লিখন এক স্থানে থাকা চাই এবং বিষয়ের তালিকার মধ্যে বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তভাবে সাজানো দরকার। একখানি বইয়ে অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে লেখা থাকতে পারে। সে কারণে তালিকায় প্রত্যেক বিষয়ের এক একটি **'লিখন'** (entry) থাকা চাই।

তালিকার মধ্যে বইয়ের নামের 'লিখন' বড় একটা থাকে না। তবে যে-সব বইয়ের নামটা অদ্ভুত এবং যে-বইয়ের লেখকের নামের চেয়ে বইয়ের নামই সাধারণের বেশী মনে থাকে, সেই-সব নাম লিখনের দ্বারা তালিকাভুক্ত করা দরকার।

প্রত্যেক লিখনে বইয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকা চাই: লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশের তারিখ, প্রকাশক, কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এমন কোনো পুস্তকাগার নেই, যেখানে একটি মাত্র পুস্তক-তালিকা দ্বারা পূর্বোক্ত চারটি প্রশ্নেরই উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

কোন পুস্তকাগারে কি রকম তালিকা থাকা দরকার, সেইটাই হ'লো পুস্তকাগারের সমস্যা। কারণ, কি ধরণের পুস্তক-তালিকা রাখা হবে, তা নির্ভর করবে কি ধরণের পাঠক, তার উপরে। পাঠকেরা যদি অতি সাধারণ হয়, অর্থাৎ যারা কেবল আনন্দের জন্যই বই পড়তে চায় এবং যারা কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নয়, তা হ'লে তাদের জন্যে একটি **লেখক-তালিকা** করলেই হয়তো চলে। কিন্তু সাধারণ পুস্তকাগারের পাঠক যে কত রকমের হয়, তা বুঝে ওঠাও কঠিন। সেই কারণে কেবল লেখক-তালিকার উপর নির্ভর করলেও চলে না। কোন পাঠক বইয়ের লেখকের নাম ভুলে গেলে, সে তার প্রয়োজনীয় বইখানির সন্ধান আর পাবে না। কিন্তু কি বিষয় সে পড়তে চায়,

তা তার জানা থাকা দরকার। কারণ, তা-ও যদি তার মনে না থাকে, তা হ'লে বলতে হয়, তার পড়বার উদ্দেশ্য যে কি, তা সে নিজেই জানে না। সেই জন্যে **বিষয়-তালিকা** থাকাও একান্ত প্রয়োজন। যে-কোন পুস্তকাগারে একটি বিষয়-তালিকা ও সেই সঙ্গে একটি লেখক-সূচী থাকলেই ভালোভাবে কাজ চলবে, আশা করা যায়।

লেখক-তালিকা : কিছুকাল আগেও লেখকের তালিকা ছিল পুস্তকাগারের সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তালিকা। সাধারণ পুস্তকাগারে লেখকের তালিকাকে এখনও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তালিকা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, একটি বিষয়ের 'ইঙ্গিত' দিতে গেলে নানা নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। বইয়ের নামও অনেক সময় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, বা পাঠক নিজে বইয়ের নাম যথাযথভাবে মনে না রাখতেও পারে। কিন্তু লেখকের নাম সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। অন্ততঃ লেখকের নামটি পাঠকের মনে থাকা চাই। তবে অনেক সময় লেখক 'অপ্রকৃত' নাম অর্থাৎ ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন, বা কেবল নামের প্রথম অক্ষরও ব্যবহার করতে পারেন, আবার নামের উপাধি-পরিবর্তনও করতে পারেন। যেমন, বিবাহের পর স্ত্রীলোকের নামের উপাধির অংশের অনেক সময় পরিবর্তন হয়। এ-সব ক্ষেত্রে আসল নাম, অপ্রকৃত নাম, পরিবর্তিত নাম, নামের আদ্যক্ষর—সমস্তই লিখনের দ্বারা তালিকাভুক্ত হওয়া দরকার।

বিষয়-তালিকা : সত্যিকথা বলতে গেলে, বিষয়-তালিকা বলতে যে কি বোঝায়, তা বর্ণনা করা শক্ত। কারণ, বর্ণমালা অনুসারে বিষয়তালিকা প্রস্তুত করলে বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন ধরুন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য—এই বিষয়গুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। একটি শিখতে গেলে আর একটি শেখা দরকার। কিন্তু এই বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে গেলে একটি বিষয় থেকে আর একটি অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। তার ফলে পুস্তকের তালিকার

মধ্যে বিষয়গুলির কোন সম্বন্ধ দেখানো যাবে না। বিষয়-তালিকা দুই রকমের : (ক) **বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী তালিকা** ও (খ) **বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক তালিকা।**

(ক) **বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী তালিকা :** পুস্তকের জাতি-বিভাগ করতে হবে জ্ঞানের জাতিবিভাগ অনুসারে। প্রথমে জ্ঞানের জাতি-বিভাগের একটি ছক করে নিতে হবে। জ্ঞানের জাতিবিভাগের ছকে বিষয়গুলি যেমন পরস্পরের সম্বন্ধ অনুসারে সাজানো আছে, পুস্তকের বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী তালিকাকে ঠিক সেই নিয়মে সাজাতে হবে। জ্ঞানের জাতি-বিভাগের তালিকাটী যত ভালো হবে, বিষয়-তালিকাও তত ভালোভাবে প্রস্তুত করা যাবে। জ্ঞানের জাতিবিভাগের ছক অকেজো হ'য়ে গেলে বিষয়-তালিকাও অকেজো হ'য়ে পড়বে। বই-সাজানোর জন্যে জ্ঞানের জাতিবিভাগের যতখানি মূল্য, বিষয়-তালিকারও মূল্যও ঠিক ততখানিই। প্রত্যেক বইয়ের 'লিখন'টিকে যদি এক-একখানি বই বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হ'লে এই তালিকাটিকে গ্রন্থাগারের একটী ছোটখাটো প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, গ্রন্থাগারে বইগুলি যেমন দলবদ্ধভাবে সাজানো আছে, এই তালিকায় বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলিও সেই একই রূপে সাজানো হবে। কেবল তফাৎ এই যে, একখানি বইয়ের জন্য একটির বেশী 'লিখন' থাকতে পারে। কারণ, একটি বইয়ের ভিতর যতগুলি বিষয় আছে, সবগুলিরই একটি করে 'লিখন' দরকার। যেমন বরুন, একখানি প্রবন্ধের বই। এই বইয়ের ভিতর দশটি বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ আছে। দশটি বিষয়ের কথা যে সেই বইখানিতে আছে, সে-কথা পাঠকদের জানতে দেওয়া দরকার। তা না হ'লে বিষয়গুলির খোঁজ পড়বে না। ছোটখাটো গ্রন্থাগারের এইরূপ তালিকা তৈরী করার প্রয়োজন বেশী। কারণ, পাঠক কিছু পড়তে চাইলে তাকে অন্ততঃ তার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছু পড়তে দিতে হবে। একটি ছোটখাটো পুস্তকাগারে সব বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক বই না থাকতেও পারে। উপরের মত তালিকা

প্রস্তুত করলে পাঠককে তবু হতাশ হ'য়ে ফিরতে হ'বে না। পাঠক যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু পড়তে এসে তালিকায় তা খুঁজে না পায়, তা হ'লে সে আর পুস্তকাগারের দরজা মাড়াবে না। এই তালিকা প্রস্তুত করবার সময় আর একটি কথা মনে রাখতে হ'বে। একটি বিষয় নানা নামে পরিচিত হ'তে পারে। যে-নামটী সব চেয়ে বেশী পরিচিত, সেই নামটিতে হবে প্রধান 'লিখন' এবং অন্য নামগুলি থেকে সেই প্রধান লিখনে 'সম্বন্ধ নির্দেশ' করে দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আরো কথা আমরা পরে বলবো।

(খ) বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী বর্ণনানুক্রমিক তালিকা ঃ এই তালিকায় প্রথমতঃ বর্ণমালার যতগুলি অক্ষরে সম্ভব, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে ততগুলি ভাগে ভাগ করে নিয়ে, ক্ষেত্রগুলির নাম বর্ণমালা অনুসারে সাজিয়ে প্রত্যেক নামের নীচে, সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি বর্ণনানুক্রমিক-ভাবে সাজাতে হয়।

লেখক, বিষয়, বইয়ের নাম ও সিরিজের তালিকাগুলিকে একত্রিত করে একটিমাত্র **'অভিধান-তালিকা'** প্রস্তুত করা যেতে পারে। সাধারণের কাছে 'অভিধান-তালিকা'ই বেশী আদর পেয়ে থাকে। কারণ, যে-কোন বিষয়, বা নাম অভিধান থেকে কোন শব্দ বার করার মত অতি সহজেই খুঁজে বার করতে পারা যায়। তালিকা খোঁজবার জন্যে পাঠককে নূতন করে কিছু শিখতে হয় না।

কোন একটি বিষয় খুঁজে বার করবার দরকার হ'লে, এই ধরণের তালিকা খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কেউ যদি কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের বই এক সঙ্গে দেখতে চায়, তা হ'লে এতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তবে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের 'সম্বন্ধ নির্দেশ করে' অভিধান-তালিকার এই ত্রুটিটুকু দূর করা যায়। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এই 'সম্বন্ধ-নির্দেশ' ক্রমশঃ বিরক্তিকর হ'য়ে দাঁড়ায়।

তালিকার গঠন

তালিকার গঠন সাধারণতঃ দু'রকমের: (১) **কার্ড-তালিকা** ও (২) **বই-তালিকা**। কোন্ প্রকারের তালিকা পুস্তকাগারে রাখতে হবে, তা ঠিক করবার আগে তালিকার নিম্নে বর্ণিত বিশেষ চরিত্রগুলি ভেবে দেখতে হবে:

(ক) তালিকা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে। কারণ, পুস্তকাগারের বইয়ের সংখ্যা রোজই বাড়বে এবং প্রতি বইয়ের জন্যে নূতন লিখন লিখতে হবে। এই কারণে তালিকার একটি চরিত্র হচ্ছে **সম্প্রসারণশীলতা**।

(খ) তালিকা **'সময়োপযোগী'** হওয়া চাই, অর্থাৎ নূতন বই যেমন পুস্তকাগারে আসতে থাকবে, তেমনি বই আসার সঙ্গে সঙ্গে তালিকাতেও নূতন বইয়ের লিখন ওঠা চাই।

(গ) **এক রকমের লিখন এক সঙ্গে থাকা চাই।**

(ঘ) বই বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে তালিকার লিখনও বাতিল করা সম্ভব হওয়া চাই।

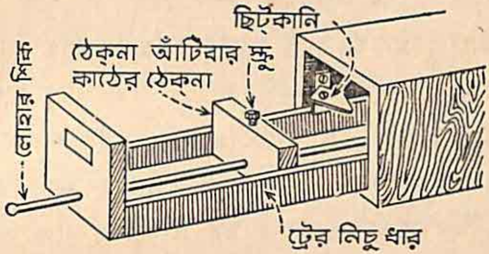
(ঙ) তালিকা যাতে **সহজে ব্যবহার** করা যায়, তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(চ) পাঠক অনেক সময় তালিকা বাড়ী নিয়ে যেতে চায়। সে জন্যে **তালিকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।** এই তো গেল তালিকার চরিত্র। এখন দেখুন, উল্লিখিত দু'রকমের তালিকার মধ্যে কোন্‌টিতে বেশির ভাগ চরিত্র বর্তমান।

কার্ড-তালিকা

প্রত্যেক বইয়ের 'লিখন' একখানি ৫"×৩" মাপের কার্ডে লেখা হয়। পরে কার্ডগুলি যে-কোন নিয়মানুসারে একটি ট্রে'র ভিতর সাজিয়ে রাখা হয়।

ট্রেগুলি একটী সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করান থাকে। প্রত্যেক কার্ডের তলার দিকে একটি ছিদ্র থাকে। একটি লোহার শিক ট্রে'র বার থেকে ট্রে'র মধ্যে পর পর সাজানো কার্ডগুলির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ট্রে'র অপর প্রান্তে আটকে রাখা হয় (নীচের ছবিটি দেখুন)।



ট্রে'র মধ্যে কার্ড-তালিকা রাখবার ব্যবস্থা

কার্ড-তালিকার গুণাগুণ ঃ কার্ড-তালিকার সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে ঃ

(ক) কার্ড-তালিকার সম্প্রসারণ সহজে করা যায়। কারণ, কার্ডগুলিকে ট্রে'র ভিতর ইচ্ছামত সরান যায়।

(খ) কার্ড-তালিকাকে সময়োপযোগী করে রাখা যায়। কারণ, নূতন লিখনের একখানি কার্ডকে ট্রে'র মধ্যে সহজে স্থান দেওয়া যায়।

(গ) প্রত্যেক লিখন ইচ্ছামত সরানো যায়। সেই জন্যে একজাতীয় লিখন একসঙ্গে রাখার কোন অসুবিধা হয় না।

(ঘ) কার্ড-তালিকা সর্বদা 'সহজলভ্য' নয়। কারণ, একজন যখন কোন একটি বিষয় খোঁজে, তখন আর একজনের পক্ষে অন্য ট্রে খোঁজা অসুবিধাজনক হয়। তবে একটি স্থানে কার্ডের সিন্দুকটিকে রাখা হয় বলে পাঠককে একটি বিষয় খোঁজবার জন্যে দশ জায়গায় যেতে হয় না।

(ঙ) ট্রেগুলি সহজে বহনসাধ্য নয়। সেই কারণে ট্রেগুলি কারো পক্ষে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বই-তালিকা

বই-তালিকা দুই প্রকারের : (ক) ছাপা তালিকা ও (খ) 'শীফ' (sheaf) তালিকা। ছাপা তালিকার কথা পরে বলবো। 'শীফ' তালিকার কথা আগে বলছি।

'শীফ' তালিকার গুণাগুণ : (১) 'শীফ' তালিকায় প্রত্যেকটি লিখন একখানি নির্দিষ্ট মাপের কাগজের উপর লেখা হয় বলে 'শীফ' তালিকার সম্প্রসারণ সম্ভবপর, তবে খুব বেশী সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর নয়। তার কারণ, নির্দিষ্ট মাপের আকারবিশিষ্ট একটী আবরণ বা মলাটের মধ্যে কাগজগুলিকে আটকে রাখা হয় এবং এই আবরণের মধ্যে যতগুলি কাগজ ধরবার জায়গা আছে, তার চেয়ে বেশীসংখ্যক কাগজ ধরানো সম্ভবপর নয় (চিত্র দেখুন)।

(২) 'শীফ'-তালিকা বইয়ের মত আকারের বলে তা একস্থান থেকে আর একস্থানে সহজে নিয়ে যাওয়া যায়।

(৩) প্রত্যেক পাতায় অনেকটা লেখবার জায়গা থাকে, সে কারণে অনেক সময় একটী পাতায় একাধিক লিখন লেখা হয়। তার ফলে কিছুদিন পর লেখাগুলি বড় বেশী ঘেঁষাঘেষি হ'য়ে পড়ে। এবং—

(৪) কোন লিখন নষ্ট করবার প্রয়োজন হ'লে একখানি পুরা পাতা নষ্ট করতে হয় বলে প্রত্যেক পাতা আবার নূতন করে লিখতে হয়।



'শীফ' তালিকার পাতাগুলি মলাটের মধ্যে আঁটা রয়েছে : পিছন দিকে মলাটে আঁটা 'শীফ' তালিকার কয়েকটি খণ্ড দেখা যাচ্ছে

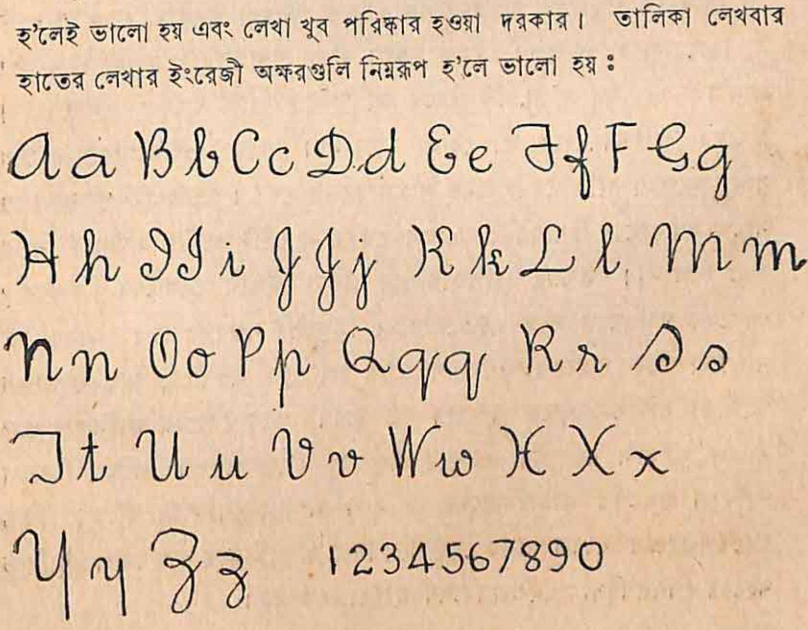
আজকাল ইংরেজী বইয়ের ছাপা লিখন অল্প মূল্যে কিনতে পাওয়া যায়। সেই লিখনগুলিকে কার্ডের উপর আঠা দিয়ে এঁটে ট্রে'র-ভিতর রাখা যতটা

সুবিধাজনক হয়, একটী পাতার উপর সেই লিখন এঁটে 'শীফ'-এর ভিতর রাখা ততটা সুবিধাজনক নয়। কারণ, তার ফলে 'শীফ'-তালিকা ক্রমশঃ ফুলে ওঠে।

ছাপা ও হাতে লেখা তালিকা

ছাপা তালিকার উপর চিরকাল সাধারণের একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু আজকাল ছাপা তালিকার আর চলন নেই। কারণ, তালিকা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তা আর সময়োপযোগী থাকে না এবং নূতন বইয়ের লিখনকে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। উপরন্তু তালিকা ছাপার খরচ অনেক। তা ছাড়া, অর্থব্যয় করে অকেজো তালিকা রাখার কোন অর্থ হয় না। সে কারণে হাতে লেখা তালিকার চলনই এখন বেশী।

হাতে লেখা তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে এক ধরণের হাতের লেখা হ'লেই ভালো হয় এবং লেখা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার। তালিকা লেখবার হাতের লেখার ইংরেজী অক্ষরগুলি নিম্নরূপ হ'লে ভালো হয়ঃ



পুস্তকের জাতি-বিভাগের সঙ্গে তালিকার সম্বন্ধঃ জাতি-বিভাগের ফলে আমরা একখানি বইকে একটিমাত্র স্থান দিতে পারি। বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয় বহু হওয়া সব সময়েই সম্ভব। ধরুন, একখানি প্রবন্ধের বই। এই বইটির ভিতর বিভিন্ন বিষয়ের দশটি রচনা থাকতে পারে। বইখানিকে খুলে দশটি ভাগে বিভক্ত করে দশটি স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পুস্তকাগারে একখানির স্থানে দশখানি বই কেনাও সম্ভবপর নয়। কিন্তু বইটির ভিতর যে দশটি বিষয় আছে, তা পাঠককে জানতে দেওয়া দরকার। তা না হ'লে, বইয়ের বিষয়গুলির খোঁজ পড়বে না এবং বিষয়গুলির খোঁজ পাওয়াও সহজসাধ্য হবে না। বইখানির লিখনে বিষয়ের সূচী তো দিতেই হবে, তা ছাড়া যতগুলি বিষয় আছে, তালিকার ভিতর ততগুলি লিখন রাখতে হবে। এই কারণে তালিকাকে বলা হয় পুস্তকের জাতি-বিভাগের পরিপূরক।

যে-কয়েক প্রকারের পুস্তকতালিকার কথা আমরা বললাম, সেগুলি সবই সাধারণের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কোন সময় গ্রন্থাগারে কত বই আছে, তা জানবার প্রয়োজন হ'লে, কি দেখে তা বুঝতে পারা যাবে? লেখকের বা বিষয়ের তালিকা দেখে তা বোঝা যাবে না। কারণ, পুস্তকাগারের বইয়ের সংখ্যা অপেক্ষা তালিকায় লিখনের সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং পুস্তকাগারে সঞ্চিত সব বইয়ের হিসাব নিতে গেলে কেবল ঐ দুইটি তালিকার উপরই নির্ভর করা চলে না। উপরন্তু তালিকার সঙ্গে সঞ্চিত বইগুলি মেলাবেন কি করে? লেখকের তালিকার সঙ্গে বই মেলানো কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কারণ, বই সাজানো থাকে পুস্তকের জাতি-বিভাগের তালিকা অনুসারে, আর লেখকের তালিকা সাজানো থাকে বর্ণমালা অনুসারে। তবে বিষয়ের তালিকার সঙ্গে সঞ্চিত বইগুলি মেলানো কতকটা সম্ভবপর হ'তে পারে। কারণ, বিষয়ের তালিকা পুস্তকের জাতিবিচারের তালিকা অনুসারে সাজানো থাকে। কিন্তু তাতে লিখনের সংখ্যা অনেক বেশী বলে বিষয়ের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে সঞ্চিত বইয়ের রাশির হিসাব নেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

মঞ্চ-তালিকা

মজুত বইয়ের হিসাব নেওয়ার জন্য মঞ্চ-তালিকা রাখা হয়। পুস্তকের জাতিবিচারের তালিকা অনুসারে গ্রন্থাগারে মঞ্চের উপর বই সাজিয়ে রাখা হয়। প্রত্যেক বইয়ের একটি করে লিখন-সমেত একটি তালিকা রাখতে হয়। এই তালিকার দ্বারা মজুত বই মেলাবার সুবিধা হয়। কারণ, বই যেমনভাবে সাজানো আছে, লিখনগুলিও ঠিক তেমনিভাবেই সাজানো থাকে। বই মেলাবার সময় পুস্তক-মঞ্চে গিয়ে, একজন এক-একখানি বইয়ের নাম ডাকতে থাকবে, আর একজন লিখনের সঙ্গে বই মিলিয়ে যাবে। যে বইখানি পাওয়া যাবে না, সে বইখানির লিখনের উপর একটি × চিহ্ন দিলেই যথেষ্ট। পরে × চিহ্নগুলি গুণে নিলেই বোঝা যাবে, কতগুলি বই গ্রন্থাগারে নাই।

মঞ্চ-তালিকার সুবিধা ঃ মঞ্চতালিকার আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয়তা আছে ঃ

(১) এই তালিকা সঞ্চিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দেশ করে বলে এই তালিকার উপর নির্ভর করে পুস্তকসম্ভারের **বীমা** হয়।

(২) এই তালিকা থেকে যখন খুশি কোন একজাতীয় পুস্তকের তালিকা ছাপানো সুবিধাজনক হয়ে থাকে।

(৩) কোনো বিষয়ের পুস্তক-সংগ্রহের মূল্যের পরিমাণ কত, তা সহজেই বোঝা যায়।

(৪) কোনো বিষয়ের নূতন একখানি বই এলে সে বইখানি গ্রন্থাগারে আছে কিনা, তা সহজেই জানা যায়।

(৫) একই বইয়ের দুইটি নম্বর হ'য়ে গেল কি না, মঞ্চতালিকার সাহায্যে তা-ও নির্দ্ধারণ করবার সুবিধা হয়।

অনেকে হয়তো বলবেন, মঞ্চতালিকা থাকলেই তো হ'লো, বিষয়তালিকার আবার প্রয়োজন কি? কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। কারণ, মঞ্চতালিকা ও বিষয়তালিকা প্রায় এক। কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চতালিকার

যা-কিছু প্রয়োজন, তা পুস্তকাগারের কর্মীদের কাছে। বই সম্বন্ধে কর্মীদের যতটুকু প্রয়োজন, মঞ্চতালিকার লিখনে কেবল ততটুকুরই উল্লেখ থাকে। যেমন —লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম, বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম, বইপ্রকাশের তারিখ, প্রত্যেক বইয়ের ডাক-নম্বর (বিষয়-সংখ্যা+পুস্তক-সংখ্যা), প্রবেশ-সংখ্যা (ক্রমিক সংখ্যা) এবং পুস্তক কয়খণ্ডে সম্পূর্ণ ও কয়খানি পুস্তক আছে, তার সঙ্কেত।

বিষয়তালিকার লিখনে পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় আরও অনেক বেশী থাকে। যেমন ধরুন : বইয়ের কত পাতা, ছবি আছে কিনা, বইয়ের আকার, বিষয়-স্থচী, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিষয়তালিকায় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-নির্দেশের লিখন, দুইটি সমার্থক বা বিপরীতার্থবাচক নামের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের লিখন এবং আরো নানাবিধ লিখন থাকে।

এইসব কারণে মঞ্চতাকির সঙ্গে বিষয়তালিকার আংশিক মিল থাকলেও উভয় তালিকা সম্পূর্ণ এক নয় এবং একটির কাজ অপরটিকে দিয়ে চলে না।

পুস্তকের তালিকা পাঠকদের জন্যে বহু কষ্টে ও বহু খরচ করে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, পাঠকেরা বই নেবার আগে তালিকা বড় একটা খুঁজে দেখে না। বইয়ের তালিকার প্রয়োজন আছে, একথা কেউই অস্বীকার করবে না। তবে কোন তালিকা রাখলে, সেই তালিকা রাখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেই গ্রন্থাগার কি জাতীয়, তার উপর নির্ভর করে।

গ্রন্থ-তালিকা ও পাঠক : গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলেই যে গ্রন্থতালিকার কাজ শেষ হ'য়ে গেল, এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন। গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হ'লো পাঠকের জন্যে। এখন দেখতে হবে, পাঠক তা ব্যবহার করে কি না। তালিকার ব্যবহার যদি না হয়, তা হ'লে তালিকা প্রস্তুত করার কোন সার্থকতা থাকে না।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে দেখা যায়, তালিকা থাকা সত্ত্বেও তা পাঠকেরা ব্যবহার করে না। একশ' জনের মধ্যে নয় জনও গ্রন্থতালিকা ব্যবহার করে কিনা সন্দেহ। অথচ পাঠকের গ্রন্থতালিকা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা

প্রয়োজন। কারণ, কিরূপ বই পড়লে নিজের চাহিদা মিটবে, তা পাঠক যতটা বুঝবে, আর কেউই ততটা বুঝবে না।

পাঠক যে তালিকা ব্যবহার করে না, তার প্রধান কারণ কারণ হচ্ছে, তারা জানে না **কেন** তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তালিকার ভিতরে কি আছে, এবং **কেমন** করে তা ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারে মঞ্চের ভিতর পাঠকের প্রবেশাধিকার নেই। প্রবেশাধিকার থাকলে কিন্তু তালিকা-ব্যবহারের সমস্যার সমাধান করা আরো দুরূহ হ'য়ে পড়তো। তার কারণ, পাঠক পুস্তক-মঞ্চকেই চিন্‌তো বেশী, তালিকার ধার তারা ধারতো না।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আধুনিক গ্রন্থাগারে পুস্তকের তালিকা সাধারণতঃ দু'রকমের ঃ লেখকতালিকা ও বিষয়তালিকা। লেখকতালিকা-ব্যবহারে বিশেষ মুশকিল নেই এবং বিশেষ করে পাঠ্যতালিকা যদি প্রস্তুত করা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে পাঠককে এইটুকু জানাবার ব্যবস্থা করলেই চলবে যে, লেখকের নামে বইখানি খুঁজতে হ'বে। ভারতীয় লেখকের নাম তাঁর মূল নামে খুঁজতে হবে, উপাধি দিয়ে খুঁজলে চলবে না। যেমন—শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' খুঁজতে হ'লে, 'চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র'-নামে না খুঁজে, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'-নামে বইখানি খুঁজতে হবে। কিন্তু বিদেশী নাম হ'লে নামের শেষাংশ দিয়ে উদ্দিষ্ট বই খুঁজতে হবে। যেমন 'John Milton'-এ না খুঁজে, বই খুঁজতে হবে 'Milton John'-এ। একথাও পাঠকদের জানিয়ে দিতে হবে যে, প্রত্যেক কার্ডে একখানি মাত্র বইয়ের বিবরণ দেওয়া আছে। কার্ডগুলি একটির পর একটি দেখবার সময় কার্ডগুলিকে সরাতে হবে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ধারের দিক থেকে, উপরের দিক থেকে নয়। সময় সময় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, পাঠক কিভাবে পুস্তকতালিকা ব্যবহার করছে, এবং সময় সময় দেখিয়েও দিতে হবে, কেমন করে পুস্তকতালিকা ব্যবহার করতে হয়।

লেখকের নাম বহু রকমের হ'তে পারে। কোন সঙ্ঘের প্রকাশিত বই, গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বই—এ-সব বই কেমন করে খুঁজতে হবে, তাও পাঠককে জানাতে হবে। যেমন ধরুন, India Government-এর প্রকাশিত বই 'India' দিয়ে খুঁজতে হবে, Royal Asiatic Society of Bengal—গোড়াকার কথার প্রথম অক্ষরে খুঁজতে হবে। অবশ্য এ-সব ক্ষেত্রে Govt. ও Bengal দিয়ে খুঁজলেও পাঠক বইয়ের সন্ধান পাবে, কিন্তু তাতে তাকে খুঁজতে হবে বেশী।

পাঠক যেখানে লেখকের নাম জানে, সেখানে মুশকিল বিশেষ কিছু নেই। পাঠকের যদি কেবল বইয়ের নাম মনে থাকে, তা হ'লেও তাকে জানিয়ে দিলেই হ'লো যে, বইয়ের নামের গোড়াকার অক্ষরে দেখলেই চলবে। কিন্তু যেখানে পাঠকের বইয়ের নামও মনে নেই, লেখকের নামও মনে নেই, কেবল সে কি বিষয় পড়তে চায়, এইটুকু মাত্র সে জানে, সেখানে সমস্যা কঠিন। কারণ, বিষয়তালিকা একটু গোলমেলে ব্যাপার। বিষয়তালিকা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় না, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। অবশ্য বর্ণানুক্রমিকভাবে অভিধানের মত বিষয়তালিকা সাজালে একদিকে সমস্যার সমাধান হ'লেও, বিষয়তালিকার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ, তাতে বিষয়গুলির পরস্পরের সঙ্গে ধারাবাহিক সম্বন্ধ দেখানো হয়না। সেইজন্যে আমাদের বিষয়তালিকা সাজাবার নিয়মটা পাঠককে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। 'শিশু-মন' সম্বন্ধে কোন বই খুঁজতে হ'লে বইখানিকে মনস্তত্ত্বের মধ্যে খুঁজতে হবে এবং মনস্তত্ত্ব যে দর্শনের একটি অংশ, একথাও পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে একথাও জানাতে হবে যে, কার্ডগুলি সাজানো হয়েছে কার্ডের বাঁদিকে লেখা সংখ্যা অনুসারে। সুতরাং কোন্ বিষয়ে কি বই গ্রন্থাগারে আছে, তা জানতে হ'লে সেই বিষয়ের সংখ্যাটী জানতে হবে। এসব বিষয় জানাতে হ'লে আমাদের বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত ছক তালিকার দেরাজের উপর রাখা প্রয়োজন।

নিম্নের ছক-অনুযায়ী একটী বর্ণনা রাখলে কাজ চলে ঃ

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ... ... দেখ

গ্রন্থাগারে এমন কি বই আছে, যার—

(১) লেখকের নাম জানা আছে ?	লেখকতালিকায় লেখকের নামে দেখ।
(২) বিষয় জানা আছে ?	বিষয়তালিকায় বিষয়ের নামে দেখ।
(৩) বইয়ের নাম জানা আছে ?	বইয়ের নামের তালিকায় নামের গোড়ার অক্ষর অনুসারে দেখ।

গ্রন্থাগারে কি বই আছে—

(৪) কোন্ বিষয়ে ?	বিষয়তালিকায় বিষয়ের নামে দেখ।
(৫) কোন্ লেখকের ?	লেখকতালিকায় লেখকের নামে দেখ।
(৬) কোন্ লোক সম্বন্ধে ?	লোকের নামে দেখ।
(৭) কোন্ সিরিজের বই ?	সিরিজের নামে দেখ

এ ছাড়া আরো অনেক উপায় আছে। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে সে-সব কথা বলা চলে না।

তবে মনে রাখতে হবে, পাঠক যেন কোন বইয়ের খোঁজে তালিকা দেখার পূর্বে গ্রন্থাগারিকের কাছে বা গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে না আসে এবং এলেও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তালিকা থেকে তার বই খুঁজে বার করে দেওয়া দরকার। তাতে পাঠকেরও তালিকা ব্যবহার করতে শেখা হয় এবং গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও কাজ অনেকটা হালকা হয়।

সংক্ষিপ্ত তালিকা

আজকালকার গ্রন্থাগারে কত রকমের বস্তু যে আসে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু গ্রন্থাগারকে সবই যদি তালিকাভুক্ত করে তুলে রাখতে হয়, তা হ'লে

স্থানাভাবের সমস্যা শীঘ্রই দেখা দেবে, অথচ গ্রন্থাগার ভর্তি হ'য়ে যাবে কতকগুলি বাজে কাগজপত্র আর বইয়ে।

সেই জন্যে আজকালকার গ্রন্থাগারে সব কিছুই তালিকাভুক্ত করা হয় না। সব জিনিসই যদি লিখিতভাবে তালিকাভুক্ত করা যায়, তা হ'লে পুস্তকতালিকার কলেবরও ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে, অথচ গ্রন্থাগার ভরা থাকবে যত অকেজো লিখিত ও মুদ্রিত বস্তুর স্তূপে।

যে-সকল লিখিত ও মুদ্রিত বস্তুকে লেখকতালিকার মধ্যে রাখার প্রয়োজন হয় না, সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'লো :

(১) গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বলে যে-সব বই গ্রন্থাগার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ;

(২) যে-সব জিনিস গ্রন্থাগারে রেখে দেওয়া হয়, অথচ তালিকাভুক্ত করা হয় না ;

(৩) পুস্তিকা ও পুস্তিকার মত অল্পপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস।

এরূপ পুস্তিকাসমূহকে তালিকাভুক্ত করতে হয় একটি মাত্র শীর্ষকে।

পুস্তিকা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা : পুস্তিকা অর্থাৎ কোন বিষয়সম্বন্ধীয় এরূপ ছোটখাটো অল্পপ্রয়োজনীয় চটি বইগুলি একটি কাগজের বাক্সের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভুক্ত বইয়ের দলের শেষে রাখতে হয়। একসঙ্গে রাখার বিপদ আছে। কারণ, ভারী বইয়ের চাপে পুস্তিকাগুলি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

এমন অনেক পুস্তিকা থাকতে পারে, যার খোঁজ পড়তে পারে লেখকের নামে। সে-সব ক্ষেত্রে পুস্তিকাকে সাধারণ বই হিসাবে ধরে নিয়ে লেখকের নামে একখানি কার্ড করা প্রয়োজন।

যে-সব বই বা পুস্তিকা অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে, সেগুলির লেখকতালিকা ও বিষয়তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেওয়া সাধারণতঃ সম্ভবপর নয়। তার কারণ, তালিকা কিরূপ হবে—না হবে, তা নির্ভর করবে

গ্রন্থাগার ও পাঠকের উপর। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে সংক্ষিপ্ত তালিকার দ্বারা অনেক সময়-সংক্ষেপ করা যায় এবং তালিকার কলেবরও মিছামিছি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না।

অনেকেই গ্রন্থাগারে বই দান করেন। দান হিসাবে প্রাপ্ত বই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরানো হ'য়ে থাকে এবং গ্রন্থাগারে যে-সব বইয়ের নতুন সংস্করণ থাকবে, সে-সব বইয়ের পুরাতন সংস্করণ আরো দু'-এক কপি রেখে কোনো লাভ নেই। কারণ, সে-সব বই অচল। পাঠক যখন নতুন সংস্করণের বই চাইবে, তখন তাকে পুরাতন সংস্করণের একখানি বই বার করে দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই এবং ঠিক এই কারণেই আজকালকার গ্রন্থাগার থেকে মাঝে মাঝে অকেজো বই বাতিল করার প্রয়োজন হয়।

সংক্ষিপ্ত তালিকার সুবিধা-অসুবিধা ঃ সংক্ষিপ্ত তালিকাপ্রকরণের ভালোমন্দ দু'টি দিকই আছে। পাঠকের জন্যই যখন তালিকা প্রস্তুত করা হয়, এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগারে যখন পাঠকের চাহিদা সম্পর্কে অনুমান করা প্রায় অসম্ভব, তখন কোন্ বইখানির সম্পূর্ণ তালিকা করতে হবে, আর কোন্ কোন্ বইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা করলে চলবে, তা নির্ণয় করা কঠিন। সে-ক্ষেত্রে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব, তবে সংক্ষিপ্ত তালিকার ভালোর দিকটা বিবেচনা করলে, উপরের ঝুঁকিটুকু নেওয়া যে বিশেষ অসঙ্গত হবে, তা মনে হয় না।

আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে এক মাত্র গ্রন্থাগারিক ছাড়া কাজ করবার লোক আর থাকে না। এই গ্রন্থাগারিককে একাই সব কাজ করতে হয়। তাকে যদি প্রত্যেক বইখানির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে হয়, তা হ'লে তার আর কোনো কাজ করবার সময় থাকে না। অথচ তার আরো অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করবার আছে. যেমন ঃ পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, পাঠককে প্রার্থিত ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে,—সেই সঙ্গে তালিকার কলেবরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তালিকা রাখবার স্থানের সংকুলান হওয়াও শেষ পর্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হ'য়ে পড়বে। আজকালকার গ্রন্থাগারে এ-সমস্যার সমাধান করাও কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই ভালোমন্দ দু'টি দিক বিচার করে দেখলে বলতে হয়, অন্ততঃ গ্রন্থাগারের মুখের দিকে চেয়ে তালিকা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন আছে।

তালিকা-প্রকরণ ঃ ব্যবহারিক দিক

এইবার আমরা তালিকা-প্রকরণের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসে পড়লাম।

পুস্তকাগারের কাজ হচ্ছে সমাজের একটি অঙ্গের মত সমাজের সেবা করা। পুস্তকের তালিকা পুস্তকাগারে রাখা হয় সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্যে। সুতরাং তালিকার প্রয়োজনের **প্রথম কথা** হচ্ছে—**যেমন পাঠক, তেমনি তালিকা হওয়া চাই।** অর্থাৎ যে-অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপিত, সেই অঞ্চলের পাঠকদের উপযোগী করে পুস্তকের তালিকা তৈরী হওয়া চাই। তালিকার প্রয়োজনীয়তার **দ্বিতীয় কথা** হচ্ছে—**যেমন পুস্তকারগার, তালিকাও তেমনি হওয়া চাই।** অর্থাৎ পুস্তকাগারে সঞ্চিত জ্ঞানরাশির ব্যবহার পুস্তকের তালিকার সাহায্যে যাতে ভালোভাবে করা যেতে পারে, সে-কথা তালিকা প্রস্তুত করবার পূর্বে ভেবে দেখতে হবে।

ধরুন, আপনার গ্রন্থাগারে 'উই' সম্বন্ধে কতকগুলি বই আছে। বিষয়ের তালিকা তৈরী করবার সময় যদি আপনি বিষয়ের নাম হিসাবে 'উই' কথাটি ব্যবহার না করে 'বল্মীক' কথাটি ব্যবহার করেন, তা হ'লে শতকরা ৯৯ জন তা খুঁজে পাবে না। কারণ, 'বল্মীক' কথাটার সঙ্গে সকলের পরিচয় না থাকতে পারে। আপনার পাঠকরা বিদ্বান গোষ্ঠীর হ'লে, 'বল্মীক' কথাটি ব্যবহার করা চলে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে 'উই' কথাটি ব্যবহার করাই ভালো।

বিষয়তালিকার **তৃতীয় কথা** হচ্ছে, বিষয়ের নাম হিসাবে এমন কথা ব্যবহার করতে হবে, যা বিষয়টিকে মাত্র বোঝাবে, তার বেশী বা কম কিছু বোঝাবে না। অর্থাৎ বিষয়টি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই। তালিকা-প্রস্তুতকারকের পক্ষে এইরূপে সুনির্দ্দিষ্ট কথা ব্যবহার করবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কোন একটী তৈরী-করা বিষয়শীর্ষক ব্যবহার করা। এরূপ বিষয়-শীর্ষকের বই কিনতে পাওয়া যায়।

লিখনে উল্লেখের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

এইবার পুস্তকের কোন্ কোন্ অংশ বইয়ের লিখনে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, দেখুন :

(১) **প্রচ্ছদপটে উল্লিখিত নাম :** এই নামটি পুস্তকের বাঁধাই-করা মলাটের উপর মুদ্রিত থাকে। লিখনের পক্ষে এ-নামের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে যদি বইয়ের নামের পাতার নাম থেকে মলাটের নাম পৃথক হয়, তা হ'লে সে বিষয় লক্ষ্য করা ভালো। কারণ, কোন কোন পাঠক কেবল মলাটের নাম মনে রাখতে পারে।

(২) **দপ্তরীর ছাপা নাম :** এই নামটি বইয়ের 'পুটে' বা শিরদাঁড়ায় ছাপা থাকে। এই নামটি যদি নামের পাতার নাম থেকে পৃথক হয়, তা হ'লে মুশকিল হয়। কারণ, তালিকা হবে নামের পাতার নাম অনুসারে। পাঠক সেই নামেই বই চাইবে। কিন্তু শিরদাঁড়ায় অন্য নাম থাকলে মঞ্চে বইখানিকে চেনা যাবে না এবং খুঁজে বার করা যাবে না।

(৩) **অর্ধনাম :** এই নামটী নামের পাতার আগের পাতায় থাকে। এর কোনো প্রয়োজন নেই।

(৪) **সিরিজের নাম :** সিরিজের প্রয়োজন কি, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবে কোন কোন সিরিজের নাম লিখনে ব্যবহার না করলেও চলে।

(৫) **নামপত্র** বা **নামের পাতা :** বই আরম্ভ হ'বার আগের পাতায় সাধারণতঃ বইয়ের নাম, লেখকের নাম, সংস্করণ, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা এবং প্রকাশের স্থান ও তারিখ ছাপা থাকে। আজকাল অনেক বইয়ের নামের পাতার পিছনেও প্রকাশের তারিখ ও সংস্করণের উল্লেখ থাকে। নামের পাতার নামই বইয়ের আসল নাম। সুতরাং এই নাম লিখনের উপর ব্যবহার করা দরকার।

(৬) **প্রণেতা বা লেখক :** কোন পুস্তকের অস্তিত্বের যিনি মূল কারণ, অর্থাৎ যিনি পুস্তকের সৃষ্টির মূলে থাকেন, পুস্তকের সেই লেখককে গ্রন্থকার বা

পুস্তকপ্রণেতা বলা হয়। প্রণেতা বা লেখকের নাম পাঠকের কাছে অতি প্রয়োজনীয়।

(৭) **সংস্করণ :** বইয়ের সংস্করণ অতি প্রয়োজনীয়। একখানি বই একবারের অধিক ছাপা হলেই তাকে সংস্করণ বলা হয় না, তাকে বলা হয় 'পুণমু্দ্রণ'। বইয়ের বিষয়বস্তুর কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বা সংক্ষেপ করা হ'লে, তবেই তাকে সংস্করণ বলা হয় এবং সেই সঙ্গে বইখানির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে।

(৮) **প্রকাশের স্থান :** নামের পাতার নীচের দিকে প্রকাশ-স্থানের উল্লেখ থাকে। সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রকাশের স্থান অপ্রয়োজনীয়।

(৯) **প্রকাশকের নাম :** নামের পাতার নীচের দিকে এবং অনেক সময় তার পিছন দিকেও প্রকাশকের নাম থাকে। প্রকাশকের নামের উপর অনেক সময় বইয়ের মূল্য নির্ভর করে। সেইজন্যে প্রকাশকের নামের প্রয়োজন আছে।

(১০) **প্রকাশের তারিখ :** সকলপ্রকার বইয়ের লিখনে প্রকাশের তারিখ একান্ত আবশ্যক। লিখনে তারিখ থাকা চাই। নামের পাতায়, নামের পাতার পিছনে, বইয়ের শেষে যদি তারিখ না থাকে তা হ'লে মুখবন্ধের তারিখ, তাও যদি না থাকে, তাহ'লে স্বত্বসংরক্ষণের তারিখ দিতে হয়। কোনো উপায়েই তারিখ পাওয়া না গেলে, আন্দাজের উপর নির্ভর করেও একটা তারিখ দিতে হয়।

(১১) **পাতার শীর্ষক নাম** (চল্‌তি নাম) : বইয়ের নাম সাধারণতঃ প্রতি পাতার উপরে ব্যবহৃত হয়। বইয়ের প্রথমের নামপত্রের অভাবে এই নাম ব্যবহার করতে হয়।

(১২) **মুখবন্ধ :** বই আরম্ভ হবার আগে মুখবন্ধ বা ভূমিকা থাকে। মুখবন্ধে বইয়ের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তালিকা-প্রস্তুতকারকের পক্ষে বইয়ের বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার জন্যে মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে।

(১৩) **সূচীপত্র ঃ** সূচীপত্র তালিকা-প্রস্তুতকারকের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

(১৪) **পাতা, ছবি, খণ্ড ঃ** সাধারণ পুস্তকাগারের বইয়ের লিখনে পাতা, ছবি বা খণ্ডের উল্লেখের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এমন অনেক বই আছে, যার লিখনে ছবিরও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন ধরুন, ভ্রমণের বই, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের বা ফলিত বিজ্ঞানের বই, ভূগোল, দেশবিদেশের রীতিনীতি-সম্বন্ধীয় বই।

(১৫) **আকার ঃ** বেশী বড় বা বেশী ছোট বই হ'লে বইয়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ

আমরা পূর্বে বারবার বলেছি যে, পুস্তকের তালিকা করা হয় পাঠকের জন্যে। সুতরাং তালিকা যাতে পাঠকের প্রয়োজনানুরূপ হয়, সে-দিকে সব সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তালিকা আমাদের কেবল বোধগম্য হ'লে চলবে না, পাঠকেরও বোধগম্য হওয়া চাই। সেইজন্যে যখনই তালিকা প্রস্তুত করা হবে, তখনই তালিকা-প্রস্তুতকারককে মনে রাখতে হবে যে, সে নিজেই পাঠক ; তা হ'লে আর পুস্তকের তালিকা-প্রস্তুতের ব্যাপারে ভুল হবে না।

আর একটা কথা এখানে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেবল বই জড়ো করে রাখলেই গ্রন্থাগার হয় না, বইয়ের ব্যবহার হওয়া চাই এবং পাঠকের দ্বারা উপযুক্তভাবে বইয়ের ব্যবহার করিয়ে নিতে গেলে, গ্রন্থাগারে কি আছে—না আছে, তা পাঠককে জানাতে হবে। সেইজন্যে গ্রন্থাগার যত বেশী ছোট হবে, তালিকা তত বেশী সম্পূর্ণ করতে হবে। কারণ, পাঠককে কিছু না কিছু দিতে যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। "নেই" বললে পাঠক বিরক্ত হ'য়ে যাবে, সে আর গ্রন্থাগারে আসবে না। ধরুন, এমন একখানি বই আপনার গ্রন্থাগারে আছে, যাতে দশটি বিষয় সম্বন্ধে দশটি প্রবন্ধ আছে। সেই বইখানির তালিকা এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে পাঠক তালিকা থেকে দশটি প্রবন্ধের

কথাই জানতে পারে। এরূপ তালিকা প্রস্তুত করাকে বলা হয় **'বিষয়-বিশ্লেষণ'**, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবন্ধের একটি করে বিষয়-লিখন লেখা প্রয়োজন।

ধরুন, মোহিতলাল মজুমদারের **'বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন'**। এই পুস্তকে বিদেশী লেখকের কয়েকটী প্রবন্ধ সঞ্চয়ন করা আছে। এই বইখানির লিখন লিখতে গেলে বইখানির একখানি সাধারণ লিখন লিখতে হবে, উপরন্তু প্রত্যেক লেখকের নামে একটী করে লিখন লিখতে হবে। এইরূপ লিখনকে বলা হয় **'লেখক-বিশ্লেষণ'**।

অনেক সময় কোন কোন বইয়ের **'নাম-বিশ্লেষণ'**-এর প্রয়োজন হয়—বিশেষ করে যে-সব বইয়ের দু'টি নাম থাকে এবং সেই দু'টি নাম 'বা' অথবা 'কিংবা' দিয়ে সংযুক্ত করা থাকে।

আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ও পাঠক অনুসারে যে তালিকা প্রস্তুত করতে হয়, সে-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু একটি নিয়ম সব সময় মেনে চলা প্রয়োজন এবং সেই নিয়ম-অনুযায়ী লিখন লেখা উচিত। যেমন ধরুন, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামে যদি শরৎচন্দ্রের কোন বইয়ের 'লেখক-লিখন' লেখা হয়ে থাকে, তা হ'লে শরৎচন্দ্রের যত বই আছে, সে-সব বইয়ের 'লেখক-লিখনে'ও ব্যবহার করতে হবে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। 'শরৎচন্দ্র' নামের পরিবর্তে 'শরচ্চন্দ্র' বা 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' লিখলে চলবে না। অবশ্য ভ্রমক্রমে শরৎচন্দ্রকে 'শরচ্চন্দ্র' নামেও কেউ খুঁজতে পারে। তালিকার ভিতরে সে-ব্যবস্থাও করে রাখা প্রয়োজন। সে-ক্ষেত্রে 'শরৎচন্দ্র' থেকে 'শরচ্চন্দ্রে' একটি **'দেখুন লিখন'** করে রাখা দরকার।

তালিকা প্রস্তুত করবার জন্যে ছাপা নিয়মাবলী কিনতে পাওয়া যায়। এই ছাপা লিখনের নাম 'A. L. A. Codes'*। গ্রন্থাগারের কাজের সুবিধার জন্যে এই ছাপা বই একখানি হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, **এই নিয়মই চরম নয়, নিয়ম সব সময় নির্ভর করবে গ্রন্থাগার**

* পরিশিষ্ট দেখুন।

ও পাঠকের প্রয়োজনের উপর। কারণ, সোজা কথায় বলতে গেলে, আপনার ব্যবসায় বইয়ের, আপনার কারবার পাঠক নিয়ে এবং প্রত্যেক বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে পাঠকের প্রয়োজনানুসারে। কোন বই সম্বন্ধে আপনার মতামতের কোন মূল্য নেই, পাঠকের মতামতই সব। পাঠক বই বেছে নেবে, আর আপনি কেবল ধরে দেবেন তার সামনে আপনার যা আছে।

'লিখন'-এর শ্রেণীবিভাগ

এইবার আমরা পুস্তকের কত প্রকারের লিখন হ'তে পারে এবং সেই-সব লিখন কিরূপে লিখতে হয়, সে কথা আরম্ভ করতে পারি।

এক-একটি লিখনের নামকরণ করা হয় লিখনের প্রথমে 'অন্তর্ভুক্ত' বিষয়টি অনুসারে :

(ক) লিখনের প্রথম বিষয় যদি হয় 'লেখক', তা হ'লে সে-লিখনের নাম হবে **'লেখক-লিখন'** বা **'প্রধান লিখন'** ; কারণ, এই লিখন অনুসারে অন্য লিখন লিখতে হবে।

(খ) লিখনের প্রথম বিষয় যদি হয় বইয়ের নাম, তা হ'লে তার নাম হবে **'নাম-লিখন'**। সব বইয়ের এই লিখন লেখবার প্রয়োজন হয় না। উপন্যাস, গল্প, কাব্য বা কবিতা-সংগ্রহ, নাটক—এই সব বইয়ের এবং অদ্ভুত ধরণের নামের বইয়ের (যেমন 'ভারত পথিক') 'নাম-লিখন' লেখবার প্রয়োজন হয়।

(গ) লিখনের প্রথম বিষয়টি যদি হয় 'বিষয়', তা হ'লে সে-লিখনকে বলা হয় **'বিষয়-লিখন'**। অন্য যে-কোন লিখন অপেক্ষা এই 'বিষয়-লিখন'টি কঠিন। কেন কঠিন, সে কথা আমরা পরে বলবো।

(ঘ) যে-লিখনের প্রথম বিষয় কোন 'সিরিজ'-এর নাম, সে লিখনকে বলা হয় **'সিরিজ-লিখন'**।

(ঙ) যে-লিখন দ্বারা কোন একটি বিষয় থেকে আর একটি বিষয়ে, লেখকের একটি নাম থেকে সেই লেখকের অন্য নামে, কিংবা অন্য লেখকের নামে, বইয়ের একটি নাম থেকে বইয়ের অন্য নামে পাঠককে 'দেখুন' কথাটির দ্বারা পরিচালিত করা হয়, তাকে বলা হয় **'দেখুন লিখন'**। 'দেখুন লিখন' ছাড়া সময় সময় **'আরো দেখুন লিখন'** লেখবারও প্রয়োজন হয়।

এই লিখনগুলির ইংরেজী পরিভাষা দেওয়া হ'লো:

লিখন—Entry
লেখক-লিখন—Author entry or Main entry
নাম-লিখন—Title entry
বিষয়-লিখন—Subject entry
সিরিজ-লিখন—Series entry
দেখুন লিখন—See reference
আরো দেখুন লিখন—See also reference
বিশ্লেষণ-লিখন—Analytic entry
লেখক-বিশ্লেষণ—Author analysis
বিষয় „ — Subject „
নাম „ — Title „

পুস্তকের শেষে পুস্তকের তালিকা-সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ পরিভাষা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন 'লিখন'-এর নিয়মাবলী

এক-একটি লিখন কিরূপে লিখতে হয়, এইবার আমরা তার বিশদ বর্ণনা দেব:

(ক) লেখক-লিখন

লেখকের নাম বহু প্রকারের হ'তে পারে:

(১) এক বা একাধিক পুস্তকের প্রণেতা হিসাবে কোন লেখকের ব্যক্তিগত নামের পরিচয় ছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক সম্পর্কে সেই লেখকের বিভিন্ন পরিচয়

থাকতে পারে। যেমন, তিনি তাঁর মৌলিক পুস্তক ছাড়াও অন্য কোন পুস্তকের লেখক হ'তে পারেন, অনুবাদক হ'তে পারেন, সম্পাদক হ'তে পারেন, আবার সঙ্কলয়িতাও হ'তে পারেন।

(২) লেখক কোন ছদ্ম নামে বই লিখতে পারেন।

(৩) লেখক নাম না দিয়ে অর্থাৎ নাম গোপন রেখেও বই লিখতে পারেন।

(৪) একাধিক লেখক যুক্তভাবে একই বই লিখতে পারেন।

(৫) কোন লেখক মাসিক পত্রিকা, অভিধান, বর্ষপঞ্জী, ইত্যাদি সম্পাদন বা সংকলন করতে পারেন।

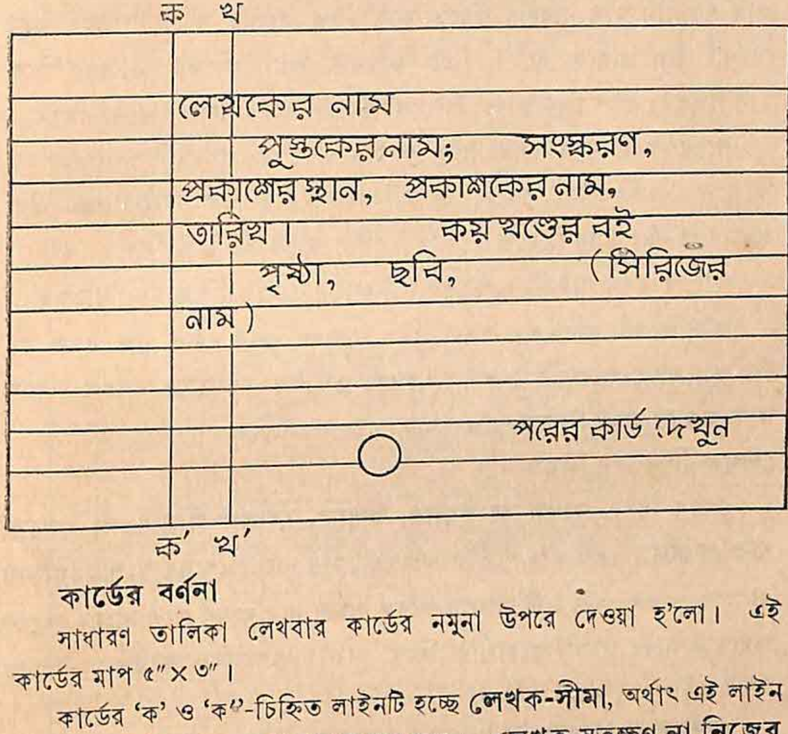
(৬) ধর্মপুস্তক, আরব্য-রজনী, গীতা, ইত্যাদি বইয়ে লেখকের একটা নাম পাওয়া গেলেও কিন্তু তাঁরাই যে গ্রন্থের সত্যিকারের প্রণেতা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৭) কোন সঙ্ঘ, সংস্থা বা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুস্তক-পুস্তিকাসমূহ প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

ব্যক্তিগত নামের লিখনঃ ব্যক্তিগত নামের লিখন সম্বন্ধে বলবার পূর্বে প্রধান লিখন লেখবার একটি সাধারণ নমুনা দিলে কাজের সুবিধা হবে। কারণ, প্রধান লিখন লেখবার সময় এই সাধারণ লিখনটিকে সামনে রাখলে লিখন লেখায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

একখানি বইয়ের কোন্ কোন্ অংশ পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয়, তা আমরা পূর্বে বলেছি। এখানে তা আর বলার প্রয়োজন নেই। তবে এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, সাধারণ পাঠকের কাছে লেখকের নাম, বইয়ের নাম ও বইয়ের ছাপার তারিখ—এইগুলির প্রয়োজন বেশি। সুতরাং কোন লিখনে এই বিষয়গুলি দিতেই হবে এবং জনসাধারণের ছোটখাটো গ্রন্থাগারে এই বিষয়গুলি লিখনে দিলেই যথেষ্ট। তবে, বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা, বইয়ের আকারের মাপ ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। কিন্তু একখানি বইয়ের এ-সব পরিচয় দিলেন, অথচ অন্য বইয়ের দিলেন না, এমন করা উচিত নয়।

লিখনের সাধারণ নমুনা



কার্ডের বর্ণনা

সাধারণ তালিকা লেখবার কার্ডের নমুনা উপরে দেওয়া হ'লো। এই কার্ডের মাপ ৫"×৩"।

কার্ডের 'ক' ও 'ক''-চিহ্নিত লাইনটি হচ্ছে **লেখক-সীমা**, অর্থাৎ এই লাইন থেকে লেখকের নাম লেখা স্রুরু করতে হবে। **লেখক যতক্ষণ না নিজের স্থান অধিকার করছে, ততক্ষণ লেখকের ঘরে কিছুই লেখা হবে না**। অবশ্য যে-সব বইয়ের লেখক নেই, বা যে সব বইয়ে লেখকের নামের উল্লেখ নেই, সে-সব বইয়ের কথা ভিন্ন।

উপরে প্রদর্শিত কার্ডের নমুনায় 'খ' ও 'খ''-চিহ্নিত স্থান বরাবর যে লাইনটি রয়েছে, তা হ'লো **'নাম-সীমা'**, অর্থাৎ ঐস্থান থেকে বইয়ের নাম লেখা স্রুরু করতে হবে।

কার্ডের নীচের দিকে একটী ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রটী হচ্ছে ট্রে'র ডাণ্ডার সঙ্গে কার্ডখানিকে আটকে রাখবার জন্যে। কার্ডে যা কিছু লেখা হোক, ঐ

ছিদ্রের উপরে তা শেষ করতে হবে। সমস্ত লেখা একখানি কার্ডে না আঁটলে আর একখানি কার্ড ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু আগের কার্ডে "পরের কার্ড দেখুন" বলে রাখতে হবে। এই কয়েকটি কথা কার্ডের নীচের দিকে ডান পাশের কোণে লিখতে হয় (আগের পৃষ্ঠায় 'লিখনের সাধারণ নমুনা' দেখুন)।

পরের কার্ড যখন লেখা স্থরু করবেন এবং সে-লেখা যদি পূর্বানুবৃত্তি হয়, তা হ'লে 'লেখক-সীমা' থেকে, প্রথম লাইন ছেড়ে স্থরু করতে হবে এবং প্রথম লাইনটির উপর লিখতে হ'বে '২', তৃতীয় কার্ডে '৩' ইত্যাদি।

কার্ডের প্রথম লাইনটি ও পাশের দু'টি লাইন লাল কালিতে টানা থাকে।

কার্ড পাতলা অথচ শক্ত হওয়া চাই। কারণ, কার্ড বেশি পুরু হ'লে ট্রে শীঘ্র ভরে যাবে, আবার কার্ড শক্ত না হ'লে তা শীঘ্র নষ্ট হ'য়ে যাবে। এরূপ কার্ড বাজারে যথেষ্ট কিনতে পাওয়া যায়।

লেখক-লিখনের নিয়ম

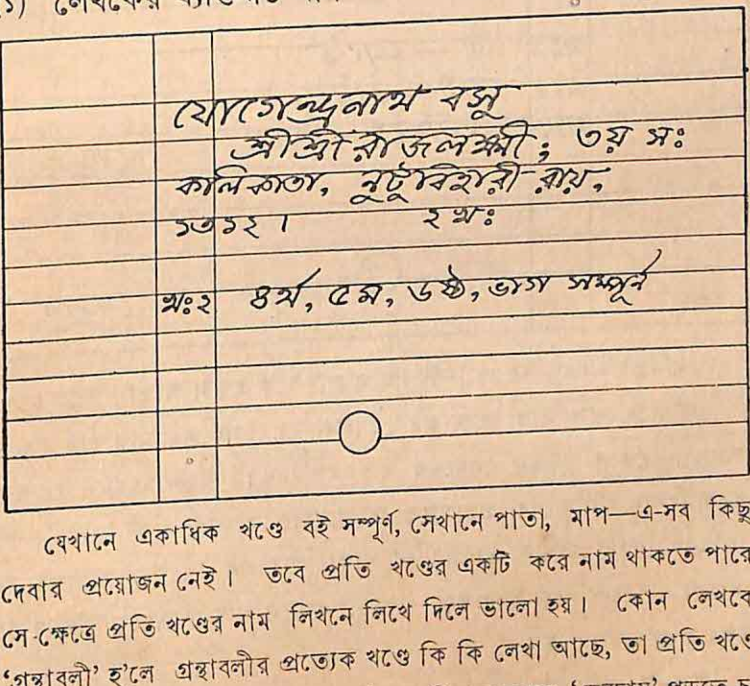
লেখক-লিখন **প্রথম লাইনের উপরে, লেখক-সীমারেখা থেকে স্থরু করুন**। দেশী নাম ব্যতীত অন্য যে-কোন নামের শেষের অংশটি গোড়ায় ব্যবহার করুন এবং দু'টি অংশের অধিক অংশে নাম সম্পূর্ণ হ'লে নামের শেষের অর্থাৎ উপাধির অংশটি পুরোপুরি লিখে বাকী অংশগুলির আদ্যক্ষর ব্যবহার করুন, যেমন—Cole, G. D. H.

দেশী নাম পুরোপুরি লিখুন। 'প্রমথনাথ বিশী'র পরিবর্তে 'প্রমথ না বি' লিখবেন না। এক লাইনে লেখকের নাম না ধরলে নামের অবশিষ্টাংশ পরের লাইনে নিয়ে আস্থন, কিন্তু **'নাম-সীমা' থেকে স্থরু করুন**।

লেখকের নাম লেখা শেষ হ'লে **বইয়ের নাম লেখা স্থরু করুন নাম-সীমারেখা থেকে ⅛" ছেড়ে**। এক লাইনে নাম না আঁটলে পরের লাইনে বইয়ের নামের অবশিষ্টাংশ নিয়ে যান এবং এখন ⅛" না ছেড়েই লিখে যান। বইয়ের নাম লেখা শেষ হ'লে, বইখানির একাধিক সংস্করণ হ'য়ে থাকলে, যত সংস্করণ হয়েছে, তা লিখুন : ২য় সং, ৩য় সং ইত্যাদি। সংস্করণের

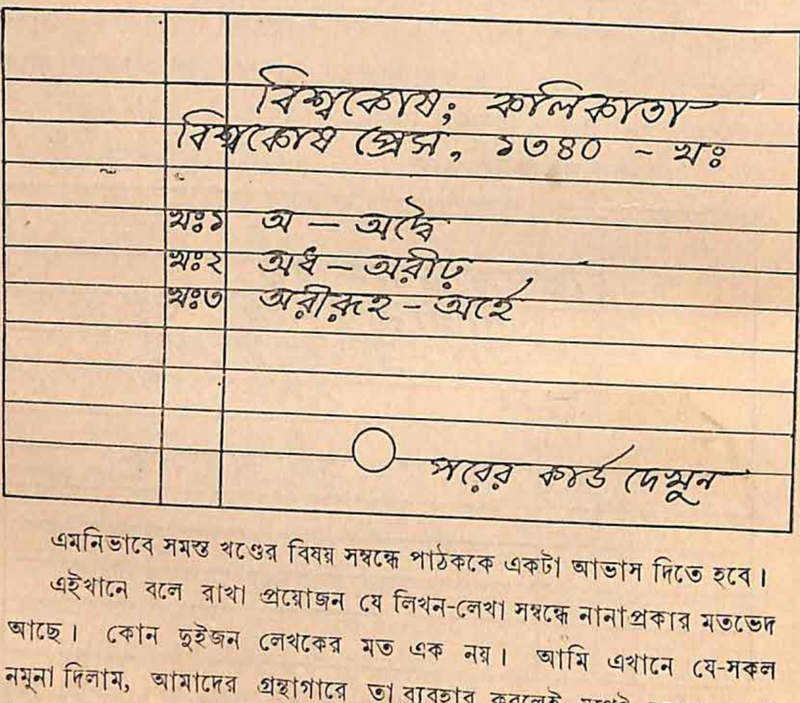
পর ১/৪″ জায়গা ছেড়ে লিখুন—প্রকাশের স্থান, তারপর ১/৪″ জায়গা ছেড়ে প্রকাশকের নাম এবং শেষে পূর্ণচ্ছেদের পর বইখানি যত খণ্ডে সম্পূর্ণ, তা লিখুন ঃ ২ খণ্ড, ৩ খণ্ড, ৪ খণ্ড ইত্যাদি। বইখানি কয় খণ্ডে প্রকাশিত, তা জানা না থাকলে শুধু লিখুন—খণ্ড। কোন একখানি বিশেষ খণ্ডের তালিকা করতে হ'লে কোন্ খণ্ডের তালিকা লিখলেন, তা সব লেখার পর বাঁ-ধারের দুইটি লাইনের মাঝখানে লিখুন। নমুনা ঃ

(১) লেখকের ব্যক্তিগত নাম



যেখানে একাধিক খণ্ডে বই সম্পূর্ণ, সেখানে পাতা, মাপ—এ-সব কিছুই দেবার প্রয়োজন নেই। তবে প্রতি খণ্ডের একটি করে নাম থাকতে পারে। সে-ক্ষেত্রে প্রতি খণ্ডের নাম লিখনে লিখে দিলে ভালো হয়। কোন লেখকের 'গ্রন্থাবলী' হ'লে গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক খণ্ডে কি কি লেখা আছে, তা প্রতি খণ্ডের সঙ্গে লেখা প্রয়োজন। কারণ, পাঠক যদি শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পড়তে চায় এবং সে যদি শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকেই 'দেবদাস' পড়তে চায়, তা হ'লে তাকে জানানো প্রয়োজন, গ্রন্থাবলীর কোন্ খণ্ডে 'দেবদাস' আছে।

অভিধানের ক্ষেত্রেও এইরূপ নিয়মানুসরণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ লিখনের মধ্যেই পাঠককে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, কোন্ খণ্ডে কোন্ অক্ষর থেকে কোন্ অক্ষর পর্যন্ত আছে। যেমন:



এমনিভাবে সমস্ত খণ্ডের বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে একটা আভাস দিতে হবে।

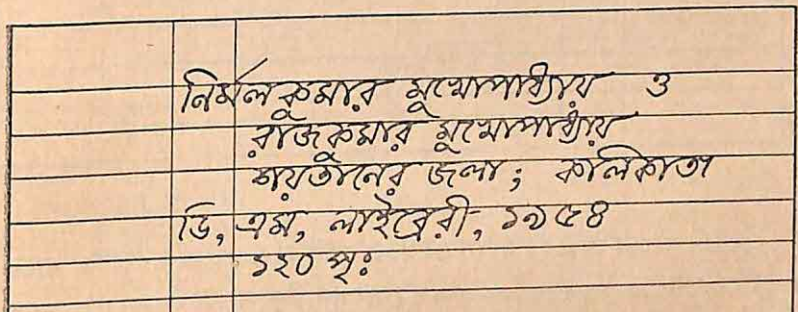
এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে লিখন-লেখা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। কোন দুইজন লেখকের মত এক নয়। আমি এখানে যে-সকল নমুনা দিলাম, আমাদের গ্রন্থাগারে তা ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হবে। তবে লিখনের একটা মান বা standard থাকা প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন, তা আমরা এ-বইয়ের মধ্যে স্থানান্তরে বলেছি, এখানে আর সে সম্বন্ধে বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন নেই।

ইদানীং বই জমা দেওয়া সম্বন্ধে যে আইন (Book Delivery Act) হয়েছে, সে আইনের ফলে লিখনের standardisation পরে একান্তপ্রয়োজনীয় হবে।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। লিখনের মধ্যে যে 'ছেদ' গুলি (punctuations) দেওয়া হয়েছে, তার নিয়ম হচ্ছে ব্যাকরণের নিয়মের মতই। তবে এই ছেদগুলি নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে লিখনের মধ্যে পাঠকের জানবার মত বিষয়গুলি দেওয়া হ'লো কিনা, সে সম্পর্কে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

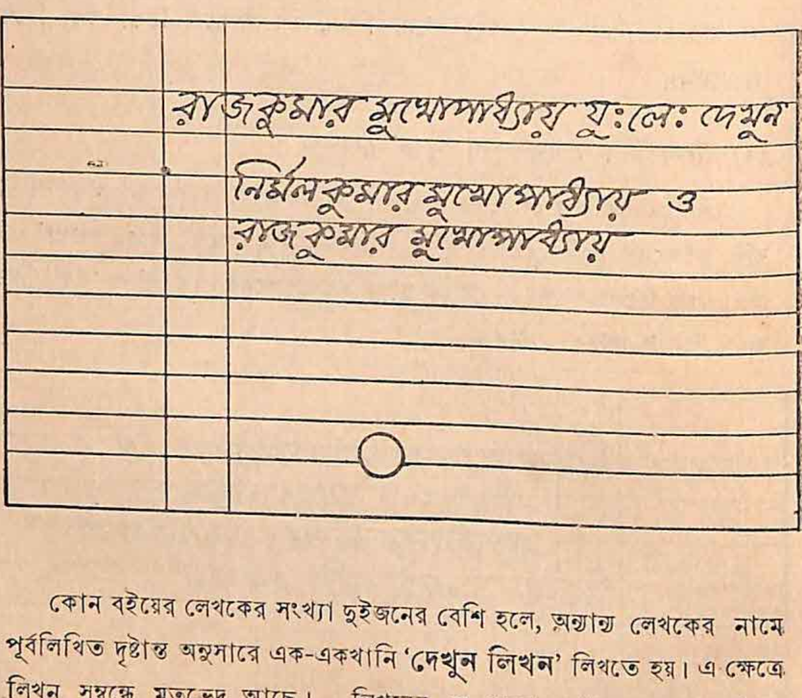
(২) একাধিক লেখক বা 'যুক্ত' লেখক

যেখানে একাধিক লেখকের দ্বারা বই লিখিত হয়েছে, সেখানে লেখক-সংখ্যা যদি দুইজনের বেশি হয়, তা হ'লে একজনের নাম লিখে 'এবং অন্যান্য' এই কথা জুড়ে দিলেই হ'লো। লেখক দু'জন হ'লে দুজনের নাম 'ও' বা 'এবং' দিয়ে জুড়ে লিখতে হবে। যেমন :



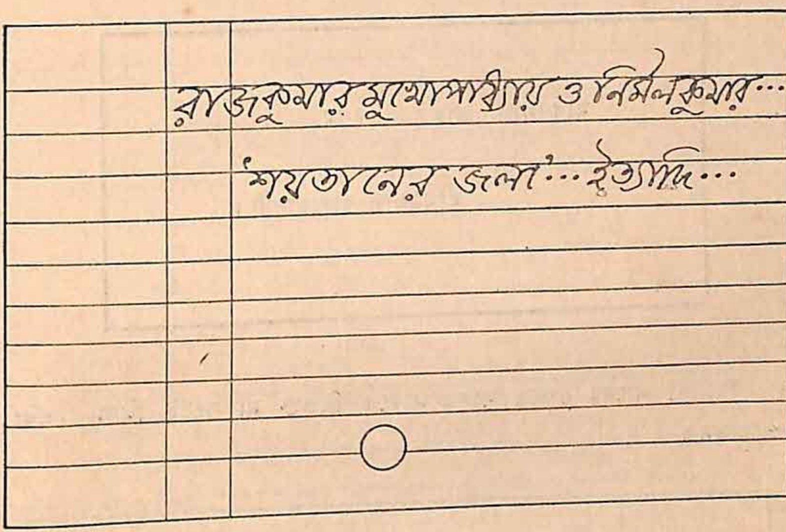
এরূপ ক্ষেত্রে কেবল ঐ একটি লিখন লিখলেই কাজ শেষ হবে না। কারণ, কোন পাঠক হয়তো কেবলমাত্র দ্বিতীয় লেখকের নামই জানে এবং সেই

নামটিতেই সে প্রথমে বইখানি খুঁজতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাম দিয়ে নিম্নলিখিতভাবে আর একখানি কার্ড লেখা দরকার :



কোন বইয়ের লেখকের সংখ্যা দুইজনের বেশি হলে, অন্যান্য লেখকের নামে পূর্বলিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে এক-একখানি '**দেখুন লিখন**' লিখতে হয়। এ ক্ষেত্রে লিখন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। লিখনের যে নমুনা এখানে দেওয়া হ'লো, তা যথেষ্ট নয়। কারণ, দু'জন লেখকের মধ্যে কোন একজন লেখক অন্য আর একজন লেখকের সঙ্গে একযোগে কোন বই লিখতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মে লিখন লিখলে পাঠক যে বইখানি সন্ধান করছে, সেই বইখানি সে খুঁজে না-ও পেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় লেখকের নামে একটি '**অতিরিক্ত লিখন**' লিখতে পারেন ('অতিরিক্ত লিখন' দেখুন)। না হয়, প্রথমে যে নমুনা দেওয়া হয়েছে, সেই নমুনা অনুসারে আর

একখানি কার্ড লিখুন। এই কার্ডে দ্বিতীয় লেখকের নাম প্রথমে লিখুন, যেমন:



(৩) সংযুক্ত নাম

সংযুক্ত নাম বলতে দুইটি নাম হাইফেনের দ্বারা, বা ইংরেজী of-এর দ্বারা সংযুক্ত নাম বুঝায়, যেমন: John Baring-Gould, Joan of Arc ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ ধরণের বাংলা নাম বড় একটা দেখা যায় না। তবে ইংরেজীতে এ-ধরণের বাংলা নাম দু'-একটি দেখতে পাওয়া যায়, যেমন: Nihar-ranjan Roy। সুতরাং বাংলা বইয়ের লেখকের নাম নিয়ে এ-ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই ওঠে না।

কিন্তু দত্তচৌধুরী, রায়চৌধুরী, গুহরায়, ইত্যাদি উপাধি বহু পরিমাণে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রেও বিশেষ সমস্যা নেই। কারণ, বাংলা নামের লিখন আমরা নামের প্রথম অংশ, অর্থাৎ মূল নাম দিয়েই আরম্ভ করে থাকি। তবে এমনও

দেখা যায়, অনেক পাঠক লেখকের নামের উপাধির একটি অংশই মনে রাখে। সেরূপ ক্ষেত্রে একটি 'দেখুন লিখন' লেখা প্রয়োজন। যেমন :

মাখনলাল রায় দেখুন

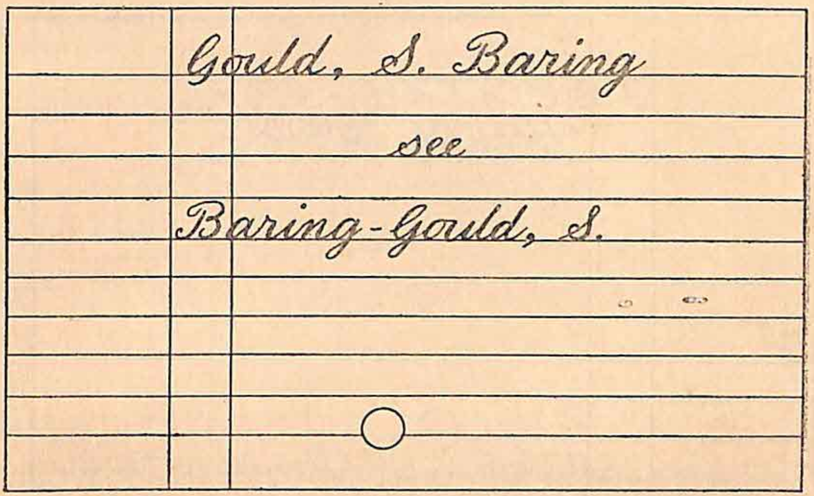
মাখনলাল রায়চৌধুরী।

ইংরেজী নামের ক্ষেত্রে সংযুক্ত নামকে বিভক্ত না করেই লিখন লেখা প্রয়োজন :

Baring-Gould, S.
Grettir the outlaw;
London, Blackie, n. d.
384 p

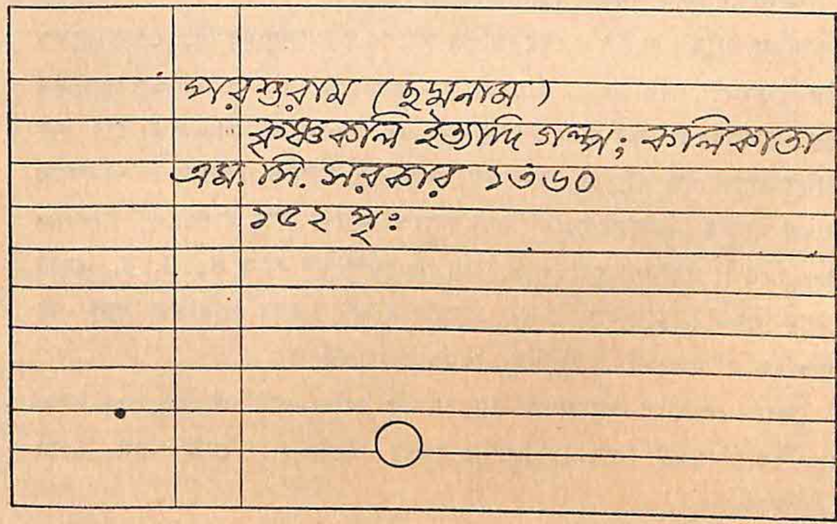
N. D. = NO DATE

এইরূপে প্রথম লিখনটী লিখে আর একটি 'দেখুন লিখন' লিখতে হয়। যেমন ঃ

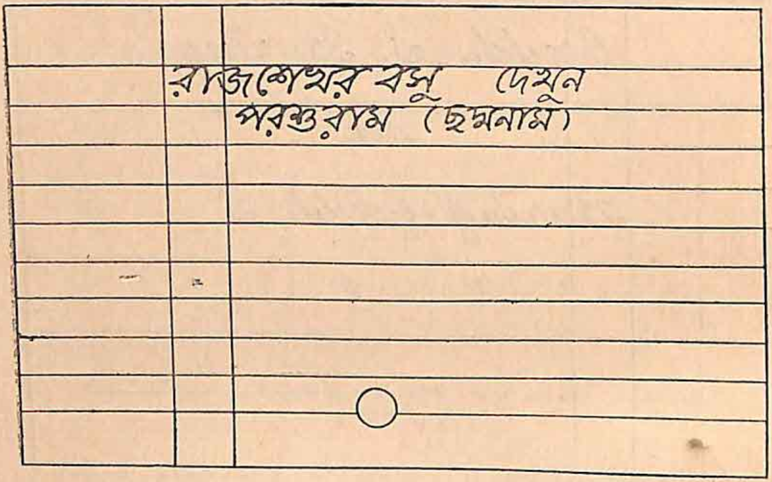


(৪) ছদ্মনাম

লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকলে আসল নামের চেয়ে যদি ছদ্মনাম বেশি পরিচিত হয়, তা হ'লে ছদ্মনামেই লিখন লেখা প্রয়োজন। যেমন ঃ



কিন্তু প্রকৃত নামেও একখানি লিখন রাখতে হবে ঃ

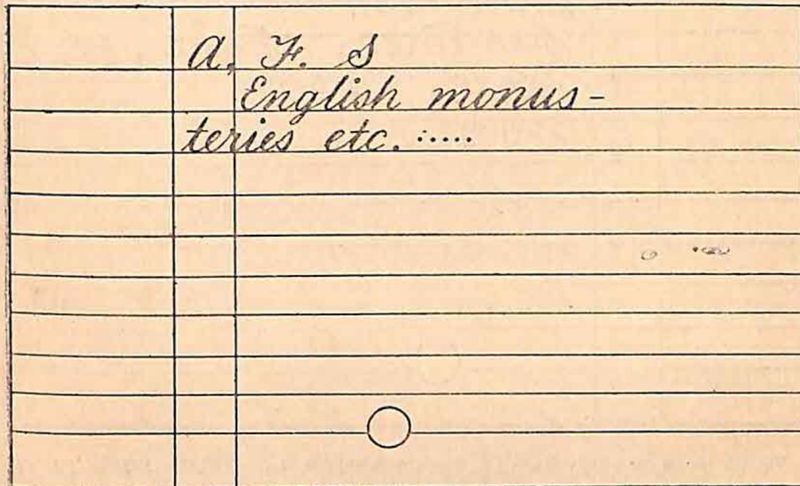


(৫) আক্ষরিক নাম

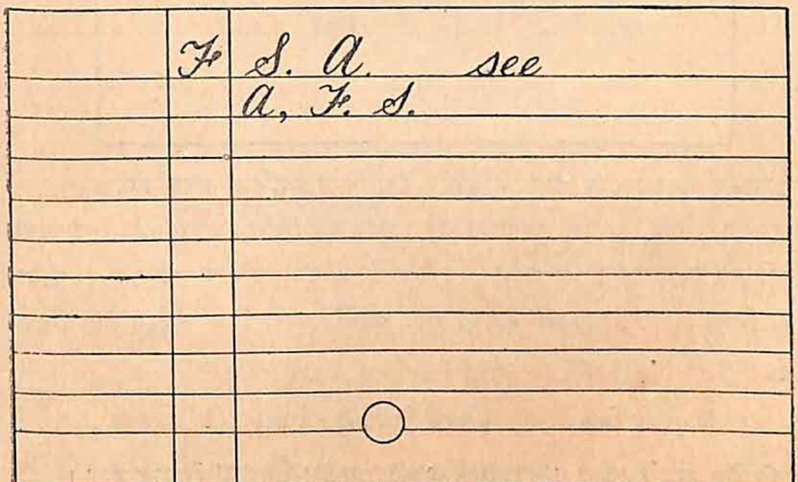
এমন লেখকও আছেন, যিনি তাঁর আসল পুরো নামে যেমন, তাঁর সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক নামেও অর্থাৎ নামের বিভিন্ন অংশের আদ্যক্ষরসমূহ দিয়ে লেখা নামেও ঠিক তেমনই পরিচিত। ইংরেজী সাহিত্যে G. B. S. এইরূপ লেখকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জর্জ বার্ণার্ড শ' (George Bernard Shaw) তাঁর এই আসল নামের মত G B. S.—এই আক্ষরিক নামেও বিখ্যাত। এ-ক্ষেত্রে বিদেশী নামের নিয়মানুসারে নামের শেষাংশ আগে দিয়ে (Shaw, George Bernard) 'প্রধান লিখন' লিখে, তার পর আক্ষরিক নামে S., G. B. একটি 'দেখুন লিখন' লিখতে হবে। G. B. S. নামটি বিশেষ পরিচিত বলে এই আক্ষরিক নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন'ও লেখা উচিত।

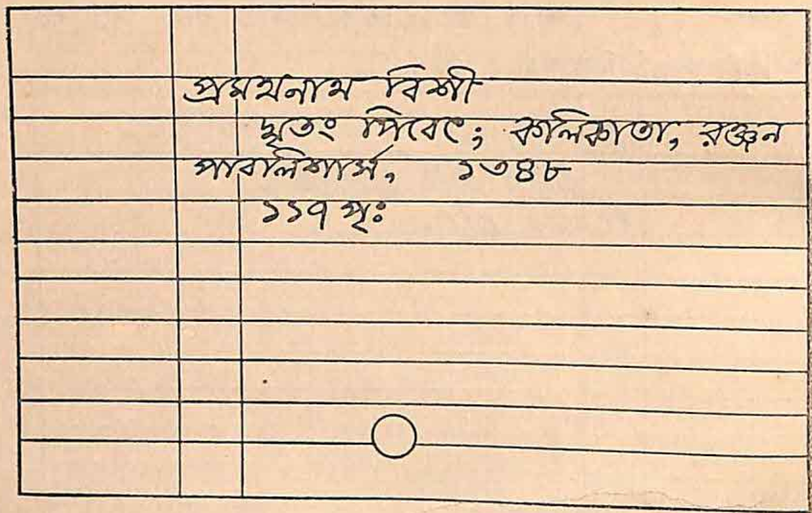
কোন লেখকের আক্ষরিক নামটি যদি বেশি পরিচিত হয়, তা হ'লে আক্ষরিক নামেই প্রধান লিখন লেখা প্রয়োজন। দেশী নাম ছাড়া

যে-কোন বিদেশী আক্ষরিক নামের শেষের অক্ষরটি প্রথমে লিখে পরে অবশিষ্ট অক্ষরগুলি লিখতে হয়। যেমন :



কিন্তু নিম্নরূপ আর একখানি 'দেখুন লিখন'-এর কার্ডও লিখতে হবে :





আসল নামে লিখন লেখা হ'য়ে থাকলে অক্ষরিক নাম থেকে একটি 'দেখুন লিখন'-এর দরকার। যেমন :

প্র. না. বি. দেখুন

প্রমথনাথ বিশী

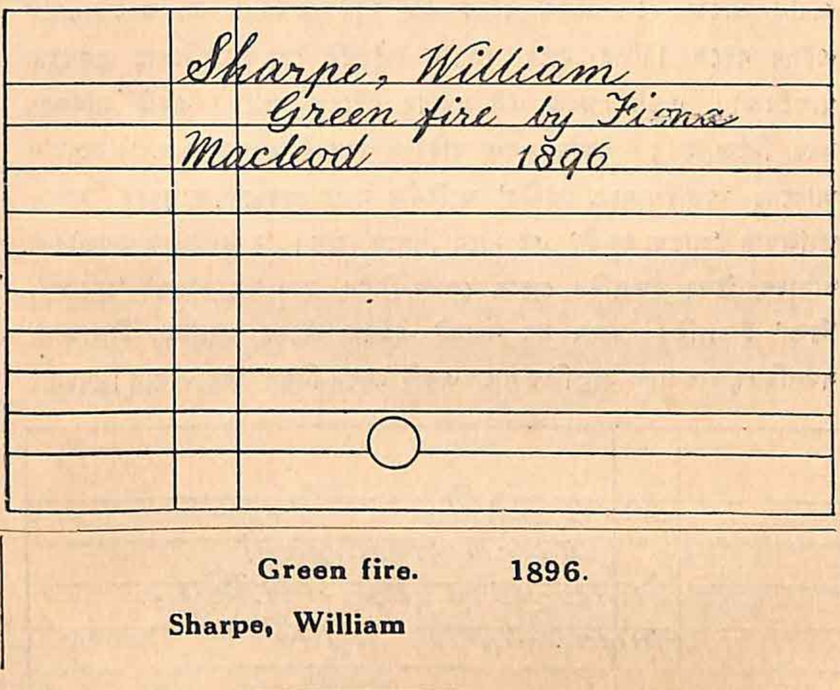
অনেক সময় বিয়ের পরে লেখিকার উপাধি পরিবর্তিত হ'য়ে যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রে তিনি কুমারী অবস্থায় যদি কোন বই লিখে থাকেন এবং সেই নামে পরিচিত হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে তাঁর কুমারী-জীবনের নামেই বইয়ের লেখকের নাম লিখতে হবে, কেবল নামের পর বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হবে তাঁর বিয়ের পরের উপাধি-সমেত নাম। যেমন :

শিবরাণী মিত্র (পরে শিবরাণী ঘোষ)

দ্বিতীয় নামটি থেকে প্রথম নামে একটি **'দেখুন-লিখন'** লিখতে হবে।

(৬) একাধিক ছদ্মনাম

কোন লেখক একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকলে, তাঁর আসল নামে বইয়ের লিখন লিখতে হয় এবং প্রতি বইয়ের নামের সঙ্গে তাঁর ছদ্মনামটিও উল্লেখ করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বইখানির একটি 'নাম-লিখন' লিখতে হয় এবং সেই সঙ্গে ছদ্মনাম থেকে একটি 'দেখুন লিখন'ও লেখা প্রয়োজন :



Sharpe, William
Green fire by Fiona
Macleod 1896

Green fire. 1896.

Sharpe, William

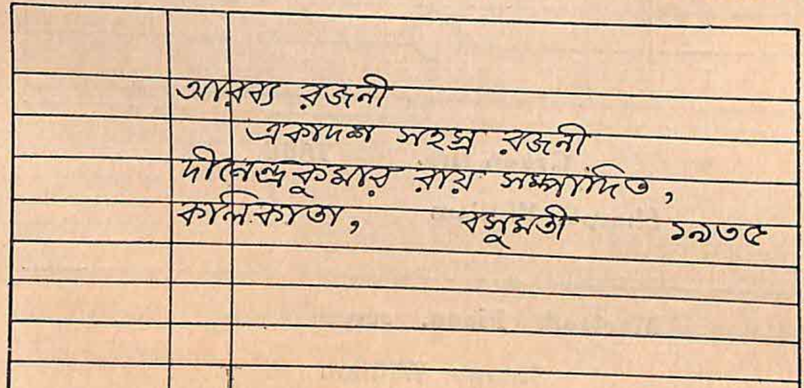
Macleod, Fiona. see

Sharpe, William

(৭) ধর্মপুস্তক, মহাকাব্য, গীতা ইত্যাদি

মাসিকপত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকার কথা আমরা পরে বলবো। এখন ধর্মপুস্তক, গীতা, মহাকাব্য, আরব্য-রজনী—এই ধরণের বইয়ের কথা বলবো। এই সব

প্রাচীন বইয়ের অধিকাংশেরই রচয়িতাদের নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই ধরণের অনেক বইয়েরই রচনার সূত্র সম্বন্ধে অলৌকিক কিংবদন্তী বা কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে। বহু লেখকের দ্বারা এই সব বই লেখা হ'য়ে থাকে এবং বহু ভাষায় অনূদিতও হ'য়ে থাকে। তালিকার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একই বইকে এক সঙ্গে দেখান। তা করতে গেলে এইসব বইকে বিভিন্ন নামে লিখলে বইগুলি লেখক-তালিকায় একস্থানে থাকবে না। এরূপ ক্ষেত্রে এই ধরণের বইয়ের লেখকের একটি নামকরণ করে নিতে হয়। যেমন সমস্ত বাইবেল গ্রন্থেরই লেখক হবে 'বাইবেল'। আরবের 'একাদশ সহস্র রজনীর' কাহিনীর সকল প্রকারের সংস্করণই লেখক-তালিকায় 'আরব্য রজনী' এই নামে লিখতে হবে। সকলপ্রকার মহাভারত, রামায়ণ, গীতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে লেখক-লিখন হবে 'মহাভারত', 'রামায়ণ', 'গীতা' ইত্যাদি। তবে সব সময়েই এইসব বইয়ের সম্পাদক, টীকাকার, সঙ্কলয়িতা, অনুবাদক প্রভৃতির নামে একটি 'দেখুন-লিখন' লিখতে হবে। যেমন :

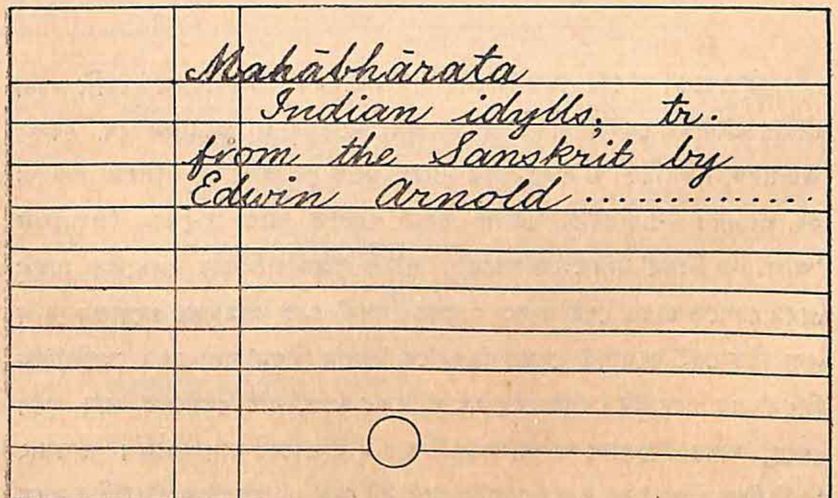


এই হ'লো প্রধান লিখন। এখন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নামে বইখানির খোঁজ পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নামে একটি লিখনও থাকা প্রয়োজন। এরূপ লিখনকে বলা হয় **'অতিরিক্ত-লিখন'**।

'অতিরিক্ত লিখন'-এর নমুনা ঃ

দীনেন্দ্রকুমার রায়
আরব্য রজনী
একাদশ সহস্র রজনী ; কলিকাতা, বসুমতী
১৯৩৫

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, 'লেখক-লিখনে'র সঙ্গে এই লিখনের বিশেষ তফাৎ কিছু নেই, কেবল সমগ্র লিখনটিকে এক লাইন নামিয়ে এনে প্রথম লাইনে 'নাম-সীমা' থেকে সম্পাদক বা অনুবাদকের নাম বসিয়ে দিলেই হ'লো। আর একটি নমুনা দেখুন ঃ


Mahābhārata
Indian idylls, tr.
from the Sanskrit by
Edwin Arnold ....

এইবার ঠিক 'অতিরিক্ত লিখন' অনুসারে Arnold, Edwinএর নামে একটি লেখন লিখে ফেলুন। এই জাতীয় বইগুলির একটি বইয়ের নামে লিখন লেখা হয়। যেমন :

Indian idylls ; tr. by Edward Arnold

1910

Mahabharata

এই ধরণের বইয়ের সমস্ত লিখনই এক রকমের। সুতরাং আর বেশি নমুনা দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল অনুবাদক, সঙ্কলয়িতা ও সম্পাদকের নামের জন্যই যে অতিরিক্ত লিখন লিখতে হয়, তা নয়। সাধারণতঃ 'লেখক-লিখন' ব্যতীত আর যে-কোন লিখনকেই 'অতিরিক্ত লিখন' বলা যেতে পারে। পাঠক পুস্তকতালিকায় লেখকের নামই প্রথম দেখতে চায়। সেই কারণে 'লেখক-লিখন'-এরই আমাদের প্রয়োজন বেশি এবং ঠিক সেই কারণেই 'লেখক-লিখন'কে 'প্রধান লিখন' বলা হয়। 'অতিরিক্ত লিখন'-এর প্রয়োজন কেবল সেই সব পাঠকের জন্যে, যারা লেখকের নাম ভুলে গেছে, অথচ অনুবাদকের বা সঙ্কলয়িতার নাম তাদের মনে আছে। সুতরাং 'অতিরিক্ত লিখন' সব সময়ে লেখার প্রয়োজন নেই। অনুবাদক ইত্যাদির নামে

বইখানির খোঁজ পড়বে কি না, তা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। অনূদিত পুস্তকের দু'টি লিখনের নমুনা ঃ

লেখক-লিখন

মোপাসাঁ, গী-দ
ইভেৎ ; মূল ফরাসী হইতে
অনুবাদ করেছেন শ্রীরাজকুমার
মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, বুক ক্লাব,
১৯৫৪
১১৭ পৃঃ

অতিরিক্ত-লিখন

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—অনুঃ
মোপাসাঁ-গী-দ্
ইভেৎ ; কলিকাতা ; বুক ক্লাব, ১৯৫৪
১১৭ পৃঃ

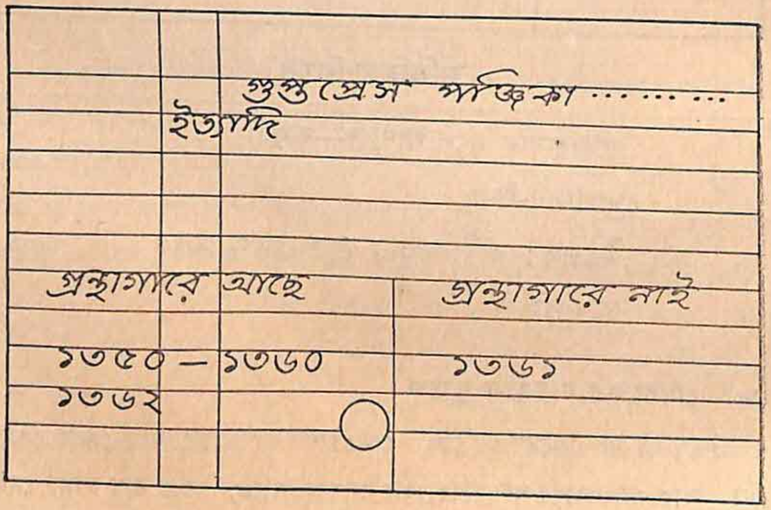
(৮) লেখকের নামহীন পুস্তক

এরূপ বই দুই রকমের ঃ (ক) এক ধরণের বই আছে, যার লেখক নেই ; (খ) আর এক ধরণের বই আছে, যার লেখক আছে, অথচ নাম জানা নেই,

কিন্তু পরে জানা যেতে পারে। লেখকের নামহীন বইয়ের পর্যায়ে পড়ে পঞ্জিকা, বর্ষপঞ্জী, অভিধান ইত্যাদি এবং লেখক আছে, অথচ নাম জানা নেই—এরূপ বইয়ের নমুনা হচ্ছে 'মডেল ভগিনী', 'নেড়া হরিদাস' ইত্যাদি।

(ক) যে-সব বইয়ের লেখক নেই, সে-সব বইয়ের নামে লিখন স্বরু করতে হয় উপরের লাইনে নাম-লিখন থেকে, আর অবশিষ্ট যা কিছু লেখবার তার সবই একই নিয়মে লিখতে হয়।

অনেক সময় গ্রন্থাগারে কোন্ কোন্ সালের পঞ্জিকা, বর্ষপঞ্জী ইত্যাদি আছে, তা পাঠককে জানাবার প্রয়োজন হয়। সে-ক্ষেত্রে উল্লিখিতভাবে লিখন লিখে কার্ডখানিকে মাঝামাঝি হু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে, বাঁদিকের ভাগে লিখতে হবে: "গ্রন্থাগারে আছে" এবং ডান দিকের ভাগে লিখতে হয়: "গ্রন্থাগারে নেই"। "গ্রন্থাগারে আছে"—এই কথার নীচে যে-সব সালের পঞ্জিকা ইত্যাদি আছে, সেই সালগুলি উল্লেখ করতে হয় এবং "গ্রন্থাগারে নাই"—এই কথার নীচে লিখতে হয় গ্রন্থাগারে কোন্ কোন্ সালের পঞ্জিকা নেই। যেমন:



(খ) অভিধানেরও নিয়ম পঞ্জিকা, বর্ষপঞ্জী ইত্যাদির মত, তবে অভিধানের সম্পাদকের নাম বিশেষ পরিচিত হ'লে, সম্পাদকের নামে 'প্রধান লিখন' লেখা প্রয়োজন। তা না হ'লে গ্রন্থের নামেই লিখন লেখা প্রয়োজন। কিন্তু বইয়ের নামেই লিখন করুন, বা সম্পাদকের নামেই লিখন করুন, একটি করে 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতেই হবে। সম্পাদকের নামে 'প্রধান লিখন' হ'লে, বইয়ের নামে 'অতিরিক্ত লিখন' বা বাড়তি লিখন লিখতে হবে এবং বইয়ের নামে 'প্রধান লিখন' হ'লে সম্পাদকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হবে। যেমন :

চলন্তিকা ; ৩য় সং ; ১৩৪৫

রাজশেখর বসু

এখানে অভিধানের নামে 'প্রধান লিখন' করা হ'লো, এখন লেখকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হবে। যেমন :

রাজশেখর বসু

চলন্তিকা ; ৩য় সং ; ১৩৪৫

দ্বিতীয় লিখনটিতে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বইয়ের নাম লেখকের স্থান অধিকার করেছে, অর্থাৎ লেখক-সীমা থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। এখন দেখুন, লেখকের নামে 'প্রধান লিখন' লিখলে কিরূপ দাঁড়ায় :

রাজশেখর বসু

চলন্তিকা ; তৃতীয় সং ; ১৩৪৫

এই হ'লো লেখকের নামে 'প্রধান লিখন' বা আসল লিখন। এখন বইয়ের নামে বাড়তি লিখন করতে গেলে, তা হবে উপরের প্রথম লিখন-অনুযায়ী।

এ-ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, লেখকের নাম জানা না থাকলে, তা জানবার চেষ্টা করতে হবে। যদি নাম জানতে পারা যায়, তা হ'লে সাধারণ 'লেখক-লিখন' যেমন করে লিখতে হয়, তেমনি করে লিখন লিখতে হবে, কেবল লেখকের নামটি বন্ধনীর মধ্যে দিতে হবে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, যে-কোন বিষয় আপনি লিখনে উল্লেখ করবেন, তা যদি বইয়ের নামের পাতায় না থাকে, তা হ'লে সে বিষয়গুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখতে হয়। যেমন :

(যোগীন্দ্রনাথ বসু)

নেড়া হরিদাস, তারিখ নাই

আর, বইয়ে যদি লেখকের নাম না থাকে, অথচ তা যদি পরে জানবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে কেবলমাত্র লেখকের লাইনটি ছেড়ে আর বাকী সব-কিছুই লিখতে হয়।

(৯) সাময়িক পত্রিকার লিখন

সাময়িক পত্রিকার লিখন নামহীন পুস্তক অর্থাৎ যে-সব বইয়ের লেখকের নাম পাওয়া যায় না, সেই সব বইয়ের মত হবে। অর্থাৎ নাম-সীমা থেকে লিখন আরম্ভ করতে হবে এবং $\frac{1}{4}$" দূরে একটি বন্ধনীর মধ্যে পত্রিকাখানি মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ইত্যাদি কি না, তা উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থাগারে পত্রিকাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :

(ক) যে-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং গ্রন্থাগার যার গ্রাহক।

(খ) যে-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, অথচ পত্রিকাখানি নেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

(গ) যে-সব পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে গেছে এবং গ্রন্থাগার যে-সব পত্রিকার গ্রাহক ছিল।

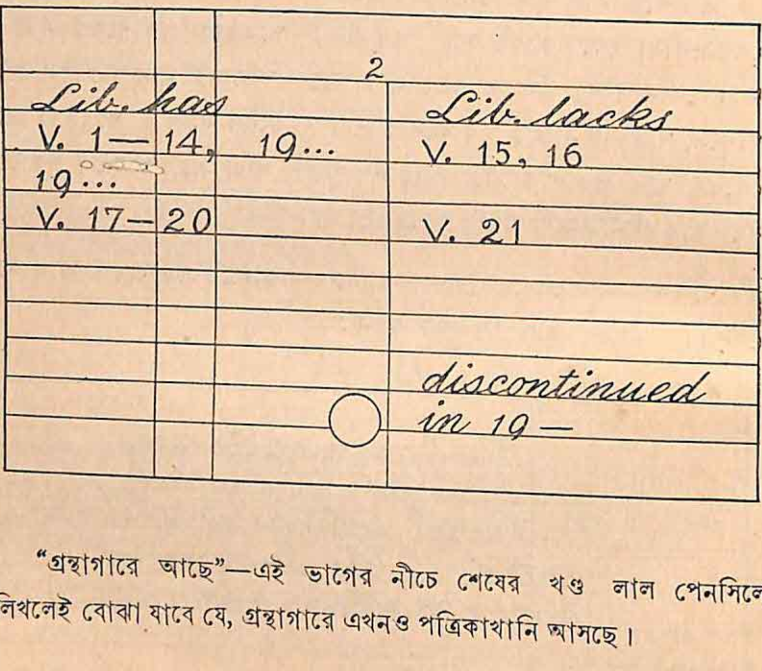
পত্রিকার নাম যদি উপরের লাইনে না ধরে, তা হ'লে পরের লাইনে লেখক-সীমা থেকে আরম্ভ করে লিখে যান। পত্রিকার প্রকাশকের নাম বা আর কোন বিষয় লিখতে হবে না। তবে পত্রিকার নাম-পরিবর্তন হ'য়ে থাকলে, পত্রিকার নামের পর বন্ধনীর মধ্যে তা উল্লেখ করুন। পত্রিকার নাম থেকেই যদি প্রকাশ-কালের পর্যায়-ক্রম বুঝতে পারা যায়, তা হ'লে প্রকাশের সময় আর বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে না।

পত্রিকার নাম লেখার পর কার্ডখানিকে মাঝামাঝি দুই ভাগে ভাগ করে ফেলুন। নীচের নমুনাগুলি লক্ষ্য করুন ঃ



তারপর বাঁ-ভাগে লিখুন—"গ্রন্থাগারে আছে" এবং দক্ষিণভাগে লিখুন-"গ্রন্থাগারে নাই"। "গ্রন্থাগারে আছে"—এই ভাগের নীচে গ্রন্থাগারে রক্ষিত

পত্রিকার খণ্ড ও সাল উল্লেখ করুন, ডান-দিকে পেনসিলে লিখুন যে-সব খণ্ড নেই।



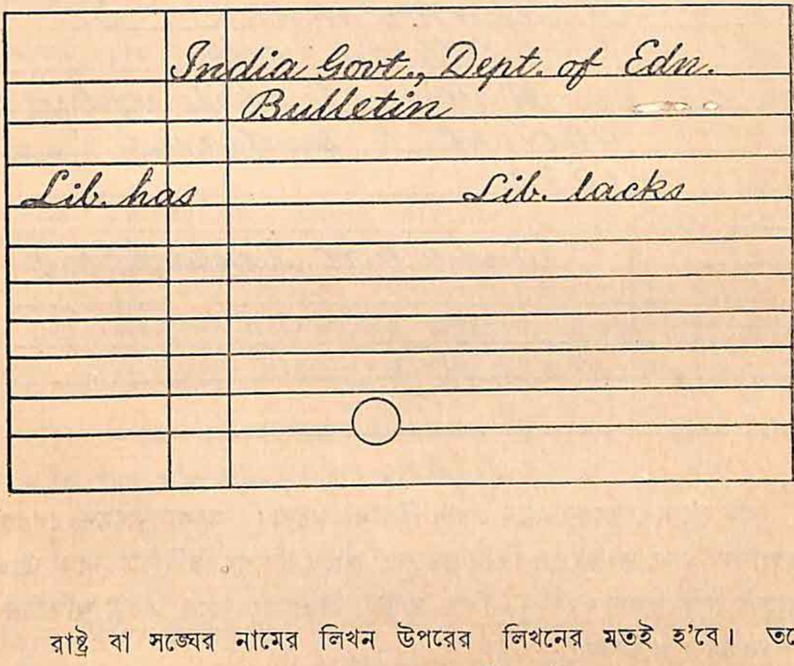
"গ্রন্থাগারে আছে"—এই ভাগের নীচে শেষের খণ্ড লাল পেনসিলে লিখলেই বোঝা যাবে যে, গ্রন্থাগারে এখনও পত্রিকাখানি আসছে।

(১০) সংস্থা বা সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত বই

এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে রাষ্ট্র, কোন সঙ্ঘ বা শিক্ষাকেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, পুস্তিকা ইত্যাদি।

এই সব প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি নিয়মিতভাবে একটি নির্ধারিত

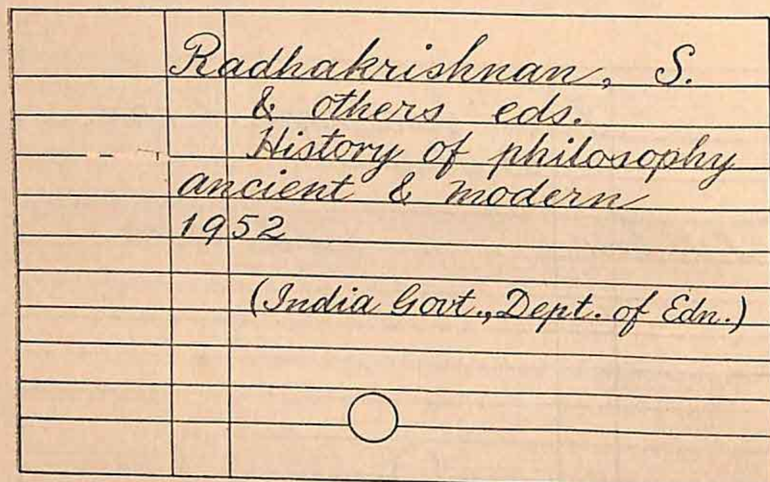
সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। সে-গুলিকে পত্রিকার মত বিচার করলেই চলবে।



রাষ্ট্র বা সঙ্ঘের নামের লিখন উপরের লিখনের মতই হ'বে। তবে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত পুস্তিকা না হ'লে কার্ডখানিকে উপরের মত ভাগ করবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ পুস্তকের মত লিখন লিখলেই চলবে।

কোন বই রাষ্ট্র বা কোন সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত হ'তে পারে; কিন্তু তার লেখকও থাকে। এরূপ পুস্তকের লিখন লেখবার নিয়ম হচ্ছে এই যে, লেখক যদি বিশেষ পরিচিত হন, তাহ'লে লেখকের নামে প্রধান লিখন করে. রাষ্ট্র বা সঙ্ঘের নামে একটি অতিরিক্ত কার্ড করলেই চলে। তা না হ'লে

রাষ্ট্র বা সঙ্ঘের নামে আসল লিখন লিখে, লেখকের নামে একটী অতিরিক্ত লিখন লিখলেই হয়। নমুনা ঃ



এই হ'লো লেখকের নামে প্রধান লিখনের নমুনা। অবশ্য এখানে লেখক সম্পাদক মাত্র, তা হ'লেও তিনি সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত বলে তাঁর নামেই লিখন লেখা হ'লো। কিন্তু রাষ্ট্রিয় বিভাগের নামে একটী অতিরিক্ত লিখন লেখা প্রয়োজন।

নীচে যে টীকা দেওয়া হ'লো, তাকে বলে 'সিরিজ-টীকা'। এখানে কিন্তু Ind. Govt. Dept. of Edn. সিরিজের প্রকৃত নাম নয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, সংস্থা বা সঙ্ঘের নামকে সিরিজের নামের মত ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু অনেকে কেবল Ministry of Edn. দিয়ে বইখানিকে খুঁজবে। সে ক্ষেত্রে একটি 'দেখুন লিখন' লেখা প্রয়োজন ঃ

India Govt. Ministry of Edn. See

India Govt. Dept. of Edn.

রাষ্ট্র বা যে-কোন সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের জন্য এইরূপ লিখন লিখলেই চলবে। এইরূপ বই, পুস্তিকা, বুলেটিন ইত্যাদির লিখন লেখবার সময়ে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। কিন্তু নিম্নের তিনটি নিয়ম মনে রাখলে সকল সমস্যারই সমাধান করা যাবে ঃ

(১) প্রকাশের পর্যায় অনুসারে ক্রমিকভাবে প্রকাশিত বইকে পত্রিকার মত ব্যবহার করতে হবে।

(২) অন্যান্য সমস্ত বইয়ের জন্য রাষ্ট্র, সংস্থা বা সঙ্ঘের নামে লিখন লিখতে হবে। লেখক থাকলে লেখকের নামে অতিরিক্ত লিখন লিখতে হবে।

(৩) লেখক বেশি পরিচিত হ'লে লেখকের নামে প্রধান লিখন লিখতে হবে এবং সঙ্ঘ, সংস্থা বা রাষ্ট্রের নামে অতিরিক্ত লিখন লিখতে হবে।

(১১) সিরিজ-লিখন

'সিরিজ-লিখন'-এরও প্রয়োজন আছে। কারণ, পাঠক জানতে চাইতে পারে, কোন্ কোন্ সিরিজের কি কি বই গ্রন্থাগারে আছে। সিরিজের নামে লিখন লেখবার পূর্বে ঠিক করে নিতে হবে সিরিজের নাম যথেষ্ট পরিচিত কি না। বিশেষ পরিচিত সিরিজ না হ'লে 'সিরিজ-লিখন' লিখতে নেই। সিরিজের প্রত্যেকখানি বইকে সাধারণ বই হিসাবে ধরে নিয়ে, প্রথমতঃ তার লেখক-লিখন লিখতে হয় এবং লিখনের শেষে এক লাইন ছেড়ে 'সিরিজ টীকা' দিতে হয়।

পুস্তকের আকৃতিগত বর্ণনার শেষে বন্ধনীর মধ্যেও 'সিরিজ-টীকা' দেওয়া চলে। যেমন :

Ritchie, R. L. G. comp.
A second book of French poetry ;
London, Nelson, 1946.
viii, 144p. (Nelson's 'Modern 'studies' ser.)

সিরিজের নামে লিখন লিখতে হ'লে সিরিজের নামটি প্রথম লাইনে, হয় নাম-সীমা থেকে আরম্ভ করে লেখক-সীমায় নিয়ে যেতে হয়, না হয় লেখক-সীমা থেকে আরম্ভ করে নাম-সীমায় নিয়ে শেষ করতে হয়। তার পর নাম-সীমায় প্রতি বইয়ের লেখকের নাম লিখে বইয়ের নাম লিখুন :

	বিশ্ব-বিদ্যা সংগ্রহ		
	১০	রামগোপাল	তেল ও ঘি
	১৮	,,	,,
	৩০	,,	,,

কেবল মনে রাখবেন, এক লাইনে লেখক ও বইয়ের নাম ধরে গেলে এক লাইন বাদ দিয়ে পরের লাইনে অন্য বইয়ের নাম লিখতে হবে। কারণ,

সিরিজের প্রতিটি নং-এর বাঁদিকে ডাক-সংখ্যা পড়বে এবং এই ডাক-সংখ্যায় সব সময়ে দু'টি করে নম্বর থাকে।

(১২) সম্পাদক, অনুবাদক, সঙ্কলয়িতা প্রভৃতি

সব সময়েই প্রণেতার নামে বইয়ের লিখন লিখতে হয় এবং সম্পাদক, অনুবাদক, সঙ্কলয়িতা প্রভৃতি যদি বিশেষ পরিচিত লেখক হন, তাহ'লে তাঁদের নামে একটি করে অতিরিক্ত লিখন লিখতে হয়। এরূপ নমুনা আমরা আগে দিয়েছি।

কোন বইয়ের লেখক না থাকলে সম্পাদক, অনুবাদক বা সঙ্কলয়িতার নামে লিখন লিখতে হয়। তবে সব সময়ই তাঁর নামের শেষে তাঁর পরিচিতি-সূচক উল্লেখ থাকবে, যেমন—'অনু' (অনুবাদক), 'সঃ' (সম্পাদক) 'সং' (সঙ্কলয়িতা)।

(১৩) একাধিক সংস্করণের বই, মানের বই, পরিপূরক ইত্যাদি

এ-সব বইয়ের লিখন আসল বইয়ের সঙ্গেই লিখতে হয়। নমুনা দেখুন ঃ

রাজশেখর বসু

চলন্তিকা ; ২য় সং, ১৩৪০

— — ৩য় সং ১৩৪৫

Ripman, Walter & others

First German book ; London,

Dent, 1952.

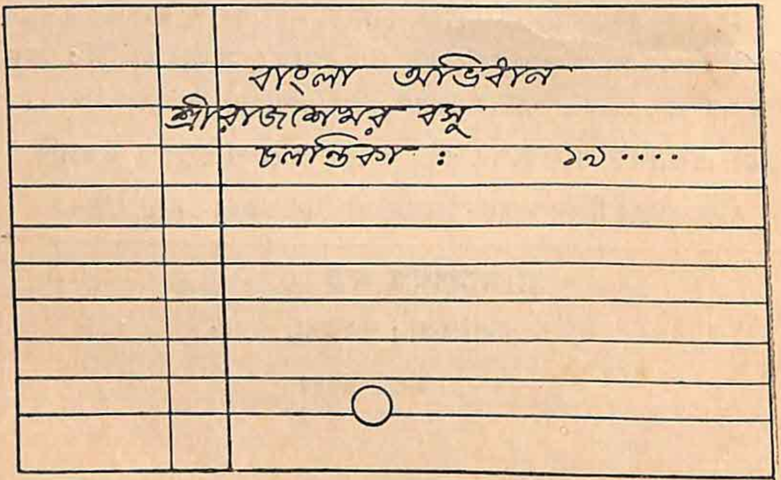
— —Key

মানের বই, পরিপূরক ইত্যাদি শ্রেণীর সমস্ত বইয়েরই ব্যবস্থা এই একই রকমের। '— — ১৯৪৫'-এর অর্থ হচ্ছে (—) রাজশেখর বসুর বই (—)

'চলন্তিকা', ১৯৪৫ সালের সংস্করণ। এ সব বইয়ের আর নূতন লিখন লেখবার প্রয়োজন নেই।

বিষয় লিখন

'বিষয়-লিখন' সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্বে বলেছি। 'বিষয়-লিখন' লেখা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, 'বিষয়-লিখন' লেখক-লিখনেরই মত, কেবল লেখক-লিখনটি এক লাইন নামিয়ে নিয়ে প্রথম লাইনে নাম-সীমা থেকে লাল কালিতে বা বড় অক্ষরে বিষয়ের নামটি লিখতে হয়। যেমন :



বিষয়-লিখনের সব চেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে বিষয়ের নামটি ঠিকমত নির্ধারণ করা। তবে একটা সুখের বিষয় এই যে, এ-বিষয় নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন এবং 'বিষয়-শীর্ষক' নামে বইও পাওয়া যায়। এইরূপ একখানি বই হাতের কাছে রাখলেই কাজ সহজ হয়। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, বিষয়-নির্ধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকের উপর নির্ভর করবে। সেই জন্যে নিজেরও একটি বিষয়-তালিকা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম মনে রাখবেন :

(১) বিষয়ের নাম এমন হওয়া চাই (বিশেষ ক'রে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে), যা সকলে বুঝতে পারবে।

(২) একটি মাত্র নামের দ্বারা পুস্তকের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৩) নাম বহুবচন হ'লে ভালো হয়।

(৪) একই বিষয়ের যত বই আছে, সে-সব বইই একই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত করতে হবে।

(৫) বিষয়ের এমন একটি নাম ব্যবহার করুন, যে-নামে সকলে বইখানির খোঁজ করবে।

(৬) কোন বিষয় কোন দেশানুযায়ী লেখা হ'য়ে থাকলে দেশের নাম আগে দিয়ে পরে বিষয়ের নাম দিন : বাংলা—নদনদী ; ভারত—ভূতত্ত্ব ইত্যাদি।

(৭) এক ধরণের নাম একসঙ্গে লিখুন : ভ্রমণ ও বর্ণনা ; Socialism & Communism ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাম থেকে একটি 'দেখুন লিখন' লিখতে হবে :

Communism see
Socialism & Communism

(১৪) বিষয়ের 'দেখুন লিখন' ও 'আরো দেখুন লিখন'

(১) **'দেখুন লিখন'** : 'দেখুন লিখনে' একটি নাম থেকে (ক) **সমসংজ্ঞা-বাচক** বা (খ) **বিপরীত সংজ্ঞাবাচক** নামগুলি উল্লেখ করতে হয় :

(ক) **Economics** see
Political Economy

(খ) অমিতাচারিতা দেখ
পরিমিতাচারিতা

(২) **'আরো দেখুন লিখন'** ঃ 'আরো দেখুন লিখন' লিখতে হয় একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পাঠককে পরিচালিত করবার জন্যে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রের একটি লিখন থাকা চাই আপনার তালিকায়। যেমন ঃ

মিতাচারিতা আরো দেখুন

মদ্য

মাদক দ্রব্য

তামাক

গাঁজা

ইত্যাদি

'লেখক-লিখন' ও 'নাম লিখন'-এর ক্ষেত্রেও এরূপ 'দেখুন লিখন' ও 'আরো দেখুন লিখন'-এর প্রয়োজন হয়। যেমন ধরুন, রাষ্ট্রের কোন একটি বিভাগের বড়কর্তার নামের সঙ্গেই অনেক সময় সেই বিভাগটি বিশেষভাবে জড়িত থাকে। সেই কারণে সেই বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত বই সর্বদা বিভাগীয় কর্তার নামে প্রকাশিত হয়। সেই জন্যে বিভাগের নাম থেকে বিভাগের কর্তার নামে একটি 'আরো দেখুন লিখন' করা প্রয়োজন। এরূপ আরো অনেক ক্ষেত্র পাবেন, যেখানে 'দেখুন লিখন' ও 'আরো দেখুন লিখন'-এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সব সময়ে এই দুইটি লিখন লেখবার নিয়ম মনে রাখবার চেষ্টা করবেন।

(১৫) নাম-লিখন

'নাম-লিখন' সম্বন্ধে আমরা বলেছি যে, কেবল উপন্যাস, কবিতার বই, নাটক ও অদ্ভুত ধরণের নামযুক্ত বইয়ের 'নাম-লিখন' লিখতে হয়।

'নাম-লিখন' কিছু নতুন নয়, 'লেখক-লিখন'-কে উল্টে নিলেই 'নাম-লিখন' হ'লো।

অনেক সময় বইয়ের নাম দীর্ঘ হ'য়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে নামটি সংক্ষিপ্ত ক'রে নিতে হয় এবং সংক্ষেপিত অংশের স্থান এইরূপ (...) তিনটি বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়।

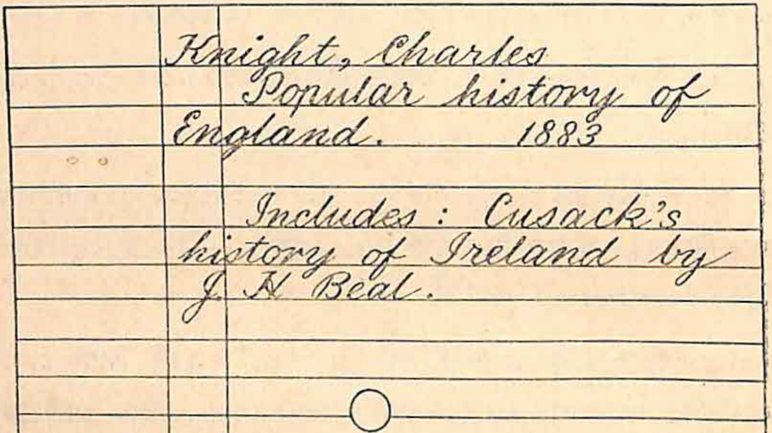
লিখন সম্বন্ধে আমরা সব কথাই বললাম। আরো কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র আছে, কিন্তু সাধারণতঃ সেগুলি বিশেষ কাজে লাগে না। তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রের কথা আমরা বলবো, তা হ'লো 'অন্তর্ভুক্তি'।

(১৬) অন্তর্ভুক্তি

অনেক সময় একই লেখকের কয়েকখানি বই, বাঁধাবার খরচ কমাবার জন্যে, একসঙ্গে বাঁধাই করা হয়। আবার অনেক সময় বিভিন্ন লেখকের বইও একসঙ্গে বাঁধাই করা হ'তে পারে। সে-সব ক্ষেত্রে প্রথম বইয়ের 'লেখক-লিখন' ও 'নাম-লিখনে' এক লাইন ছেড়ে 'অন্তর্ভুক্ত' এই কথাটি নাম-সীমা থেকে লিখে একটি 'কোলন' (:) চিহ্ন দিয়ে যে বইখানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার নাম এবং লেখকের নাম লিখুন।

পরে দ্বিতীয় বইখানির একটি 'লেখক-লিখন' লিখে, উপরিউক্তভাবে

'অন্তর্ভুক্ত হয়েছে' কথা দু'টি লিখে একটি 'কোলন' (:) চিহ্ন দিন এবং পরে যে-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সে-বইয়ের নাম লিখুন :



আরো কয়েক ধরণের বই আছে, যেমন নাটকাকারে পরিবর্তিত উপন্যাস, উপন্যাসে পরিবর্তিত নাটক, অনুবাদ, সংক্ষেপিত পুস্তক। এ-সব বইয়েরই মূল লেখকের নামে লিখন লিখতে হবে এবং নূতন বইয়ের লেখকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হবে। তবে যদি এই সব নূতন পুস্তকে মূল পুস্তকের কিছুই বর্তমান না থাকে এবং নূতন বইখানিকে মূল বই থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা সম্ভব হয়, তা হ'লে নূতন বইয়ের লেখকের নামেই আসল লিখন লিখতে হয় এবং মূল বইয়ের লেখকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লেখা প্রয়োজন।

তালিকা-প্রকরণ ঃ আর কয়েকটি বিষয়

সাধারণ গ্রন্থাগারে এক-একখানি বইয়ের যে কয়টি লিখন লেখা প্রয়োজন, তার নমুনা দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন পুস্তকের যেরূপ লিখন লেখা প্রয়োজন, তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মনে রাখবেন, যে-সব লিখনের বর্ণনা আমরা দিলাম, তা ছাড়া আরো বহু প্রকারের লিখন আছে। যেমন ধরুন, এমন অনেক বই থাকতে পারে, যে-সব বইয়ের **লেখক সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে, অথচ গবেষণার ফলে একজনকে লেখক বলে খাড়া করা হয়েছে।** আবার এমন বই থাকতে পারে, যার **নাম প্রথম ছাপা হওয়ার সময় যা ছিল, পরে তার পরিবর্তন হয়েছে।** আবার এমনও হ'তে পারে, **একখানি উপন্যাস প্রথমে যে নামে ছাপা হয়েছিল, পরে তার নাট্যরূপ অন্য নামে প্রকাশিত হয়েছে।**

এরূপ আরো বহু ধরণের বই আছে, যে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বললাম না। কিন্তু যাঁরা পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করবেন, তাঁরা একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবেন, তালিকা-প্রকরণ সম্বন্ধে যে-সব ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেই ইঙ্গিতগুলি জানা থাকলেই তিনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। যেমন ধরুন ঃ

EDGAR WALLACE / The man who/changed his name/ The novel of / Edgar Wallace's / famous play / by / Robert Curtis / 4th Thousand / Published for / The crime-book society / by / Hutchinson & Co. / (Publishers), Ltd. / London, E. C. 4 /

এখন দেখুন, এই বইখানির কতগুলি লিখন লিখতে হবে।

বইখানির মূল লেখক হচ্ছেন এডগার ওয়ালেস (Edgar Wallace)। কিন্তু বইখানি যখন উপন্যাসের আকারে লেখা হ'য়ে প্রকাশিত হ'লো, তখন তার লেখক হলেন রবার্ট কার্টিস (Robert Curtis)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বইখানির যে 'লেখক-লিখন' হবে, তা কার নামে হবে ? একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, মূল লেখকের নামেই 'লেখক-লিখন' লিখুন বা উপন্যাস-লেখকের নামেই 'প্রধান লিখন' লিখুন, তা'তে বেশি কিছু যায় আসে না—যদি অন্য লেখকের নামের সন্ধান আপনার পুস্তকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকে। কারণ, পাঠক বইখানি এডগার ওয়ালেস-এর নামেও খুঁজতে পারে এবং বরার্ট কার্টিস-এর নামেও খুঁজতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ম যা-ই থাক না কেন, আপনার উদ্দেশ্যের কথা ভুললে চলবে না। **আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল পাঠককেই বইখানির সন্ধান দেওয়া।**

সুতরাং প্রথমতঃ 'লেখক-লিখন' লিখুন রবার্ট কার্টিস-এর নামে :

Curtis, Robert

The man who changed his name, A novel novelised (by Robert Curtis) from the (famous) play by Edgar Wallace ; London, Hutchinson, n. d.

252 p. (Crime Club ser. No. 61)

এই হ'লো সম্পূর্ণ 'লেখক-লিখন'। এখন যে-পাঠক বইখানি এডগার ওয়ালেস-এর নামে খুঁজবে, আপনাকে তার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং এডগার ওয়ালেস-এর নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লেখা প্রয়োজন :

Wallace, Edgar
Curtis, Robert.
The man who changed his name, novelised by Robert Curtis from the (famous) play by Edgar Wallace ; London, Hutchinson, n. d.
252 p. (Crime Club ser. No. 61)

এ-ক্ষেত্রে লেখক-লিখনে যা কিছু লেখা হয়েছে, সবই লিখতে হবে, কেবল অতিরিক্ত লিখতে হবে এডগার ওয়ালেস-এর নাম। 'অতিরিক্ত লিখন' সম্বন্ধে যা বলবার, তা আমরা পূর্বেই বলেছি।

উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির একখানি 'নাম-লিখন' লিখতে হয় :

The man who changed his name. n. d.
Curtis, Robert.

ইচ্ছা করলে একটা টীকাও দিতে পারেন। অবশ্য তা বন্ধনীর মধ্যে একটু নীচে দিতে হবে :

The man who changed his name.
Curtis, Robert.
(a novel, novelised from a play of Edgar Wallace)

আবার সিরিজের নামেও বইখানির খোঁজ পড়তে পারে। স্থতরাং আপনাকে একটি 'সিরিজ-লিখন'ও লিখতে হবে ঃ

Crime Book Society Ser.
61. The man who changed his name by Edgar Wallace.

এইবার প্রয়োজন হবে একটি 'বিষয়-লিখন-এর। আমরা পূর্বেই বলেছি, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির 'বিষয়-লিখন' লেখার প্রয়োজন নেই। স্থতরাং উপন্যাসের 'বিষয়-লিখনে' কেবলমাত্র লিখুন ঃ

Fiction
For fiction of any language see under the name of the language.

আপনার বিষয়-তালিকায় কেবল একটি লিখন (নির্দেশক) থাকবে, সেই নির্দেশপত্রের পিছনে উপন্যাসের লিখনগুলি সাজানো থাকবে। উপন্যাসের লিখন যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভালো। কেবল লেখকের নাম ও বইয়ের নাম দিলেও চলে।

এইরূপ নানা ধরণের সমস্যা উঠতে পারে। কিন্তু আপনার তালিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি যদি সচেতন থাকেন, তা হ'লে যে-সমস্যাই উঠুক না কেন, তার সমাধান করতে কোনই অস্থবিধা হবে না।

জীবনী

অনেকের কাছে জীবনী একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আসলে জীবনীর তালিকা করতে কোনই সমস্যা নেই। নিম্নের নামপত্রটি লক্ষ্য করুন ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
জীবনচরিত
অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর
সমালোচনা সম্বলিত
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ.
চতুর্থ সংস্করণ
কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহির
যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানির
দ্বারা মুদ্রিত
১৯০৭

এখন দেখুন, এ-বইখানির একজন লেখক আছেন এবং বিষয়ও আছে। সুতরাং বইখানিকে সাধারণ বইয়ের মত তালিকাভুক্ত করলেই কাজ মিটে যায়। তা হ'লে বইখানির 'লেখক-লিখন' হবে এইরূপ ঃ

যোগীন্দ্রনাথ বসু
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত···
কলিকাতা, ১৯০৭
১৷০, ৬৮২ পৃঃ, ছবি।

বইখানিতে প্রকাশকের নাম নাই।

এইবার একখানি 'বিষয়-লিখন' লিখলেই কাজ মিটে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে 'নাম-লিখন'-এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, 'বিষয়-লিখন'ই 'নাম-লিখন'-এর কাজ করবে।

তবে এমন অনেক জীবনী আছে, যে-সব বইয়ের নাম ব্যক্তিগত নামে হ'য়ে থাকে। সে-সব ক্ষেত্রে বইয়ের নামে একটি লিখন লেখা প্রয়োজন এবং বইয়ের নামের সঙ্গে কিছু টীকা থাকলে, তাও 'নাম-লিখন'-এর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

এ বইয়ের 'বিষয়-লিখন' হবে নিম্নরূপ ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যোগীন্দ্রনাথ বসু

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত···

কলিকাতা, ১৯০৭

১।০, ৬৮২ পৃঃ, ছবি।

লেখক-লিখনের সব কিছুই 'বিষয়লিখনে' লিখতে হয়।

জীবনচরিতের একটি সাধারণ লিখন লিখতে হয় ঃ

জীবন-চরিত

(ব্যক্তির নামে দেখুন)

আত্মচরিত, ব্যক্তিগত পত্র, দিনপঞ্জী বা রোজনামচা ইত্যাদির লিখন ঐ একই ধরণের। তবে এ-সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা যদি কোন বিশেষ বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে 'বিষয়-লিখন' লেখা হবে সেই বিশেষ বিষয়ের নামে। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য মতভেদ আছে। এরূপ লিখন লেখা বা না লেখা নির্ভর করবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের উপরে।

কোন পুস্তকের প্রণেতা-রূপে পরিচিত লেখকের পুস্তক

এমন অনেক বই আছে, যার নামপত্রে লেখকের নাম থাকে না, অথচ লেখক তাঁর রচিত অপর কোন পুস্তক বা পুস্তকাবলীর নামের দ্বারা নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। যেমন ঃ

মডেল ভগিনী

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, কালাচাঁদ প্রভৃতি

গ্রন্থ-প্রণেতা কর্ত্তৃক

বিরচিত

দ্বাদশ সংস্করণ

কলিকাতা

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তীর দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

এরূপ পুস্তকের কেবলমাত্র একটি 'নাম-লিখন' লিখতে হবে এবং সেই সঙ্গে লেখক যে গ্রন্থের প্রণেতা-হিসাবে পরিচিত, সেই গ্রন্থের নামে আর একটি লিখন লিখে নামের পরে লিখতে হবে ঃ

মডেল ভগিনী .... ১২ সং, কলিকাতা,

নটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১২।

দ্বিতীয় লিখন হবে এইরূপ ঃ

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী........গ্রন্থপ্রণেতার
মডেল ভগিনী। ১৩১২

এই লিখনটি ঠিক 'সিরিজ-লিখন'-এর মত লিখুন। অর্থাৎ এই লেখকের যতগুলি বই আপনার গ্রন্থাগারে আছে, একটির পর একটির নাম বসিয়ে দিন। কিন্তু মনে রাখবেন যে, প্রত্যেকখানি বইয়ের একটি করে 'নাম-লিখন' লিখতে হবে।

সন্ধান

এখন ধরুন, আপনার গ্রন্থাগারের তালিকা তৈরী হ'য়ে গেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আধুনিক গ্রন্থাগারে অনেক সময় বই বাতিল করতে হয়। বই বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে যে-বইগুলি বাতিল করা হ'লো, সেই সব বইয়ের লিখনগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে আপনার তালিকার দেরাজ থেকে বার করে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু যে-বইখানি বাতিল করা হ'লো, সেই বইখানির কি কি লিখন লেখা হয়েছে, তা কি ক'রে বুঝবেন? আপনি তা জানবার কোন উপায়ই ক'রে রাখেননি। সুতরাং লিখনগুলিও আপনি খুঁজে পাবেন না।

ধরুন, Edger Wallce-এর বইখানির কথা। এই বইখানির প্রথম লিখন হচ্ছে *Curtis Robert*; দ্বিতীয় লিখন ঃ *Edgar Wallace*; তৃতীয় লিখন ঃ The man who changed his name; চতুর্থ লিখন ঃ Crime Book Society Ser.; পঞ্চম লিখন ঃ English fiction. এমন একটি সন্ধান রাখা প্রয়োজন, যাতে সহজেই এ-বিষয়গুলি জানা সম্ভব হয়। যে কার্ডে আপনি

'লেখক-লিখন' লিখেছেন, সেই কার্ডখানি উল্টে ধরুন। সেই কার্ডের নীচে বাঁ-দিকে লিখনগুলির নাম লিখে রাখুন ঃ

নাম—

সিরিজ—

বিষয়—ইংরেজী উপন্যাস

অতিরিক্ত লিখন—এডগার ওয়ালেস

'লেখক-লিখন'-এর পিছনে এমনিভাবে সন্ধানগুলি লিখে রাখলে, পুস্তক বাতিল করবার সময় লিখনগুলিকে বাতিল করতে আর কোনই অসুবিধা হবে না। লিখনগুলি তালিকায় রইলো, অথচ তালিকার অন্তর্ভুক্ত বইগুলি গ্রন্থাগারে রইলো না, এরূপ অবস্থা হ'লে গ্রন্থাগারিককে যে কিরূপ অসুবিধায় পড়তে হ'তে পারে, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে।

তালিকা-প্রকরণের নিয়মাবলী

এই পুস্তকে আমরা বহুবার বলেছি যে, জনসাধারণের গ্রন্থাগারে এবং যে-কোন ধরণের গ্রন্থাগারে পুস্তকের তালিকার লিখন নির্ভর করবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের উপর। কিন্তু তার একটা অসুবিধা এই যে, কোন গ্রন্থাগারেই তালিকার লিখন এক ধরণের হয় না। তার ফলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠা অসুবিধাজনক হ'য়ে পড়ে। সমবায়ের ভিত্তিতে পুস্তক-তালিকা প্রস্তুত করার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং সে-বিষয়ের বিবরণ আর এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

পুস্তক-তালিকার এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য ১৮৭৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকায় লাইব্রেরি এসোসিয়েশন একটি কমিটী গঠন করে। এই কমিটী তালিকা-প্রকরণের যে নিয়মাবলী তৈরী করে, তা 'লাইব্রেরি জার্নালে' (Library Journal) ছেপে বার করা হয়। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকারের তালিকা-লিখন হ'তে থাকে।

কিন্তু সমবায়ের ভিত্তিতে রচিত পুস্তক-তালিকার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করতে থাকে এবং এ-প্রয়োজনটা প্রকট হ'য়ে ওঠে ১৯০০ সালে মণ্ট্রয়াল-সভায়। এই সভায় পুনরায় একটি কমিটী গঠিত হয় এবং এই কমিটীই 'লেখক-লিখন' ও 'নাম-লিখন' সম্বন্ধে নিয়ম তৈয়ারী করে।

এই কমিটীর প্রথম কাজ হয় লাইব্রেরি অব্ কংগ্রেস-এর তালিকা-প্রকরণের নিয়মের মধ্যে কিরূপ অদল-বদল করা যুক্তিযুক্ত, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা।

এই কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয় ১৯০১ সালে। এই অধিবেশনে তালিকা ছাপার হরফ নিয়ে আলোচনা হয়। এই কমিটিতে ছাপার নিম্নরূপ নিয়মাবলী ঠিক করা হয়ঃ

(১) 'শীর্ষক-লিখন' ছাপা হবে ১২ পয়েণ্ট ভারী-মুখ হরফে (12 pts. heavy-face types)।

(২) লেখকের লাইনের উপর লেখকের নাম লেখা হবে।

(৩) বইয়ের নাম ছাপা হবে ১২ পয়েন্ট হরফে।

(৪) প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের তারিখ ছাপা হবে রোমান হরফে (Roman types)।

(৫) সিরিজের নাম লেখা হবে বইয়ের বিবরণের পর।

(৬) বইয়ের বিবরণ ছাপা হবে কার্ডের আকার (৫"×৩") অনুসারে সর্বাপেক্ষা বড় হরফে। ৮ পয়েন্ট হরফ যদি সর্বাপেক্ষা বড় বলে বিবেচিত হয়, তা হ'লে সেই হরফই ব্যবহার করতে হবে।

(৭) বইয়ের প্রকাশের তারিখের পর অন্য লাইনে বইয়ের বিবরণ লিখতে হবে।

(৮) সূচীপত্রের পূর্বে টীকা দিতে হবে।

পুস্তক-তালিকা ছাপার আদর্শ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যোগীন্দ্রনাথ বসু

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ; ৪র্থ সং,

কলিকাতা, ১৯০৭

১।০, ৬৮২ পৃঃ, ছবি (সিরিজ……)

টীকাঃ অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলী-সমালোচনা সম্বলিত

সূচীঃ (প্রয়োজন-বোধে)

এমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের নিয়মগুলি Cutter's Rule-এর পরিশিষ্ট-১এ ছাপা হয়।

কমিটীর সভ্যাদর দূরদেশ থেকে এসে একত্রিত হওয়া সব সময় সম্ভব না হওয়ার দরুণ একটি নিয়মের খসড়া ছেপে বার করা হয় ১৯০২ সালে। এই খসড়ার নাম হয় : 'A. L. A. rules—Advance Edition'। A. L. A. rules-এর অর্থ 'এমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন্‌স্ রুল্‌স্'।

এর পর কমিটী তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। নানা ব্যক্তির কাছ থেকে এবং নানা গ্রন্থাগার থেকে মতামত ও সমালোচনা আসতে থাকে। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে কমিটীর তিনটি অধিবেশনে এইসব মতামত সম্পর্কে আলোচনা হয়। ফলে ঐ খসড়ার একটি নূতন সংস্করণ ছাপতে দেওয়া হয়।

পরে তালিকা-লিখনের বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়।

এমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের কাছ থেকে একটি যুক্ত তালিকা-লিখনের আইন প্রণয়ন করবার প্রস্তাব আসে। কমিটি কর্তৃক এ-প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে।

এই আলোচনার ফলে একটি আইনের খসড়া গড়ে ওঠে। এই খসড়ার নাম হয় 'Anglo-American Code' বা সংক্ষেপে 'A. A. Code'.

এই নিয়মাবলীর মধ্যে দেখা যায় যে, বহুস্থলে Library Association ও American Library Association-এর দুইটি কমিটী একমত হ'তে পারেনি। সেই কারণে যে-স্থলে মতবিরোধ হয়েছে, সে-স্থলে দু'টি মতই দেওয়া আছে।

'Cataloguing Rules'-এর কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

প্রত্যেক বড় গ্রন্থাগারে একখানি 'Cataloguing Rules' রাখা প্রয়োজন। ছোটখাটো গ্রন্থাগারের জন্য আমরা এ-স্থলে এই নিয়মাবলীর কেবলমাত্র **কয়েকটি নিয়ম** উল্লেখ করলাম (প্রত্যেকটি নিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হ'লো) :

লিখন ও শীর্ষক

(ক) ব্যক্তিগত নাম

১। **কে লেখক ?** একজন লেখকই হোক বা যুক্ত (corporate) লেখকই হোক, লেখকের নামে পুস্তকের একখানি লিখন লিখুন (লেখকের সংজ্ঞা দেখুন)।

২। **যুক্ত লেখক :** দুইজন লেখক মিলে একখানি বই লিখলে পুস্তকের নামপত্রে যে লেখকের নাম প্রথমে থাকে, সেই লেখকের নামে লিখন সুরু করুন এবং প্রথম লেখকের নামের পরে 'এবং' কথাটি ব্যবহার করে দ্বিতীয় নামটি লিখুন। দুইজনের বেশি লেখক থাকলে, প্রথম লেখকের নামটি লিখে তার পর 'এবং অন্যান্য' কথাটি ব্যবহার করুন। তিনজনের বেশি লেখক না থাকলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখকের নাম বইয়ের নামের সঙ্গে দিন। তিনজনের বেশি লেখক থাকলে, অন্যান্য লেখকের নাম একটি টীকায় বা সূচীর সঙ্গে দিন। দ্বিতীয় ও পরবর্তী লেখকের নামে 'অতিরিক্ত লিখন' বা 'দেখুন লিখন' লিখুন।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'অতিরিক্ত লিখন' বা 'দেখুন লিখন' লেখা সত্ত্বেও বাকী লেখকদের নাম বইয়ের নামের সঙ্গে লিখতে বলা হয়েছে। প্রথম লেখকের নামের সঙ্গেই যখন পাঠককে জানানো হচ্ছে যে, বইখানির আরো লেখক আছে এবং সে-সব লেখকের নামে যখন বাড়তি লিখন লেখা হচ্ছে, তখন

সে-সব লেখকের নাম বইয়ের নামের সঙ্গে বা টীকায় লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

৪। **চিত্রকর**ঃ যে-সকল পুস্তকে চিত্রই প্রধান কিংবা যে-সব বইয়ে কেবল চিত্রই আছে, সে-সব ক্ষেত্রে চিত্রকরের নামে 'প্রধান লিখন' লিখতে হবে এবং বইখানির লেখকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হবে।

যেখানে চিত্রের প্রাধান্য দ্বিতীয় স্তরের, সেখানে লেখকের নামে 'প্রধান লিখন' লিখে, চিত্রকরের নামে বাড়তি লিখন লিখতে হবে।

প্রাধান্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে লেখকের নামে 'প্রধান লিখন' লিখে, চিত্রকরের নামে 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হবে।

এ-নিয়মটির সত্যিই কোন মূল্য নেই। এখানে সাধারণ নিয়ম মেনে চলাই ভালো। অর্থাৎ লেখকের ও চিত্রকরের নামে দুইটি লিখন থাকা চাই। এই দুই লিখনের একখানি হবে 'প্রধান লিখন', আর একখানি হবে 'অতিরিক্ত লিখন'। কারণ, তা না হ'লে সন্দেহ দূর করা যাবে কি করে?

৮। **গান-বাজনা** (স্বরলিপি)ঃ স্বরলিপির বই স্বরলিপিকারের নামে লিখে, গান যিনি লিখেছেন, তাঁর নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখুন।

১৩। **টীকা**ঃ যখন মূল পুস্তকখানির পাঠের সঙ্গে টীকা দেওয়া থাকবে, তখন মূল বইখানির লেখকের নামে লিখন লেখা হবে এবং টীকাকারের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হবে।

১৫। **সূচীপত্র** (বিশেষভাবে মাসিকপত্রিকার)ঃ যে বইয়ের সূচীপত্র, সেই বইয়ের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করুন। সম্পাদক থাকলে, তার নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখুন।

১৬। **নির্ঘণ্ট**ঃ নির্ঘণ্ট স্বতন্ত্র পুস্তক হিসাবে লেখা হ'লে, নির্ঘণ্ট-লেখকের নামেই বইখানির লিখন লেখা প্রয়োজন এবং যে-পুস্তকের নির্ঘণ্ট, সেই পুস্তকের লেখকের নামে সেই সঙ্গে একখানি 'অতিরিক্ত লিখন' লেখা প্রয়োজন।

এই হ'লো এমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের নিয়ম। অপর নিয়মটি হচ্ছে ঃ

যে লেখকের বইয়ের নির্ঘণ্ট লেখা হয়েছে, সেই লেখকের নামে 'প্রধান লিখন' লিখুন। নির্ঘণ্ট-লেখকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখুন।

১৭। **সংক্ষিপ্তসার**ঃ সংক্ষেপিত পুস্তকের আসল লিখন বা 'প্রধান লিখন' আসল লেখকের নামে লিখুন এবং যিনি সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন, তাঁর নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখুন।

২১। **অনুবাদ**ঃ আসল লেখকের নামে আসল লিখন বা 'প্রধান লিখন' এবং অনুবাদকের নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখুন।

(খ) ব্যক্তিগত নাম কিভাবে লেখা হবে?

২৪। **কৌলিক নাম** (Surname) ঃ

সাধরণ নিয়মঃ কৌলিক নাম অর্থাৎ বংশগত উপাধি বা পদবী আগে লিখুন এবং পরে লিখুন 'প্রথম নাম' (forename) বা প্রকৃত নাম।

এই নিয়ম অনুসারে লিখন লিখলে আমাদের দেশীয় নাম নিয়ে মহা মুশকিল হবে। কারণ, চট্টোপাধ্যায়—কেবল এই পদবীটির বানান ইংরেজীতে কত রকমের হয়, তার ইয়ত্তা নেই। সব পদবীর ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা দেবে।

সে-জন্যে আমরা বলেছি, দেশীয় নাম 'প্রথম নামে' বা প্রকৃত নামে লেখা ভালো। তা হ'লে বানানের সমস্যা দূর হয়।

২৬। **উপপদযুক্ত কৌলিক নাম**ঃ কৌলিক নাম বা পদবী দিয়ে লিখন সুরু করুন এবং উপপদটি পরে দিন। ইংরেজী কৌলিক নামের প্রথমেই উপপদ লিখুন। ফরাসীতে বিশেষণসমেত কৌলিক নাম লিখুন। শেষোক্ত নিয়ম ইতালীয় ও স্পেনীয় নামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইংরেজী উপপদ ঃ A', Ap, De, La, De, D',
Mac., Mc., Van.

ফরাসী উপপদ ঃ Le, La, Les (articles) ; Du, de la,
des (articled preposition) ;
De (preposition).

ইতালীয় উপপদ ঃ Il, lo, la, gli (articles) ; di, de (prepositions) del, degli, della, da (articled prepositions).

স্পেনীয় উপপদ ঃ El, la (articles) ; al, del
(articled prepositions) ;
de (preposition).

৩৮। **ছদ্মনাম**ঃ লেখক যখন কোন ছদ্মনামে বিশেষ পরিচিত হন, তখন সেই ছদ্মনামেই 'প্রধান লিখন' লিখুন এবং নামের পর 'ছদ্ম' বা ইংরেজীতে 'pseudo' এই কথাটি লিখুন। আসল নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখুন।

আমরা যে নিয়ম দিয়েছি, সেই নিয়মের সঙ্গে এই নিয়মটি মিলিয়ে দেখুন :

৪০। **পরিবর্তিত নাম ঃ** যখন লেখক তাঁর নাম পরিবর্তন করেন, বা তাঁর নামের সঙ্গে আর কিছু যোগ করেন, তখন যে-নামে তিনি প্রথম বই লিখতেন, সেই নামেই লিখন সুরু করে পরে লিখুন 'afterwards' বা 'পরে' এবং তার পর তাঁর নূতন নামটি লিখুন।

এমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের নিয়ম অনুসারে 'প্রধান লিখন' লিখতে হয় লেখকের নূতন নামে এবং পুরাতন নামে একটি 'অতিরিক্ত লিখন' লিখতে হয়। অবশ্য, প্রথম নামটি বিশেষভাবে পরিচিত হ'লে, প্রথম নামেই 'প্রধান লিখন' লেখা প্রয়োজন।

৪১। **বিবাহিতা লেখিকা ঃ** পরিবর্তিত নামের নিয়মই এখানে প্রযোজ্য।

৫২। **প্রাচ্যের লেখক** (আরবী, তুর্কী ইত্যাদি) ঃ ব্যক্তিগত নামে লিখন লিখে পরে সম্বন্ধ-বাচক নাম ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

Muhammad Ibn Zakariya, Abu, Bkr.

৫৪। **ভারতীয় নাম ঃ** ব্যক্তিগত নামে লিখন লিখুন। উপাধি আগে দিয়ে একটি 'দেখুন লিখন' লিখুন।

এই নিয়মের ভিত্তিতেই আমরা দেশীয় নামের লিখনের নমুনা দিয়েছি ;

(ঘ) রাষ্ট্রের কোন বিভাগের নাম, সঙ্ঘের নাম ইত্যাদি।

৫৮। **রাষ্ট্রীয় বিভাগের নাম ঃ** দেশ, বিভাগ, জেলা, শহর ইত্যাদির নামে লিখন সুরু করুন এবং রাষ্টীয় দপ্তরের নাম পরে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

India. Ministry of Education

কলিকাতা। পূর্তবিভাগ।

কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কোন দপ্তরের দ্বারা প্রকাশিত বই হ'লে, তা দেশের নামের পরেই লিখুন ঃ

India. Bureau of Education.

তার পর প্রধান বিভাগের নামে একটি 'দেখুন লিখন' লিখুন ঃ

India. Ministry of Education. Bureau of Education. See
India. Bureau of Education.

৭২। **সঙ্ঘের নাম (সাধারণ নিয়ম)ঃ** সঙ্ঘের নামে পূর্ববর্তী article-টি (The বা a, an) বাদ দিয়ে লিখন সুরু করুন। যদি অন্য কোন নামে সঙ্ঘটি পরিচিত হয়, তা হ'লে সেই নাম থেকে 'দেখুন লিখুন' লিখুন। যে-স্থানে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত, সেই স্থানের নামটি আগে দিয়ে একটি 'দেখুন লিখন' লিখুন ঃ

(১) *Asiatic Society of Bengal*

(২) *Bengal, Asiatic Society of*
see
Asiatic Society of Bengal

(৩) *A S B* *see*
Asiatic Society of Bengal

যে-সব সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত নাম বেশি প্রচলিত, সেই সব সঙ্ঘের নাম সংক্ষিপ্তভাবে 'প্রধান লিখনে' ব্যবহার করা ভালো। কেবল পুরানাম থেকে একটি 'দেখুন লিখন' লিখে রাখলেই হ'লো।

৭৬। **কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ;** কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে লিখন হবে। যেমন ঃ

কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়

তবে *Calcutta, University* লিখলে *University of Calcutta* নামে একটি 'দেখুন লিখন' লেখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোন সঙ্ঘের দ্বারা প্রকাশিত বই হ'লে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রথমে লিখে, পরে সঙ্ঘের নাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন ঃ

কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রসঙ্ঘ।

(ঙ) **নাম-লিখন**

১৩৬। **বইয়ের নাম ঃ** লেখকের নাম-সমেত বইয়ের নাম সম্পূর্ণ-ভাবে লিখতে হবে। নামটি যেমনভাবে লেখা আছে, ঠিক তেমনিভাবে লিখতে হবে ; কেবলমাত্র যে-অংশগুলি বাদ দিলে নামের অঙ্গহানি হয় না, সেই অংশগুলি বাদ দেওয়া চলবে। যে-অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই অংশের স্থলে (...) তিনটি বিন্দু দিতে হবে। নামের পাতায় যেরূপ ছেদ-চিহ্ন (punctuation) থাকবে, ঠিক সেইরূপই ছেদ-চিহ্ন দিতে হবে। ছেদ-ছিহ্ন না থাকলে ছেদ-চিহ্ন বসাতে হবে (আমাদের দেওয়া নমুনা দেখুন)।

হাতে লেখা 'লিখন' লেখার সময় বইয়ের নাম সংক্ষেপ করা চলবে।

১৪৩। **দুই নামে ছাপা একই বই ঃ** এরূপ ক্ষেত্রে দু'খানি বইয়েরই পুরা লিখন লিখতে হবে এবং একখানি বইয়ের লিখন লিখলে অপর বইখানি সম্বন্ধে টীকা দিতে হবে।

১৪৭। **নামপত্র-হীন পুস্তক ঃ** নামপত্র না থাকলে, সম্ভব হ'লে, পুস্তকের নাম পুস্তক-তালিকা দেখে খুঁজে বার করতে হবে এবং বই-খানির যে নামের পাতা নেই, তা টীকায় লিখতে হবে। আর, যে-তালিকা থেকে পুস্তকের নামটির সন্ধান করা হয়েছে, সেই তালিকার নামও টীকার মধ্যে থাকবে। নাম খুঁজে না পাওয়া গেলে 'অর্ধনাম', তা-ও যদি না থাকে, তবে পাতার 'শীর্ষক-নাম' ব্যবহার করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে নামটি (... ...) বন্ধনীর মধ্যে রাখতে হবে।

১৪৮। **সংস্করণ ঃ** সংস্করণকে বইয়ের নামের অংশ বলে ধরে নিন। বইয়ের নামের পাতার যে-অংশে সংস্করণের উল্লেখ আছে, ঠিক সেই অংশে সংস্করণের কথা লিখুন।

বইয়ের নাম শেষ হওয়ার পর সংস্করণের উল্লেখ থাকলে নামের পরেই সংস্করণ লিখুন। সম্পাদকের নামের পর সংস্করণের উল্লেখ থাকলে সম্পাদকের নামের পর সংস্করণ লিখুন। নামের পাতার পিছন দিকে সংস্করণ ছাপা থাকলে, বইয়ের নামের পর সংস্করণ লিখুন।

(চ) প্রকাশের স্থান ও তারিখ, প্রকাশকের নাম ঃ

১৫০। **প্রকাশের স্থান ঃ** বইয়ের নাম শেষ হ'লে, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করুন। নামের পাতায় যে-ভাষায় স্থানের নাম লেখা আছে, সেই ভাষাতেই লিখতে হবে।

১৫২। **প্রকাশকের নাম ঃ** প্রকাশের স্থানের নামের পর প্রকাশকের নাম লিখুন। পুস্তকের নামের পাতায় প্রকাশকের নামটি যে-ভাষায় ছাপা আছে, সেই ভাষাতেই লিখুন।

১৫৫। **প্রকাশের তারিখ :** পুস্তকের নামের পাতায় তারিখ থাকলে, প্রকাশকের নামের পর তারিখ উল্লেখ করুন।

১৫৬। **প্রকাশের তারিখ না থাকলে** তারিখ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করুন। যদি তারিখ পাওয়া যায়, তা হ'লে সে-তারিখ (.... ....) বন্ধনীর মধ্যে রাখুন। তারিখ পাওয়া না গেলে একটা সম্ভবপর তারিখ দেবার চেষ্টা করুন।

১৫৭। **কপিরাইটের তারিখ :** নামপত্রে প্রকাশের তারিখ না থাকলে এবং তারিখ কোথাও খুঁজে পাওয়া না গেলে, কপিরাইটের তারিখ ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তারিখের আগে একটি c' বসিয়ে তারিখটি বন্ধনীর মধ্যে দিতে হবে। যেমন : (c 1843)।

১৬৪। **বইয়ের আকার :** পুস্তকের উপর-নীচের মাপ সেন্টিমিটারে দিন।

আমরা আমাদের লিখনে মাপ ব্যবহার করি নাই। সব বইয়ের মাপ দেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না। তবে বড় আকারের, কি খুব ছোট আকারের বই হ'লে বইয়ের মাপ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

(ছ) বড় অক্ষর, ছেদ

১৭২। **বড় অক্ষর :** ব্যক্তির নাম, দেশের নাম ও কোন সঙ্ঘের নামের গোড়াকার অক্ষর বড় হবে। বইয়ের নামের গোড়ার অক্ষর বড় হবে। ভাষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেখানে কোন কথার প্রথম অক্ষর বড় হওয়া প্রয়োজন এবং ব্যাকরণ অনুসারে যে-সব ক্ষেত্র-অনুযায়ী

বড় অক্ষর ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-সব ক্ষেত্রে বড় অক্ষর ব্যবহার করতে হবে।

মনে রাখবেন, জার্মান ভাষায় যে-কোন বস্তুর নামের (nouns) আদ্যক্ষর বড় হয়। কোন নাম বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হ'লে ফরাসী ভাষায় তার আদ্যক্ষর বড় হয় না।

১৭৩। **ছেদ**ঃ ছেদ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি। নামের পাতায় ছেদ থাকলে, তা যেমন আছে, তেমনি ব্যবহার করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট

পুস্তকের জাতিবিচার সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত

পুস্তকের জাতিবিচার সম্বন্ধে এই পুস্তকে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এ-কথাও আমরা বলেছি যে, একখানি পুস্তকের জাতিবিচার অনেক সময় বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে। সেই জন্যে অনেক সময় গ্রন্থাগারের গ্রন্থগারিককে বা যিনি পুস্তকেরও জাতি বিচার করেন, তাঁকে মহাসমস্যায় পড়তে হয়।

ধরুন, কোন গ্রন্থগারের পুস্তকের জাতিবিচার করবার ভার যে-ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে পুস্তকের জাতিবিচার করে গেছেন। সেই ব্যক্তির পর আর একজনের উপর জাতিবিচারের ভার পড়লো। ইনিও তাঁর ব্যক্তিগত বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে পুস্তকের জাতিবিচার করতে থাকলেন। তার ফলে একই বইয়ের বা একই ধরণের বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসংখ্যা হ'তে থাকলো। এরূপ অবস্থাসৃষ্টি হ'লে গ্রন্থগারের অবস্থা কিরূপ হবে, তা সহজেই আঁচ করতে পারা যায়।

অবশ্য, যিনি নতুন এলেন, তিনি যদি নিজের মতামতের উপর নির্ভর না ক'রে 'শেল্ফ-তালিকা' দেখে পুস্তকের সংখ্যা দিতে থাকেন, তা হ'লে সমস্যা কতকটা দূর হয় বটে, কিন্তু পুরাতন ভুলের সংশোধন হয় না, পুস্তকের জাতিবিচার একটা গতানুগতিক অবস্থায় চলতে থাকে। এরূপ ভুল থাকলে পাঠককে মুশকিলে পড়তে হয়। কারণ, পাঠক যে-বিষয়ের বই পাবে বলে আশা করে, সে-বিষয়ের বই সে পায় না। তার ফলে বদনাম হয় পুস্তকের জাতি-বিচারকের। আবার পুরাতন ভুল সংশোধন করাও খুব সোজা কথা নয়। কারণ, একখানি বইয়ের জাতিসংখ্যা সংশোধন করতে হ'লে তা সংশোধন করতে হবে বইয়ের ভিতরে ও শিরদাঁড়ায় বা 'পুটে', পুস্তকের পরিচয়পত্রে, পুস্তকাগমনের খাতায়, লেখক-তালিকায়, শেল্ফ্-তালিকায় ও বিষয়-তালিকায়।

এই সকল কারণে পুস্তকের জাতিবিচারের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম থাকলে ভালো হয়। তা হ'লে গ্রন্থাগারে পুস্তকের জাতিবিচার করবার সময় ভ্রম হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে একই বই একই নম্বরে নির্দিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয়।

এ সম্বন্ধে প্রধান পুস্তক হচ্ছে উইলিয়াম স্টেটসন মেরিল (William Stetson Merill)-এর 'Code for Classifires'। এ-বইখানি বড় বড় গ্রন্থগারে পুস্তকের জাতিবিচারকের পার্শ্বে সব সময় থাকা প্রয়োজন।

পুস্তকের জাতিবিচার সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম আমরা এখানে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন, **পুস্তকের জাতিবিচার সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। কারণ, পুস্তকের জাতিবিচার নির্ভর করবে জাতিবিচারকের অভিজ্ঞতার উপর, গ্রন্থগারের উপর এবং পাঠকের সুবিধার উপর।**

তা হ'লেও কয়েকটি সাধারণ নিয়ম থাকা ভালো। কারণ, জাতিবিচারক সে-নিয়মগুলিকে পথনির্দেশকরূপে ব্যবহার করতে পারে। এই নিয়মগুলি যে জাতিবিচারের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বহু সমস্যা দূর করতে পারবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

(১) বইখানি বিচার করবার সময় লেখকের **দৃষ্টিকোণ ধরবার চেষ্টা করুন**। কোন্ পাঠকের জন্যে লেখক বইখানি লিখেছেন, তা বুঝবার চেষ্টা করুন। লেখক যে-বিষয় সম্বন্ধে বই লিখেছেন, তার খোঁজ পাবেন বইয়ের নামের পাতায় ও সূচীপত্রে এবং তা'তেও যদি সন্দেহ দূর না হয়, তা হ'লে বইখানি কিছু কিছু পড়ে দেখুন।

(২) **সূক্ষ্মভাবে বইখানির জাতিবিচার করতে চেষ্টা করুন।** এমন একটি জাতিসংখ্যা দিন, যে-জাতিসংখ্যা কেবলমাত্র পুস্তকের বিষয়কেই বুঝাবে।

আগে বিষয়, পরে স্থান। প্রথম দেখুন, বইয়ের বিষয়টি কি। তার পর দেখুন, লেখক কোনও স্থান অনুসারে বিষয়টি লিখেছেন কিনা কিংবা বিষয়টির অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে কিনা। যেমন ধরুন, ভারতের 'লোককথা'। বইখানির বিষয় লোককথা সুতরাং বইখানিকে লোককথার মধ্যেই রাখতে হবে। পরে যদি জাতিবিচারের ছকে লোককথার স্থানীয় বিভাগ থাকে, তা হ'লে স্থানানুযায়ী সংখ্যা দিতে হবে। পুস্তকের জাতিবিচারের সময় এরূপ সমস্যা প্রায়ই দেখা দেবে। ধরুন, আর একখানি বই 'শিক্ষা-পরিসংখ্যান'। এখানে বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং আমাদের নিয়ম অনুসারে বইখানি রাখতে হবে শিক্ষার মধ্যে। পরে যদি কোন উপায় থাকে, তা হ'লে শিক্ষাকে পরিসংখ্যানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করতে হবে।

ডিউই'র ছক অনুসারে শিক্ষা হচ্ছে ৩৭০ এবং পরিসংখ্যানের সংখ্যা হচ্ছে ৩১০। এখন ইচ্ছা করলে বইখানির জাতিসংখ্যা দেওয়া যায় ৩৭ঃ৩১। ৩৭ হ'লো শিক্ষার সংখ্যা ; কারণ শূন্যের কোন মূল্য নাই এবং পরিসংখ্যানের সংখ্যা হ'লো ৩১। ডিউই অনুসারে 'কোলন' চিহ্নটি (ঃ) সম্বন্ধ নির্দেশ করে। কিন্তু ধরুন, বইখানি কোন পরিসংখ্যান-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের জন্য কেনা হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৩১ : ৩৭ হ'লে ভালো হয়।

(৩) ঠিক উপরিউক্ত কারণে সময় সময় বিশেষ **প্রয়োজনানুসারে নিয়মভঙ্গ করা প্রয়োজন**।

(৪) কোন একটি বিষয়ের **একটি দিক** সম্বন্ধে কোন বই রচিত হ'লে, বিষয়ের মধ্যে বইখানিকে রাখা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, 'শিক্ষা ও সামাজিকতা', 'Economic Aspect of Politics' ইত্যাদি বই। এ-সব ক্ষেত্রে বই দু'খানির একখানিকে রাখতে হবে শিক্ষার মধ্যে, আর একখানিকে রাখতে হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে।

(৫) **কোন বিষয়ের ইতিহাস সব সময়ে বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে**। বিষয়টির ইতিহাসের কোন বিভাগ না থাকলেও এরূপ বই বিষয়ের

অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কোন বিষয়ের ইতিহাস বলতে যে কি বোঝায়, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। পাঠক যেন কোন বিষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাসের গোলমাল ক'রে না ফেলেন। ডিউই'র বিভাগের ছকের মধ্যে বিষয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু স্থলে ব্যবস্থা করা আছে। যে-স্থলে ০৯ বা ০০৯ দিয়ে বিভাগ সম্ভব হয় না, সেখানে ০০০৯ সংখ্যা ব্যবহার করলেই কাজ মিটে যায়।

৬। একখানি পুস্তকে **একাধিক বিষয় থাকলে** প্রথমে দেখতে হবে বিষয়গুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে :

(ক) যদি দু'টি বিষয় সম্বন্ধযুক্ত হয়, তা হ'লে **একটি বিষয়ের প্রভাব যে-বিষয়ের উপর পড়ছে, সেই বিষয়টিতে বইখানি রাখুন**। যেমন : বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ। বইখানি রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথে। Communism & Aeronautics বইখানি রাখতে হবে Aeronauticsএ।

(খ) **বিষয়গুলি যদি সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তা হ'লে প্রথম দেখুন, কোন্ বিষয়টি বিশদভাবে বলা হয়েছে** এবং সেই বিষয়ের মধ্যেই বইখানি রাখুন। সন্দেহস্থলে প্রথম বিষয়টি অনুসারেই বইখানির জাতিবিচার করুন।

(গ) **কোন বিষয় ও তার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বই হ'লে উৎপত্তির কারণের মধ্যে বইখানিকে রাখুন**। যেমন ধরুন, 'কিংবদন্তী ও সভ্যতা'। এক্ষেত্রে বইখানিকে মানবসভ্যতায় না রেখে কিংবদন্তীর বিভাগে রাখা প্রয়োজন।

৭। কোন ব্যক্তির **স্মৃতি-উৎসব** বা **কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষ্যে কোন বই লেখা হ'লে অথবা বইখানি কোন উৎসবের সময় প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সংগ্রহ হ'লে বইখানিকে পুস্তকের বিষয়ে রাখতে হবে।

৮। **অনুবাদ** : আসল বইয়ের সঙ্গে রাখতে হবে।

৯। **অভিধান** : কোন ভাষার অভিধানকে সেই ভাষার মধ্যে ফেলতে হবে। **বিশ্বকোষকে যেন অভিধান বলে ধরা না হয়**। বিশ্বকোষ সব

বিষয়েরই সাধারণ জ্ঞানসম্বন্ধীয় বই। বিশ্বকোষকে সাধারণ জ্ঞানের বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

অভিধান দু'টি ভাষায় হ'লে, প্রথমতঃ যে ভাষাটি কম প্রচলিত, সেই ভাষায় অভিধানখানিকে ফেলতে হবে, পরে অন্য ভাষার সংখ্যা দিতে হবে। যেমন ইংরেজী-বাংলা অভিধান হ'লে ডিউই'র ছক অনুসারে সংখ্যা হবে: ৪৯১·৪৪ (বাংলা ভাষা)। অভিধানের সংখ্যা হচ্ছে ৩। তা হ'লে বাংলা ভাষার অভিধান হ'লো ৪৯১·৪৪৩; এইবার এই সংখ্যার সঙ্গে ২ (ইংরাজী) জুড়ে দিন। তা হ'লে ইংরেজী-বাংলা বা বাংলা-ইংরেজী অভিধানের সংখ্যা হ'লো ৪৯১·৪৪৩২।

১০। **বর্ষপঞ্জী:** যে-বিষয়ের বর্ষপঞ্জী, সেই বিষয়ে ফেলুন এবং বর্ষপঞ্জীকে সাময়িক পত্র বলে ধরে নিয়ে বিষয়ের সঙ্গে সাময়িক পত্রের সংখ্যা শূন্যের পর ব্যবহার করুন। সাধারণতঃ বর্ষপঞ্জীর সংখ্যা হবে ৩০৫। যদি সাময়িক পত্রিকা থেকে ভিন্ন করে রাখতে চান, তা হ'লে সংখ্যা করুন ৩০৫·৮।

১১। **দর্শন:** দর্শনের বই দর্শনের বিভাগে রাখুন। কিন্তু **কোন বিষয়ের দর্শনের বই সেই বিষয়ের মধ্যে ফেলুন।** যেমন সাহিত্যের দর্শন, শিক্ষার দর্শন ইত্যাদি। কোন সাহিত্যিকের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার বই হ'লে বইখানিকে সাহিত্যিকের রচিত বইয়ের সঙ্গে রাখুন।

১২। **মনস্তত্ত্ব:** মনস্তত্ত্ব হ'লো মানুষের মনের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। কিন্তু বহু বিষয় মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। কেবলমাত্র মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বই হ'লে সেই বইখানিকে মনস্তত্ত্বে রাখতে হবে। কিন্তু কোন বিষয়ের মনস্তত্ত্ব হ'লে বইখানিকে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখে, পরে উপায় থাকলে তাতে মনস্তত্ত্বের সংখ্যা দিতে হবে। যেমন: সামাজিক মনস্তত্ত্ব, শিক্ষার মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি।

১৩। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান:** কোন একটি দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞান-দর্শনের ক্রম-বিকাশ সেই দেশের সংখ্যায় না রেখে রাখতে হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে।

১৪। **উদ্বাস্তু ঃ** ইংরেজী emigration-এর বাংলা ঠিক উদ্বাস্তু নয়। কোন ব্যক্তি নিজের দেশ ছেড়ে, যে কোন কারণেই হোক, আর এক দেশে গিয়ে বাস করলে তাকে বলে emigrant। আর এক দেশের লোক যখন বিভিন্ন দেশে যায়, তখন তাদের বলে immigrants। Immigrants সম্বন্ধে বই হ'লে রাখুন যে-দেশে এসে বাস করছে, সেই দেশের সংখ্যা দিয়ে immigrant-এর মধ্যে এবং যখন এক-দেশ থেকে বহুদেশে লোক ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে-দেশ থেকে লোক ছড়িয়ে পড়েছে, সেই দেশের সংখ্যা দিন।

১৫। **কোন দেশের সঙ্গে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ ঃ** এ-ক্ষেত্রে দেখুন লেখক কোন্ দেশকে বড় করে দেখাতে চান। এরূপ ক্ষেত্রের সংখ্যা হবে প্রথমে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের (৩২৭), পরে লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত দেশের সংখ্যা এবং পরে প্রয়োজনবোধে ও জাতিবিচারের ছকে উপায় থাকলে অন্য দেশটির সঙ্গে সম্বন্ধ দেখান। বইখানি যদি দুই দেশের কোন একটি রাষ্ট্রের দ্বারা ছাপা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে যে-দেশের রাষ্ট্রের দ্বারা ছাপা হয়েছে, সেই দেশের সংখ্যা প্রথম দিতে হবে। যেমন ধরুন, ভারত রাষ্ট্রের দ্বারা প্রকাশিত 'ভারত ও চীন' নামে যদি কোন বই থাকে, তা হ'লে ডিউই'র নিয়ম অনুসারে এ বই-খানির সংখ্যা হবে ঃ ৩২৭ (রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ), ৫৪ (ভারত) ও ০০৯৫১ (চীন)। শূন্য দু'টি লক্ষ্য করুন।

১৬। **রাজ্যের সীমানা-পরিবর্তন, সীমানা নিয়ে বিরোধ ইত্যাদি ঃ** সীমানা-পরিবর্তন বিষয়টি দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তনের মধ্যে ফেলা প্রয়োজন। সীমানা নিয়ে বিরোধ সম্বন্ধে লেখা বই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। এ-ক্ষেত্রে সীমানা প্রথম যে দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বইখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিতর সেই দেশের সংখ্যায় রাখুন।

১৭। **একদেশের উপর অন্য দেশের প্রভাব ঃ** প্রভাবান্বিত দেশ অনুসারে বইখানির জাতি-বিচার করুন।

১৮। **অর্থবিজ্ঞান ঃ** কোন দেশের আর্থিক বিবরণ বা পরিকল্পনা-সম্বন্ধীয় বই অর্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে রেখে দেশানুযায়ী বিভাগ করলে ভালো

হয়। কিন্তু বইখানি যদি এমন একখানি বই হয়, যা প'ড়ে একটা দেশ সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারা যাবে, তা হ'লে সেরূপ বইয়ে কেবল যে অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা থাকবে তা নয়, দেশের আচার-ব্যবহার, নদ-নদী, যাতায়াত-ব্যবস্থা, দেশের লোকের বিবরণ ইত্যাদি সব কিছুই সে-বই থেকে পাওয়া যাবে। এরূপ বইকে সেই দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভিতর না রেখে সেই 'দেশের বর্ণনা' অর্থাৎ ভূগোলের ভিতর রাখলে ভালো হয়।

কোনো দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-সম্বন্ধীয় বই সেই দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে রাখুন। কোন বিশেষ বিষয়ের পরিকল্পনা হ'লে, বইখানিকে সেই বিষয়ের মধ্যে রাখুন।

১৯। **কমিউনিজম:** অর্থনীতির ভিতর রাখুন। কোন দেশের কমিউনিজম্-এর ইতিহাস হ'লে, দেশের ইতিহাসের মধ্যে রাখুন। কমিউনিস্ট-পার্টি সম্বন্ধে বই হ'লে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে রেখে দেশীয় বিভাগ দিন।

২০। **আইন:** কোন বিষয়ের আইন হ'লে সেই বিষয়ের মধ্যে বইখানি রাখুন।

২১। **আন্তর্জাতিক আইন:** আন্তর্জাতিক সংঘ-সম্বন্ধীয় বই আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে রাখুন। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের দ্বারা প্রকাশিত কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় বই সেই বিষয়ের মধ্যে রাখুন।

২২। **শিক্ষা:** শিক্ষা দুই প্রকারের। এক হ'লো স্কুল-কলেজের শিক্ষা, আর দ্বিতীয় হ'লো ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষা। এই দু'প্রকারের বইই শিক্ষার মধ্যে পড়বে। কিন্তু কোন একটি ব্যবসায়ের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বই সেই ব্যবসায়ের বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে এবং ছকের মধ্যে উপায় থাকলে বইখানি যে-বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রচিত, তা নির্দেশ করতে হবে। ডিউই'র সংখ্যা অনুসারে আসল সংখ্যার সঙ্গে ০৭ যোগ করলেই কাজ মিটে যায়।

২৩। **বিজ্ঞান:** বিজ্ঞান বিষয়টিই যেমন একটি স্বতন্ত্র বিষয়, তেমনি সব বিষয়েরই আবার বিজ্ঞান থাকতে পারে। যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান,

ভাষাবিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান ইত্যাদি। এরূপ কোন বইয়ে যদি বিষয়টি দর্শনের দিক থেকে বিচার করা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সেরূপ বই সেই বিষয়ের সাধারণ ক্ষেত্রে রাখতে হবে এবং ছকের মধ্যে উপায় থাকলে দর্শনের সংখ্যা (০১) যোগ করতে হবে। বইখানি যদি কেবলমাত্র কোন বিষয় সম্বন্ধে হয়, তা হ'লে বইখানি সেই বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

বিজ্ঞানের বই বিজ্ঞানের ভিতরে রাখতে হবে।

(ক) **বিজ্ঞানের কোন একটি ক্ষেত্রের বিজ্ঞানের অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঃ এ-ক্ষেত্রে যে-বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই বিষয়ের মধ্যে বইখানি রাখুন।** যেমন ঃ ভূতত্ত্ব-রসায়ন ভূতত্ত্বের ভিতর যাবে।

এরূপ ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার হ'লে, 'কোলন' (ঃ) দিয়ে বিষয়গুলির একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ দেখালে ভালো হয়। ধরুন, যদি গ্রন্থাগার রসায়নের গ্রন্থাগার হয়, তা হ'লে প্রায় সব বইয়েরই প্রথম সংখ্যা ডিউই অনুসারে ৫৪০-এর মধ্যে থাকবে এবং পরের সংখ্যা (ঃ)-এর পর বিষয়ানুযায়ী হবে।

(খ) স্থানীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই হ'লে বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রথমে বইখানিকে রাখতে হবে। পরে উপায় থাকলে স্থানীয় সংখ্যা দিতে হবে। যেমন বাংলার জীবজন্তু, বাংলার ভূতত্ত্ব ইত্যাদি।

(গ) **অঙ্কশাস্ত্র ঃ** অঙ্কের বই অঙ্কের মধ্যেই রাখতে হবে। কোন বিষয়ের অঙ্ক হ'লে সেই বিষয়ের মধ্যে রাখলে ভালো হয়। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে যে কোন অঙ্কের বই অঙ্কের মধ্যেই রাখা প্রয়োজন।

(ঘ) **বৈজ্ঞানিক ভ্রমণ ঃ** বইয়ের অন্তর্নিহিত চরিত্র সাধারণ ভ্রমণের মত হ'লে সাধারণ ভ্রমণ-বিষয়ের মধ্যে বইখানি রাখতে হবে। **কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়ে যদি ভ্রমণ করা হ'য়ে থাকে এবং যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রমণের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়, তা হ'লে বইখানি বিজ্ঞানের মধ্যে রাখতে হবে।**

(ঙ) **আণবিক দর্শন :** এর ক্ষেত্র তিনটি : দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। পুস্তকের দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিচার করুন।

(চ) **বৈদ্যুতিক শক্তি :** সাধারণতঃ পদার্থবিদ্যার মধ্যে থাকবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিষয়ানুসারে রাখতে হবে।

(ছ) **ক্রমবিকাশ :** ক্রমবিকাশ বলতে সাধারণতঃ বোঝা যায় জীব-বিদ্যা। কিন্তু সব বিষয়েরই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বই থাকতে পারে। গাছপালা ও জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বই হ'লে তা 'বাইওলজি'র বা জীববিদ্যার মধ্যে রাখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধীয় বই সেই বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

২৪। **বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্র :** বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে-সব নিয়মের কথা বলেছি, তার বেশির ভাগই এক্ষেত্রে কাজে লাগবে। এ-ক্ষেত্রে নতুন করে বলবার কিছু নেই। গ্রন্থাগারের চরিত্র অনুসারে এ-ক্ষেত্রে পুস্তকের জাতিবিভাগ করলে ভালো হয়।

২৫। **ললিতকলা :** ললিতকলা-সম্বন্ধীয় বই ললিতকলার ভিতরেই থাকবে এবং ললিতকলার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বই সেই সব ক্ষেত্রের বইয়ের সঙ্গে রাখতে হবে :

(ক) **ছবির বই :** ছবির বই বলতে সব বিষয়েরই ছবির বই হ'তে পারে। ললিতকলার কোন সম্প্রদায়ের শিল্প-সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানের বর্ণনামূলক ছবির বই সেই সম্প্রদায়-সংক্রান্ত বইয়ের মধ্যে থাকবে।

(খ) **কোন দেশের বর্ণনা-সম্বন্ধীয় ছবির বই হ'লে সেই দেশের বর্ণনা-সংবলিত বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে।**

(গ) **ছবির দ্বারা কোন ব্যক্তির জীবনী বর্ণিত হ'লে, তা ব্যক্তির জীবনীর মধ্যে রাখতে হবে।**

(ঘ) কোন ঘটনার বর্ণনামূলক ছবির বই হ'লে, তা সেই ঘটনা-সম্বন্ধীয় বইয়ের ভিতর রাখতে হবে। যেমন : 'চিত্রে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম' ইত্যাদি।

(ঙ) **কোন বিষয় ছবির দ্বারা বর্ণিত হ'লে, সেই ছবির বই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে থাকবে।** যেমন আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের দ্বারা প্রকাশিত ব্যক্তিস্বাধীনতার ছবির বই।

এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, কলার দিক থেকে ছবির বইয়ের যতই প্রাধান্য থাকুক না কেন, কোন ছবির বই যদি কোন বিষয়ের বর্ণনামূলক হয়, তা হ'লে সেই ছবির বই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে। **অনেক গ্রন্থাগারে ছবির বই হ'লেই তা কলার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু পুস্তকের এরূপ জাতিবিচার নিরতিশয় আপত্তিজনক।**

২৬। **গানের বই:** রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' রাখতে হবে সাহিত্যের ভিতরে। কিন্তু **গীতবিতানের স্বরলিপি রাখতে হবে ললিতকলার ভিতরে।**

২৭। **চলচ্চিত্র:** শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র হ'লে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে রাখুন। স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্র স্বাস্থ্যের বইয়ের মধ্যে থাকবে। ভ্রমণ-সংক্রান্ত চলচ্চিত্র হ'লে তা ভ্রমণের বইয়ের মধ্যে থাকবে। গ্রন্থাগারের কার্যের বর্ণনামূলক চলচ্চিত্র গ্রন্থাগার-পরিচালনা-সম্বন্ধীয় বইয়ের মধ্যে থাকবে।

২৮। **ভাষা:**

(ক) **ভাষাশিক্ষার** জন্য কোন ভাষার সাহিত্যের সংকলন-পুস্তক হ'লে তা সেই ভাষার বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

(খ) **স্কুলপাঠ্য** কোন বই যদি ভাষাশিক্ষার উদ্দেশে লেখা হ'য়ে থাকে, তবে তা সংশ্লিষ্ট ভাষার মধ্যে রাখতে হবে।

(গ) **কোন ভাষার নমুনা** হিসাবে সংকলিত বই সেই ভাষার বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

কোন সাহিত্যের নমুনা হিসাবে সংকলিত বই সেই ভাষার সাহিত্যের মধ্যে রাখতে হবে।

(ঘ) **অনুবাদ**-পুস্তক রাখতে হবে যে-সাহিত্যের অনুবাদ, সেই সাহিত্যের বইয়ের ভিতরে।

(ঙ) **মুদ্রা বা পদক**-সম্বন্ধীয় বইতে যদি কোন দেশ বা যুগের ভাষার বর্ণনা থাকে, তা হ'লে সেরূপ বই সেই ভাষার বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

(চ) **শিলালিপি, তাম্রলিপি**ঃ এ-সবই সংশ্লিষ্ট ভাষার বইয়ের মধ্যে রাখতে হবে।

(ছ) **কোন সাহিত্যের সংকলন** যদি বিশেষ ক'রে কোন বিষয়-বর্ণনার জন্য সংকলিত হ'য়ে থাকে, **তা হ'লে সে-বই সেই বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে।**

২৯। **অভিধান**ঃ অভিধান সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলেছি।

৩০। **সাহিত্য**ঃ সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ গদ্য, পদ্য, নাটক, বক্তৃতা, ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু সাহত্য বলতে যে-কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় রচনাকে সাহিত্য বলা চলে। এমন অনেক বই আছে, যে-বইগুলি কোন বিষয় সম্বন্ধে লিখিত হ'লেও সাহিত্যের অর্থবিচারের দিক থেকে দেখা যাবে, সাহিত্য হিসাবে যথেষ্ট মূল্য বহন করে। **কল্পনামূলক রচনা হ'লে তাকে সাহিত্যের মধ্যে ফেলা চলে; কিন্তু বর্ণনামূলক সাহিত্য হ'লে, যে-বিষয়ের বর্ণনা, সেই বিষয়ের মধ্যে তা রাখা প্রয়োজন।**

সাহিত্য বলতে সত্যিকারের যে কি বোঝায়, তা বলা কঠিন। তবে এটুকুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে-লেখা লেখকের সম্পূর্ণ মুক্তচেতনার সৃষ্টি, অর্থাৎ যে-সৃষ্টির মধ্যে লেখক সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, সেরূপ সৃষ্টিকেই সাহিত্য বলা যেতে পারে। এ-সম্বন্ধে আমরা 'জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক-নির্বাচন' বইয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি।

(ক) **রচনা**ঃ কোন বিষয় সম্বন্ধে রচনা হ'লে তা সেই বিষয়ের বইয়ের মধ্যে যাবে।

(খ) **বক্তৃতা :** কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতার বই হ'লে, তা সেই বিষয়ের মধ্যে যাবে।

(গ) **নাটক :** 'বিদ্যাসাগর', 'মধুসূদন'—এই ধরণের নাটক সাধারণতঃ নাটকের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু মনে হয়, এ-সব নাটক ব্যক্তিগত জীবনীর মধ্যেই রাখা ভালো। অবশ্য, এ-সব বইয়ে ব্যক্তিগত জীবনের, না সাহিত্যের প্রাধান্য ফুটে উঠেছে, তা বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন।

(ঘ) **কবিতা :** 'লোককথা', 'প্রবাদবাক্য' ইত্যাদির সংকলন লোক-কথা বা প্রবাদবাক্যের মধ্যে রাখা ভালো।

(ঙ) **কোন লেখকের লেখা সম্বন্ধে আলোচনার বই** সেই লেখকের অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।

(চ) **সাধারণ সাহিত্য-সমালোচনা** সাহিত্যের দর্শনের মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

(ছ) **সাহিত্যের ইতিহাস :** সাধারণ সাহিত্যের ইতিহাস হ'লে সাহিত্যের ইতিহাসে রাখতে হবে।

(জ) **কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস** হ'লে সেই দেশের সাহিত্যের মধ্যে রাখতে হবে।

(ঝ) **কোন দেশের সাহিত্যের উপর অন্য দেশের সাহিত্যের প্রভাব**-সম্বন্ধীয় বই প্রভাবান্বিত সাহিত্যের মধ্যে রাখতে হবে।

(ঞ) **শিশুদের সম্বন্ধে লিখিত বই** শিশুসাহিত্যের মধ্যে রাখুন।

(ট) **উপন্যাসের নাট্য-রূপ বা উপন্যাসে রূপান্তরিত নাটক :** উপন্যাস নাট্যাকারে প্রকাশিত হ'লে তা নাটকের ভিতর রাখুন। নাটক উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হ'লে তা উপন্যাসের ভিতর রাখুন।

৩১। **প্রবন্ধ-সাহিত্য :** কোন বিষয় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের বই সেই বিষয়ের মধ্যে যাবে।

বহু বিষয় সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধের বই সাহিত্যের মধ্যে ফেলুন।

সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধের বই সাহিত্যের মধ্যে রাখুন।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা রচনা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে রাখুন।

৩২। **বিশেষ বিশেষ লেখক সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাঃ** কোন লেখক কেবল প্রবন্ধ এবং কোন লেখক কেবল উপন্যাস লিখতে পারেন, কোন লেখক কেবল নাটক লিখতে পারেন, আবার কোন লেখক কেবল কবিতাই লিখতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখকেরও অভাব নেই, যিনি একাধারে কবি, ঔপ্যন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। ভিকৃতর হুগো একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ছিলেন। গোল্ডস্মিথ সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত। যাঁরা সাহিত্যের কেবল একটি ক্ষেত্রের চর্চা ক'রে গেছেন, তাঁদের বইয়ের জাতিবিচারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁদের প্রতিভা বহুমুখী, তাঁদের লেখার জাতিবিচারের ব্যাপারে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মত হচ্ছে, **এইরূপ লেখকের গ্রন্থাবলী, লেখক সাহিত্যের যে-ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেইক্ষেত্রে রাখা ভালো।** যেমন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী কবিতার মধ্যে রাখতে হবে; মধুসূদনের গ্রন্থাবলী কবিতার মধ্যে রাখতে হবে। **কিন্তু গ্রন্থাবলী বাদে এই সব লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বই সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া ভালো।**

কোন এক দেশের লেখক যদি অপর কোন দেশের ভাষায় বই লেখেন, তা হ'লে তিনি যে-দেশের ভাষায় বই লিখেছেন, সেই দেশের ভাষার সাহিত্যের মধ্যে তাঁর বইয়ের স্থান করতে হবে। এই হ'লো সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু এ-নিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ, ভাষাটাই সাহিত্য নয়। সাহিত্যের নিজস্ব চরিত্র আছে। যেমন মুল্‌করাজ আনন্দের বই। মুল্‌করাজ আনন্দের বই কেবল ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়েছে ব'লেই

তা ইংরাজী সাহিত্যে পড়বে, এ-দাবী অন্যায় ব'লেই মনে হয়। কারণ, মূল্কুরাজ আনন্দের উপন্যাসে যে জীবনরূপ ফুটে উঠেছে, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। সুতরাং তাঁর বই ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে পড়বে, এ-দাবী করা কিছু অন্যায় হবে না।

৩৩। **ইতিহাস ঃ ইতিহাস বললে সাধারণতঃ বোঝায় রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর বর্ণনা।** কিন্তু সব-কিছুরই ইতিহাস থাকতে পারে। যেমন ঃ রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস। এই সকল ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্ন ক'রে দেখা মুশকিল নয়। কোন দেশের সভ্যতার ইতিহাস এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ইতিহাসের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ইতিহাস অর্থশাস্ত্রের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক ইতিহাস সমাজতত্ত্বের মধ্যে রাখলে ভালো হয়।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে একটু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ, রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর উৎপত্তির মূল কারণ অর্থনৈতিক হ'তে পারে। কেবল সেই কারণে কোন বই কোন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে রাখা ঠিক হবে না। সাধারণ ইতিহাসের মধ্যেই তা রাখতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ইতিহাস এক নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক মতামতের ক্রমবিকাশ দেখানো হ'য়ে থাকলে, তা সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

৩৪। **স্বাধীনতাসংগ্রাম ঃ** ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে লেখা পুস্তকের জাতিবিচার করবার সময় লেখকের উদ্দেশ্য বিচার ক'রে দেখতে হবে। **বইখানিতে যদি কেবলমাত্র স্বাধীনতাসংগ্রাম-সম্বন্ধীয় বর্ণনা এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের ক্রমবিকাশের বিবরণ থাকে, তা হ'লে বইখানি স্বাধীনতাসংগ্রামের বইয়ের মধ্যেই রাখতে হবে।** কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের বই লিখতে গিয়ে যদি লেখক ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রম-বিকাশ দেখিয়ে থাকেন, তা হ'লে সে-বই ইতিহাসের মধ্যেই রাখতে হবে।

৩৫। **ভ্রমণকাহিনী**ঃ ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনীর বই ভ্রমণের মধ্যে রাখুন। তেনজিং-এর এভারেস্ট-বিজয় কিন্তু 'পর্বতারোহণ'-সম্বন্ধীয় বইয়ের মধ্যে ফেলতে হবে।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিছক ভ্রমণ হ'লে, সেই ভ্রমণবৃত্তান্তের বই ভ্রমণের ভিতর রাখতে হবে।

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করা হ'লে এবং বইতে সেই উদ্দেশ্যের প্রাধান্য থাকলে, উদ্দেশ্যের বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বইখানি রাখতে হবে। যেমন বৈজ্ঞানিক ভ্রমণ, প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্রমণ, ভূতাত্ত্বিক ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ের বই বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের মধ্যে যাবে।

৩৬। **পুরাতত্ত্ব**ঃ ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছুই নেই। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ঘটনাবলী লিখিত নথিপত্র থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ভূগর্ভে প্রোথিত শিলালিপি, তাম্রলিপি, শিল্পনিদর্শন ইত্যাদি নানাপ্রকার উপকরণ থেকে কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস লেখা হয়। এই কারণে পুরাতত্ত্ব ইতিহাসের মধ্যেই রাখা প্রয়োজন।

৩৭। **জীবনী**ঃ জীবনী নিয়ে বহু মতভেদ আছে। এ-বিষয়ে আমরা মাঝে মাঝে ইঙ্গিত দিয়েছি।

(ক) জীবনীর বই জীবনীর মধ্যে রেখে, যাঁর জীবনী তাঁর নামের আদ্যক্ষর অনুসারে সাজিয়ে রাখা যায়।

(খ) কোন ব্যক্তির জীবনী তাঁর ব্যক্তিগত কর্মসাধনা অনুসারে বিভাগ ক'রে রাখা যায়।

(গ) কিংবা জীবনীগুলিকে জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিষয় অনুসারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

প্রথম নিয়ম অনুসারে বই সাজালে আমাদের বই-সাজানোর উদ্দেশ্য নষ্ট হ'য়ে যাবে। কারণ, জীবনীর বিষয় ব্যক্তি হ'লেও, ব্যক্তিত্বই তার প্রকৃত

চরিত্র নয়। ব্যক্তির চরিত্রগত লক্ষণ হচ্ছে তার বৃত্তি, বা সে যে-কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত, সেই কর্ম। যেমনঃ রাম অধ্যাপক, লক্ষণ উকিল, জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী। রামের চরিত্র হচ্ছে তার অধ্যাপনার কার্য। এই কার্য থেকে রামকে বাদ দিলে রামকে আর চেনা যায় না। সুতরাং আমাদের বিভাগের ভিত্তি যখন বিষয়ের চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন ব্যক্তি এখানে বিষয় হ'লেও, তার মূলচরিত্র হচ্ছে তার বৃত্তি, তার কার্য। সুতরাং আমাদের মতে জীবনীর বই জীবনীতে না রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বইয়ের মধ্যে রাখা ভালো। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে রাখলেও বইখানিকে যাতে জীবনী ব'লে চেনা যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত।

আর একটি উপায় হচ্ছে, জীবনীর বই জীবনীতে রেখে যে ব্যক্তির জীবনী, তার বৃত্তির বা বিশেষ কর্মক্ষেত্রের নির্দেশ জুড়ে দেওয়া।

জীবনী নিয়ে আর একটা সমস্যা আছে। অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তির জীবনীর ভিতর ব্যক্তিগত কর্মসাধনা সম্বন্ধে এত বেশি আলোচনা থাকে যে, জীবনী অপেক্ষা তাঁদের বৃত্তির বা কর্মসাধনার মূল্য বেশি হ'য়ে থাকে। আমাদের মতানুযায়ী বিভাগ করলে সে সমস্যা দূর হ'তে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে যে-বিষয়গুলির জাতিবিচারের সময় সমস্যা দেখা দেয়, সেই সম্বন্ধে আমরা আমাদের মতামত দিলাম। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জাতিবিচার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, জাতিবিচার নির্ভর করবে পাঠক সম্বন্ধে জাতি-বিচারকের অভিজ্ঞতার উপর।

কোন একখানি বই কোন স্থানে রাখার পরও যদি দেখা যায়, বইখানির ব্যবহার হচ্ছে না, তা হ'লে বুঝতে হবে, বইখানি হয় একেবারে অকেজো, না হয় বইখানি ঠিক স্থানে রাখা হয় নি। সুতরাং বইখানির স্থানের পুনর্বিচার করার প্রয়োজন হয়।

কয়েকপ্রকার বিশেষ ধরণের বইয়ের জাতিবিচার

এইবার আমরা আরো কয়েকপ্রকার বিশেষ ধরণের বইয়ের কথা বলবো। এই বইগুলিকে কোন একটি বিষয়ের ভিতর রাখা যায় না। কারণ, সেগুলি জ্ঞানের সাধারণ ক্ষেত্রের বই :

(১) **পুস্তক-তালিকা** : পুস্তক-তালিকা বলতে প্রধানতঃ দু'রকম তালিকা বোঝায় :

প্রথমতঃ কোন বিষয়ের পুস্তক-তালিকা ; এবং

দ্বিতীয়তঃ কোন দেশে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের তালিকা।

আর এক প্রকারের পুস্তক-তালিকাও আমরা এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফেলতে পারি :

তৃতীয়তঃ কোন লেখকের লিখিত পুস্তক-তালিকা।

পুস্তকের তালিকাকে প্রধানতঃ দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা যেতে পারে :

প্রথমতঃ পুস্তক-তালিকাকে পুস্তক-তালিকার মধ্যে রেখে বিষয় অনুসারে ভাগ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ যে-বিষয়ের পুস্তক-তালিকা, সেই বিষয়ের মধ্যে পুস্তক-তালিকাকে রাখা যায়।

কিন্তু এতে একটু অসুবিধা এই যে, কোন দেশের পুস্তক-তালিকা, বা কোন লেখকের লেখা পুস্তক-তালিকাকে সেরূপভাবে বিভাগ করা যায় না। সেই কারণে প্রথম প্রকারের তালিকাকে তালিকার মধ্যে রেখে বিষয় অনুসারে ভাগ করুন। দ্বিতীয় প্রকারের তালিকাকে তালিকার মধ্যে রেখে দেশ অনুসারে ভাগ করুন এবং কোন লেখকের তালিকাকে তালিকার মধ্যে রেখে, লেখক যে-বিষয় সম্বন্ধে পরিচিত, সেই বিষয়ের মধ্যে রাখুন।

(২) **সাময়িক পত্রিকা** : কোন বিষয়ের পত্রিকা হ'লে তা সেই বিষয়ের মধ্যে যাবে। কোন বিশেষ বিষয়ের পত্রিকা না হ'লে, তা সাধারণ পত্রিকার মধ্যে

রাখতে হবে। পত্রিকাকে দেশ অনুসারেও ভাগ করা যায়। সাধারণ পত্রিকাকে আবার দেশের ভাষা অনুসারেও ভাগ করা চলে।

গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্রিকা আসার সঙ্গে সঙ্গে জাতিবিচার করা হয় না। একটি খণ্ড সম্পূর্ণ হ'লে যখন তা বাঁধিয়ে আনা হয়, কেবল তখনই তা একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক বলে গণ্য হয় এবং তার জাতিবিচার করা হয়।

(৩) **বিশ্বকোষ**ঃ বিশ্বকোষ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি :

(ক) বিশ্বকোষ সাধারণ বিশ্বকোষ হ'তে পারে। তখন কিন্তু বিশ্বকোষ সাধারণ ক্ষেত্রের মধ্যে যাবে।

(খ) কোন বিষয়ের বিশ্বকোষ হ'তে পারে। যেমন : 'Encyclopedia of Islam'। এই বিশ্বকোষ ইসলামের মধ্যে রাখতে হবে।

জাতিবিচারের কাজ সুরু করার নিয়ম

মনে করুন, আপনার উপর কোন গ্রন্থাগারের পুস্তকসম্ভারের জাতিবিচারের ভার পড়েছে এবং আপনাকে বইগুলি ডিউই'র বিভাগ অনুসারে সাজাতে হবে। আপনি কাজ সুরু করবেন কেমন ক'রে? নিম্নরূপে কাজ সুরু করলে আপনার সুবিধা হবে :

(১) গ্রন্থাগারের সমস্ত বই পুস্তকমঞ্চ থেকে নামিয়ে ফেলুন।

(২) বইগুলিকে প্রথমতঃ ডিউই'র ১০টি বিভাগ অনুসারে ভাগ ক'রে ফেলুন। তারপর ১০টি বিভাগের বইগুলিকে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত পুস্তকমঞ্চে সাজিয়ে ফেলুন।

(৩) তার পর প্রত্যেক বিভাগের বইগুলিকে যতটা সম্ভব প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ১০টি বিভাগে মঞ্চের উপরেই ভাগ করে ফেলুন।

এতক্ষণ বিভাগের কাজ যা হ'লো, তা সম্পূর্ণভাবে নিজের সাধারণ বিচারশক্তির উপর নির্ভর ক'রে করা হ'লো। এইভাবে কাজ করলে একটা সুবিধা

হয় এই যে, এক-একজাতীয় বই কতকটা এক স্থানে এসে পড়ে। তাতে এক খানি বইয়ের দুইরকম জাতিসংখ্যা হ'য়ে যাওয়ার কম সম্ভাবনা থাকে। এক বইয়ের অনেকগুলি কপি থাকলে, তাও এক স্থানে এসে পড়ে। তার ফলে একই বইয়ের দশখানি লিখন লেখা থেকে সাবধান হ'তে পারা যায়। কেবল তাই নয়, আরো একটি বিশেষ সুবিধা হয় এই যে, একই বইয়ের বিভিন্ন সম্পাদক থাকলে এবং তা কোন বিশেষ বিশেষ সংস্করণের হ'লে, বইগুলির সংখ্যা একটি থেকে আর একটিকে কেমন ক'রে পৃথক করতে হবে, তা গোড়া থেকেই ধারণা ক'রে নিতে পারা যায়। গোড়ার দিকেই এরূপ একটা ধারণা ক'রে নিতে না পারলে, শেষে মহা মুশকিলে পড়তে হ'তে পারে।

(৪) এইবার সূক্ষ্মভাবে জাতিবিচার সুরু করুন।

(৫) পুস্তকের প্রথম পাতার পিছন দিকে পুস্তকের জাতি-সংখ্যা এবং লেখক-সংখ্যা লেখা হ'লে, বইয়ের শিরদাঁড়ায় বা 'পুটে' লেবেল মেরে, তার উপর পুস্তকের সংখ্যা লিখে বইখানিকে যে-স্থান থেকে বার করা হয়েছে, সেই স্থানেই রাখুন।

(৬) এমনিভাবে সব বইয়ের জাতিবিচার হ'য়ে গেলে, বইগুলিকে সংখ্যা অনুসারে সাজিয়ে ফেলুন। এখন বইগুলিকে আর মঞ্চ থেকে বার করবার প্রয়োজন নেই।

বাংলা সাহিত্যের জাতিবিচারের ছক

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ রূপগুলিকে একটা নিয়মানুসারে সাজানো আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে একটা প্রধান সমস্যা। নানা গ্রন্থাগারে নানাপ্রকার উপায়ে বই সাজানো হয়। কিন্তু সে-সব বই-সাজানোর মূলে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই। বই সাজাতে হ'লে কি নিয়মে বই সাজাতে হবে, তা আমরা পুস্তকের জাতিবিচার-প্রসঙ্গে বলেছি। আমরা এ-কথাও বলেছি যে, ডিউই'র

দশমিক ক্রমের বহু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তা আজ পৃথিবীর সব দেশেই প্রচারলাভ করেছে। সুতরাং আমাদের দেশে ডিউই'র দশমিক ক্রমানুযায়ী জাতিবিভাগের চলন না হওয়ার কোন কারণ নেই এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে ডিউই'র সংখ্যাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা ডিউই'র পদ্ধতি ব্যবহার করবো এবং ডিউই'র বাংলা সাহিত্যের সংখ্যা ৮৯১'৪৪কে আমরা সাহিত্যের যুগানুযায়ী ক'রে নিয়ে ব্যবহার করবো। তবে এতে সংখ্যা বড় হ'য়ে যাবে, কিন্তু উপায় নেই।

বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস, কৌতুক বা হাস্যরসাত্মক রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি খুব বেশি পুরানো নয় এবং এসব ক্ষেত্রও সংক্ষিপ্ত। সে-কারণে এগুলির ক্ষেত্রবিন্যাস সম্পূর্ণভাবে দেখানো হ'লো না। কেবলমাত্র কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রগুলিকেই সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করা হ'লো। তবে এই ছককেই যে মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই। এই ছক দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল বিন্যাসের পন্থাটা দেখানো।

দৃষ্টিকোণ

৮৯১'৪৪	বাংলা সাহিত্য
৮৯১'৪৪০১	বাংলা সাহিত্যের দর্শন
৮৯১'৪৪০২	বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ
৮৯১'৪৪০৩	বাংলা সাহিত্যের অভিধান
৮৯১'৪৪০৪	বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ
৮৯১'৪৪০৫	সাময়িক পত্র
৮৯১'৪৪০৬	সাহিত্যসজ্ঘ
৮৯১'৪৪০৭	শিক্ষা ও চর্চা
৮৯১'৪৪০৮	সংগ্রহ বা সংকলন
৮৯১'৪৪০৯	ইতিহাস

সাহিত্যের রূপ

৮৯১'৪৪ বাংলা সাহিত্য

'৪৪১ বাংলা কবিতা
'৪৪২ " নাটক
'৪৪৩ " উপন্যাস ও গল্প
'৪৪৪ " প্রবন্ধ
'৪৪৫ " বক্তৃতা
'৪৪৬ বাংলা পত্র
'৪৪৭ " কৌতুক বা হাস্যরসাত্মক রচনা
'৪৪৮ " অন্যান্য (ছড়া, প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কাব্য

১ আদিযুগ

১ বৌদ্ধ দোঁহা ও চর্যাপদ
২
৩
৪ ডাক ও খনার বচন
৫
৬
৭ শূন্যপুরাণ
৮
৯ অন্যান্য

২ মধ্যযুগ

১ মঙ্গলকাব্য
২
৩
৪ ভাগবত
৫ মহাভারত
৬ রামায়ণ
৭ বৈষ্ণব পদাবলী
৮
৯ অন্যান্য বৈষ্ণব সাহিত্য

৩ আধুনিক-পূর্বযুগ

১ ব্রতের ছড়া
২ মুসলমান কবিগণ
৩ গীতিকাব্য
৪ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, ব্রতকথা
৫ পালা গান
৬ মুর্শিদা ও বাউল গান
৭ পাঁচালী
৮ কবিওয়ালাদের গান
৯ অন্যান্য

৪ আধুনিক (প্রথম যুগ)

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত
৪ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ নবীনচন্দ্র সেন
৬ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী
৭ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৮ রাজকৃষ্ণ রায়
৯ অন্যান্য

৫ আধুনিক (দ্বিতীয় যুগ)

১ বিহারীলাল চক্রবর্তী
২ স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার
৩ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
৪ অক্ষয়কুমার বড়াল
৫ কামিনী রায়
৬ মানকুমারী বস্থ
৭ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৯ অন্যান্য

৬ আধুনিক (তৃতীয় যুগ)

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ মোহিতলাল মজুমদার
৪ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৫ কালিদাস রায়
৬ যতীন্দ্রমোহন বাগচী
৭ কাজী নজরুল ইসলাম
৮
৯ অন্যান্য

৮৯১'৪৪২ বাংলা নাটক

১ আদিযুগ (যাত্রা)

১ কৃষ্ণযাত্রা
২ চৈতন্যলীলা
৩ কালীয়দমন
৪
৫
৬
৭
৮
৯ অন্যান্য

২ সূচনা—পূর্ব

১ ভারতচন্দ্র
২ কলিরাজ
৩ তারাচাঁদ শিকদার
৪ যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
৫ হরচন্দ্র ঘোষ
৬ রামনারায়ণ তর্করত্ন
৭ কালীপ্রসন্ন সিংহ
৮
৯ অন্যান্য

৩ সূচনা

১ মধুসূদন দত্ত
২ দীনবন্ধু মিত্র (গন্ধর্বনারায়ণ)
৩ মনোমোহন বসু
৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫ রাজকৃষ্ণ রায়
৬ অতুলকৃষ্ণ মিত্র
৭ উপেন্দ্রনাথ দাস
৮ উমেশচন্দ্র গুপ্ত
৯ অন্যান্য (লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রমথ, ব্রজমোহন, মতিলাল ইত্যাদি)

৪ বিবর্ধন

১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ
২ অমৃতলাল বসু
৩ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৪ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
৫
৬
৭
৮
৯ অন্যান্য

৫ সর্বোন্নয়ন ও পতন

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ মন্মথ রায়
৩ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৪ মহেন্দ্র গুপ্ত
৫ নিশিকান্ত বসু রায়
৬ বিধায়ক ভট্টাচার্য
৭ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮
৯ অন্যান্য (যোগেশচন্দ্র, শরদিন্দু, অয়স্কান্ত, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু ইত্যাদি)

৬……

৮৯১.৪৪৩ বাংলা উপন্যাস ও গল্প

১ আদিযুগ

১
২
৩
৪ অক্ষয়কুমার দত্ত
৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৬
৭
৮
৯ অন্যান্য

২ সূচনা—পূর্ব

১ প্যারীচাঁদ মিত্র
২ রামগতি ন্যায়রত্ন
৩ রামদাস ভট্টাচার্য
৪
৫
৬
৭
৮
৯ অন্যান্য

৩ সূচনা

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩ রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ স্বর্ণকুমারী দেবী
৫ দামোদর মুখোপাধ্যায়
৬ শিবনাথ শাস্ত্রী
৭ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮
৯ অন্যান্য

৪ বিবর্ধন

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৩ অনুরূপা দেবী
৪ প্রভাবতী দেবী
৫ জলধর সেন
৬ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭ সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৮ নিরুপমা দেবী
৯ অন্যান্য

৫ আধুনিক (প্রথম)

১ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪ বুদ্ধদেব বসু
৫ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬ অন্নদাশঙ্কর রায়
৭ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮
৯ অন্যান্য

৬ আধুনিক (দ্বিতীয়)

১ প্রেমেন্দ্র মিত্র
২ প্রবোধকুমার সান্যাল
৩ দিলীপকুমার রায়
৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ('বনফুল')
৮ নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৯ অন্যান্য

৮৯১.৪৪৪ প্রবন্ধ

১ বঙ্কিমযুগ

১ বঙ্কিমচন্দ্র
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯ অন্যান্য

২ রবীন্দ্রযুগ

১ রবীন্দ্রনাথ
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯ অন্যান্য

৩ রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগ

৮৯১.৪৪৭ কৌতুক

১ বঙ্কিম-পূর্ব যুগ

১	৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২	৭
৩	৮
৪	৯ অন্যান্য
৫	

২ বঙ্কিমযুগ

১ বঙ্কিমচন্দ্র	৬
২	৭
৩ ডি. এল. রায়	৮
৪ ত্রৈলোক্যনাথ	৯ অন্যান্য
৫	

৩ রবীন্দ্র-যুগ

১ রবীন্দ্রনাথ	৬
২ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭
৩ পরশুরাম (রাজশেখর বসু)	৮
৪	৯ অন্যান্য
৫	

পুস্তকতালিকাকারের কতকগুলি প্রয়োজনীয় জার্মান শব্দের ইংরাজী অর্থ

জার্মান	ইংরেজী
Abbildung (আপবিল্‌ডুং)	Illustration
Abriss (আপরিস্)	Outline
Abhandlung (আপ্‌হাণ্ট্‌লুং)	Treatise
Amtsblatt (অম্‌ট্‌স্‌ব্লাট্)	Official gazette
Anhang (আন্‌হাং)	Appendix
Aufsatz (আউফজাট্‌স্)	Essay
Auslese (আউসলেজে)	Anthology
Ausstellung (আউস্‌টেলুং)	Inaugural address
Austausch (আউসটাউশ্)	Exchange
Auswahlverzeichnis (আউস্‌ভালফ্যার্টসাইশ্‌নিস্)	Select bibliography
Bande (বান্‌ডে)	Volume
Bearbeitung (বেআর্বাইটুং)	Adaptation
Bericht (বেরিশট্)	Bulletin
Beilage (বাইলাগে)	Supplement
—blatt (—ব্লাট্)	
Bilderbuch (বিল্‌ডেরবুক্)	Picture-book
Buchhandler (বুকহাণ্ট্‌লের)	Book-seller
Buchlein (Brochure) (বুক্‌লাইন)	Tract
Dichtung (ডিশ্‌টুং)	Belles lettres
Durchgesehene Ausgabe (ডুর্‌শ্‌গেজেনে আউসগাবে)	Revised edition
Druckfehler (ড্রুকফেলের)	Errata
Einleitung (আইনলাইটুং)	Introduction
Einzelschrift (আইনট্‌সেল্‌শ্রিফ্‌ট্)	Monograph

জার্মান	ইংরাজী
—darstellung (—ডার্স্টেলুং)	Monograph
Elementarbuch (এলেমেন্টারবুক)	Primer
Erlauterungen (এরলয়টেরুংগেন)	Commentary
Erstausgabe (এর্স্ট্ আউসগাবে)	Original edition
Erzahlung (এরর্টসেলুং)	Story
Farbentafel (ফার্বেন্টাফ্ল)	Coloured plate
Fortschrift (ফোর্টশ্রিফ্ট্)	Progress report
Fortsetzung (ফোর্টজেট্স্থং)	Serials
Gebetbuch (গেবেট্বুক)	Prayerbook
Gesetzbuch (গেজেট্স্বুক)	Code
Gesellschaft (গেজেল্শাফট্)	Society
Grundriss (গ্রুণ্ড্রিশ্)	Compend
Heft (হেফট্)	Pamphlet
Herausgaber (হেরাউশ্গাবের্)	Editor
herausgegben (হেরাউশগেগেবেন্)	Edited
Hochschulschrift (হক্শূল্শ্রিফ্ট্)	University pubiication
Inhaltsangabe (ইন্হাল্ট্স্আনগাবে)	Synopsis
Inhaltsverzeichnis (ইনহাল্ট্স্ফেরট্সাইশনিস্)	List of contents
Jarbuch (ইযারবুক্)	Yearbook
Katichismus (কাটিকিজ্মুস)	Catechisme
Konversationlexikon (কেনভেরজাট্সিয়নলেক্সিকন্)	Cyclopaedia
Kurzgeschichte (কুর্ট্স্গেশিশ্টে)	Short story
Landkarte (লানট্কারটে)	Map
Lehrbuch (লের্বুক্)	Text-book

জার্মান	ইংরাজী
Lieferung (লিফ্রুং)	Number (Issue)
Losung লোজুং)	Solution
Literarisches Eigentum (লিটেরারিশ্সেস্ আইগেন্টুম্)	Copyright
Marchen (মের্শন্)	Fairy-tale
Mitteilungen (মিট্টাইলুংগেন্)	Proceedings (transaction)
Nachruf (নাক্রুফ)	Obituary
nachschlage Werke (নাক্শ্লাগে ভের্কে)	Reference book
Nachtrage (নাক্ট্রাগে)	Addenda
Nekrologie (নেক্রোলগি)	Obituary
neue Ausgabe (নয়ে আউস্গাবে)	New edition
Notenbuch (নোটেন্বুক্)	Music-book
Ortsregister (অর্ট্স্রেগিস্টের)	Gazetteer
Ubersetzung (উবেরজেট্সুং)	Translation
Urherberrecht (উরহেরবেরেশ্ট্)	Copyright
Redaktor (রেডাকটর্)	Editor
Register (রেগিস্টার)	Index
Reihe (রাইয়ে)	Series
(neue…) নয়ে…	
Romane (রোমানে)	Fiction
Sammlung (জাম্লুং)	Collection
Sammtliche werke (জেমট্লিশে ভের্কে)	Collected work
Schauspiel (শাউসপীল)	Drama
Separatabdruck (জেপারাট্আবড্রুক)	Reprint

জার্মান	ইংরাজী
Tafel (টাফ্ল)	Plate
Tageblatt (টাক্ব্লাট্)	Daily
Tagebuch (টাক্বুক)	Journal (diary)
Taschenworterbuch (টাস্‌ন্‌ভের্‌টের্‌বুক্)	Pocket dictionary
Urtext (উরটেক্সট্)	Original text
Vereinigung (ফেরআইনিগুং)	Association
Verfasser (ফের্‌ফাসের্)	Author
Verlag (ফের্‌লাক্)	Publishing firm
Verlagsbuchhandel (ফেরলাগ্‌সবুক্‌হাণ্ডেল)	Publishing
vermehrte Auflage (ভেরমের্‌টে আউফ্‌লাগে)	Enlarged edition
Vertrag (ফের্‌ট্রাক্)	Treaty
Verzeichnis der Bilder (ভের্‌টসাইশনিস্ ডের বিল্ডের্)	List of illustration
Vollbild (ফোলবিল্ট্)	Full-page illustration
Vorlesung (ফোরলেজুং)	Lecture
Vorrede (ভোর্‌রেডে)	Foreword
Vorwort (ফোর্‌ভর্‌ট্)	Forward
Widmung (ভিট্‌মুং)	Dedication
Worterverzeichnis (ভোর্‌টের্‌ফেরট্‌সাইশনিস্)	Glossary
Zeitung (ট্‌সাইটুং)	Daily
Zeitschrift (ট্‌সাইশ্রিফ্‌ট্)	Periodical (Magazine)
Zueigung (ট্‌সুআইগুং)	Dedication
Zusammenfassung (ট্‌সুজামেন্‌ফাসুং)	Abridged
Zweimonatlich (ট্‌স্‌ভাইমনালিশ)	Quarterly.

কতকগুলি বাংলা পরিভাষা

Added entry—অতিরিক্ত লিখন

Alphabetico-classed Catalogue—জাতিগত আক্ষরিক তালিকা

Alternative-title—নামান্তর

Analysis—বিশ্লেষণ

—tic entry—বিশ্লেষণী

Annotation—টীকা

Anonymous—অজ্ঞাতনামা, নামহীন

" book—লেখকের নামহীন পুস্তক

Appendix—পরিশিষ্ট

Assumed name—অপ্রকৃত নাম, ছদ্মনাম

Asyndetic—অসম্পর্কিত তালিকা

Author—প্রণেতা, গ্রন্থকার

Author-card—লেখক-লিখন

" catalogue—লেখক-তালিকা

" number—লেখক-সংখ্যা

Bastard-title—অর্ধনাম

Binder's " —দফ্তরির ছাপা নাম

Book-card—পুস্তকপত্র (কার্ড)

Book-number—পুস্তক-সংখ্যা (লেখক-সংখ্যা)

Call no.—ডাক সংখ্যা

Catalogue—পুস্তক তালিকা

Changed title—পরিবর্ত্তিত নাম
Class—জাতি
" entry—জাতি-লিখন
" number—জাতি-সংখ্যা
Classed Catalogue—জাতিগত তালিকা
Classification—জাতি-বিচার
Collate—বই দেখে নেওয়া
Collation—পুস্তকের বর্ণনা (মাপ, ভাগ, ছবি, খণ্ড ইত্যাদি)
Combined name—সংযুক্ত নাম
(Compound name)— "
Continuation—অনুক্রম, পূর্বানুবৃত্তি
Corporate entry—সঙ্ঘ-লিখন
Cover title—প্রচ্ছদপটে উল্লিখিত নাম:
Cross reference—সম্পর্ক-উল্লেখ
Dictionary Catalogue—অভিধান-তালিকা
Dummy—মূক-পুস্তক, সাক্ষীগোপাল
Edition—সংস্করণ
Editor—সম্পাদক
Entry—লিখন
Entry Word—লিখনের প্রথম কথা
Facsimile—প্রতিরূপ, অবিকল প্রতিরূপ
Form entry—দৃষ্টিকোণ-লিখন
Frontispiece—নামপত্রের সম্মুখের চিত্র, পুস্তকের প্রথমে যে চিত্র থাকে
Guide Card—পরিচালক পত্র

Half-title—(Bastard title দেখ)
Heading—লিখন শীর্ষক
Imprint—গ্রন্থপ্রকাশ-পরিচয়
Indention—সীমা-রেখা
" author—লেখক-সীমা
" title—নাম-সীমা
Independent—ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা এক সঙ্গে যুক্ত, একত্রে বাঁধানো দু'খানি বই
Index—সূচীপত্র
Joint author—যুক্ত লেখক, যুগ্মলেখক
" card—যুক্ত লেখকপত্র (লিখন)
Main entry—প্রধান লিখন
Name Catalogue—নাম-তালিকা
Nom-de-plume—(Pseudonym দেখ) নঁ-দ্-প্লূম্
Out of print—ছাপা নাই
Pagination—পত্র-চিহ্ন, পত্রাঙ্ক
Pamphlet—পুস্তিকা
Partial-title—আংশিক নাম
Periodical—পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা
Pseudonym—অপ্রকৃত নাম, ছদ্মনাম
Publisher—প্রকাশক
Reference—(cross reference দেখুন)
Reprint—পুনর্মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রিত বিষয়
Running title—পত্র-নাম
See reference—দেখুন লিখন
" also reference—আরো দেখুন লিখন

Series—সারি, সিরিজ

" entry—সিরিজ-লিখন

" note—সিরিজ-টীকা

Shelf list—মঞ্চ-তালিকা

Stack—মঞ্চ

Subject—বিষয়

" Catalogue—বিষয়-তালিকা

" entry—বিষয়-লিখন

" heading—বিষয় শীর্ষক

" reference—বিষয়-উল্লেখ

Syndetic—(asyndetic দেখ) সম্পর্কিত

Title—নাম

" page—নাম-পত্র

Tracing—লিখন-চিহ্ন

Volume—খণ্ড

গ্রন্থপঞ্জী

যে সকল বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

Sartre, J.-P.	What is literature ?
Hauff, Wilhelm	Die Bucher u. die Lesewelt,
Fischer, Klaus	Beobachtungen von Gastgelehrten an indischen Bibliotheken (Zentralblatt fur Bibliothekwesen 1954.).
Library Bulletin	What is a rare and valuable book (V. 3, April, 1944, No. 1 ; V. 4, Oct., 1945, No. 3.
Brunet, Charles	Manuel du Libraire, t. 1.
Boletin de la Bibliotheca nacional	t. 14, No. 3. La seleccion de los libros en la Bibliotheca Universataria —by Isabel Mendez.
Dewey, Melvil	Decimal classification (14th. ed.)
Sayers, W. C. B.	An introduction to Library classification.
Sayers, W. C. B.	Card catalogue.
Merrill, W. S.	Code for classifiers.
A. L. A.	Code
Bliss, H. E.	The organisation of knowledge in Libraries and the subject approach to books.
Fellows. D.	Cataloguing rules.
Hitchler	Cataloguing for small Libraries.
Mann, A	Introduction to cataloguing and the classification of books.
Sharp, H. A.	Cataloguing.
Drurr. F, K. W.	Book selection.
Mc Colvin, L. R.	The theory of book selection in public Libraries.
Wellard, J. H.	Book selection

Randall, W. M & Goodrich, F. L D. — Principles of College Library Administration.
Lyle G. R. & others — Administration of the College Library.

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা ৬৫	ডিউইস্তম্ভে "ভাষাবিজ্ঞানের" পর "বিজ্ঞান" বসিবে
„ ৮৮	০০০ দর্শন'এর স্থলে হ'বে ১০০ দর্শন
„ ৯৩	৮৯১·৪৪৪ (আধুনিক যুগ)'এর স্থলে হ'বে ৮৯১·৪৪১৪
„ ১৩৯	নমুনায় লেখকের নামের পর লাইন ছাড় হ'বে না
„ ১৬৯, ১৭০	"কলিকাতা, ১৯০৭" লেখক-সীমা থেকে সুরু হবে।
